খানে আজম হজরত খান জাহান আলী (রঃ)

সৈয়দ ওমর ফারুক হোসেন

খানে আজম

হযরত খানজাহান আলী (রঃ)

সৈয়দ ওমর ফারুক হোসেন

বাগেরহাট, খুলনা।

www.pathagar.com

প্রথম প্রকাশ :— ডিসেম্বর, ১৯৮২

মুদ্রণে :— দি বাগেরহাট প্রেস
বাগেরহাট, খুলনা।
ও
স্বরলিপি প্রেস
খুলনা।

প্রকাশনায় :—
মোরশেদ পাবলিকেশন, বাগেরহাট।

পরিবেশনায় :
আলী পাবলিকেশন, ঢাকা।
নেছারিয়া কুতুবখানা, বাগেরহাট।

প্রচ্ছদ অংকনে :— মোঃ আবরার আলী রাণা
ঢাকা।

॥ সর্বসত্ব প্রকাশক কর্তৃক সংরক্ষিত ॥

প্রাপ্তিস্থান :—
মোহাম্মদী লাইব্রেরী ও হামিদিয়া লাইব্রেরী, চকবাজার, ঢাকা।
কোরান মঞ্জিল — বরিশাল।
বাংলাদেশ তাজ কোম্পানী — বাংলাবাজার, ঢাকা।
ইসলামিয়া লাইব্রেরী — আন্দরকিল্লা, চিটাগঞ্জ।
নেছারিয়া কুতুবখানা — যশোর।
দারুল কোরান ও আপতাব ব্রাদার্স খুলনা।

হাদিয়া ৩৫/- টাকা মাত্র

www.pathagar.com

উৎসর্গ

যে মহাপুরুষের জীবনী লেখার কাজে হাত দিয়ে জীবনকে ধন্য মনে করেছি তাঁর নামেই বইখানি উৎসর্গ করলাম। আর এই সঙ্গে আমার পরম শ্রদ্ধেয় পিতা সৈয়দ আনোয়ার হোসেন ও আম্মা ফাতেমা খানমকে স্মরণ করছি।

গ্রন্থকার।

www.pathagar.com

॥ গ্রন্থ প্রসঙ্গে দু'টি কথা ॥

হযরত খানজাহান আলী (রাঃ) বাংলাদেশের ইতিহাসে একজন প্রখ্যাত সাধুপুরুষ। বিজেতা শাসক ও মানুষ হিসাবে তিনি একটি বিশিষ্ট স্থানের অধিকারী। খুলনা ও যশোর জেলায় তাঁর নাম ঘরে ঘরে ছড়িয়ে আছে। এতদঞ্চলে ইসলাম প্রচারে তাঁর দান অপরিসীম। তাই তাঁর সম্পর্কে আমাদের প্রত্যেকেরই জানা দরকার। এ পর্যান্ত অনেকেই তাঁর উপর ছোটখাট বহু বই লিখেছেন। কিন্তু তাঁর সম্বন্ধে বিস্তারিত কোন তথ্য সম্বলিত বই এখনও বের হয়নি। সৈয়দ ওমর ফারুক সাহেব সেই অভাব পূরণ করেছেন দেখে আমি সত্যিই আনন্দিত। জনাব ওমর ফারুক বাগেরহাট ও খলিফাতাবাদেরই লোক ও খাঞ্জেলি দরগার পাশেরই একজন অধিবাসী। ওখানে ফকির বংশের যে সমস্ত লোক বাস করছেন এবং যাঁরা হযরত খানজাহান আলীর বংশে সম্পর্কিত বলে দাবী করেন তিনি তাঁদেরই সঙ্গে সংযুক্ত এবং তাঁদের সঙ্গেই তাঁর উঠাবসা। কাজেই খানজাহান আলীর কার্যকলাপ সম্পর্কে তাঁর অধিক পরিচিত হওয়াই স্বাভাবিক। তাঁদের কাছ থেকে বহু মূল্যবান তথ্য সংগ্রহ করে তিনি এই বইএর মধ্যে পরিবেশন করেছেন। এ ছাড়াও এ পর্যন্ত খানজাহান আলীর (রাঃ) উপর যে সমস্ত লেখা ও গবেষণা হয়েছে তার উপর ভিত্তি করেই তিনি তাঁর এই গবেষণামূলক বইটি রচনা করেছেন। তাঁর গবেষণা কার্য দেখে আমি নিঃসন্দেহে খুশী হয়েছি। আশা করি বইখানি হযরত খানজাহান আলী (রাঃ) সম্বন্ধে উৎসাহী পাঠকদের অনুসন্ধিৎসু মনকে তৃপ্তি দান করতে সক্ষম হবে। আমি লেখকের সর্বময় সাফল্য কামনা করি।

(অধ্যাপক কে আলী)
বাংলা দেশের বিশিষ্ট
বুদ্ধিজীবী ও গ্রন্থকার

www.pathagar.com

।। কিছু কথা ।।

'খানেআজম হযরত খানজাহান আলী (রঃ)' বইখানির পাণ্ডুলিপি পড়িতে বসিয়া আমি নিজেকে অতীতের গর্ভে হারাইয়া ফেলিয়াছিলাম। সৈয়দ ওমর ফারুক সাহেব পীর খানজাহান আলীর জীবনের যে পথ নির্ণয় করিয়াছেন ও যে পরিশ্রম করিয়া তথ্য সংগ্রহ করিয়াছেন তাহা আমার বিস্ময় সৃষ্টি করিয়াছে। বইটি পড়িতে পড়িতে অতীতের অনেক স্মৃতিই আমার মনে পড়িল। একবার বাগেরহাট গিয়া ভ্রমণ শেষে শহরে পৌঁছিয়া একটি শালবৃক্ষে অনেক বাদুড় ঝুলিতে দেখিয়া আমি লিখিয়াছিলাম "বাগেরহাটে বাঘ নাই, বাদুড় ঝোলে গাছে।" সেই বাগেরহাটের বিভিন্ন স্থানে যে এত মুসলিম কীর্তিতে সমুজ্জ্বল তাহা এই বই পড়ার পূর্বে আমি জানিতে পারি নাই। লেখকের খুটিনাটির দিকেও লক্ষ্য কম নাই। পীর সাহেবের দীঘির কুমীরের রহস্যময় জীবনের আলোচনায় এই প্রাণীকুলের জীবনের সুন্দর পরিচয় বহন করে। সর্বোপরি আমার মনে হয় লেখক ঐতিহাসিক পথ ধরিয়া তাঁহার মনোজ্ঞ আলোচনা করিয়া পীর খানজাহান আলীর জীবনের সঠিক সূত্র আবিষ্কার করিতে সক্ষম হইয়াছেন। সরকারী চাকুরিতে থাকিয়াও লেখক কেমন করিয়া এত গবেষণা করিয়াছেন তাহা ভাবিয়া আমি বিস্মিত হইয়াছি। আমি লেখকের প্রচেষ্টার ধন্যবাদ দেই ও বইটির বহুল প্রচার কামনা করি।

(কবি কাদের নওয়াজ)

www.pathagar.com

একটি মন্তব্য

হযরত পীর খানজাহান আলী (রাঃ) পাক ভারত উপমহাদেশে একজন প্রখ্যাত আউলিয়া শাসক ও বিজেতা ছিলেন। পাকভারতের প্রতিটি মানুষের মনে তিনি একটি বিশেষ স্থান অধিকার করে আছেন। যশোর ও খুলনা জেলার প্রত্যন্ত অঞ্চলেও তাঁর শত শত কীর্তি আজও বিদ্যমান। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় তাঁর সুস্পষ্ট জীবনী তুলে ধরা কারও পক্ষে আজও সম্ভব হয়নি। সৈয়দ ওমর ফারুক হোসেন সাহেবের লিখিত 'খানে আজম হযরত খানজাহান আলী' বইখানির পাণ্ডুলিপিতে যা দেখলাম তাতে আমার মনে হলো তিনি সে অভাব কিছুটা পুরণ করতে সক্ষম হয়েছেন। আমার মতে বইখানি অত্যন্ত গবেষণামূলক হয়েছে এবং তাঁর জীবনের ইতিহাসের সঠিক দিকনির্ণয় করতে তিনি সক্ষম হয়েছেন। বইটি তথ্যবহুল হয়েছে। আমি লেখকের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ ও বইটির বহুল প্রচার কামনা করি।

এ, এস, এম. মোস্তাফিজুর রহমান
(প্রাক্তন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী)
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার।

www.pathagar.com

।। মুখবন্ধ ।।

হযরত খানজাহান আলী দক্ষিণবঙ্গের ইতিহাসে এক অবিস্মরণীয় নাম। এ অঞ্চলে জনবসতি প্রতিষ্ঠা ও ইসলাম প্রচারের ক্ষেত্রে তাঁর অবদানই ছিল সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। তিনি একজন ঐতিহাসিক ব্যক্তি। তবে তাঁর পরিচয় কি ছিল—শাসনকর্তা না ইসলামপ্রচারক ? না উভয়ই ? ইতিহাসের পাতায় একাধিক খান জাহানের নাম পাওয়া যায়। পাঠান ও মোগল আমলে একাধিক খানজাহান বর্তমান ছিলেন। তবে এই খানজাহান কোন খানজাহান যিনি খলিফাতাবাদ রাজ্যের পত্তন করেন ? কে এই ব্যক্তি যিনি ষাটগম্বুজ, ঘোড়া দীঘি, খাঞ্জেলী দীঘি প্রভৃতি ঐতিহাসিক কীর্তিসমূহের স্রষ্টা।

এই খানজাহান কে ছিলেন ? উত্তরটি অবশ্য সহজ নয়। তাঁর ঐতিহাসিক কীর্তিরাজির মধ্যে বসবাস করেও আমরা তাঁর সম্পর্কে অজ্ঞ। এই মহাপুরুষের ঐতিহাসিক পরিচয় আজ অলৌকিক গল্প আর কিংবদন্তীর আড়ালে লুপ্তপ্রায়। আমরা অনেক রাজা বাদশার ইতিহাস মুখস্ত করি কিন্তু তাঁর সম্পর্কে আমরা বলতে গেলে কিছুই জানিনা। তাঁর সম্পর্কে এ পর্যন্ত কোন প্রামান্য ইতিহাসমূলক গ্রন্থ রচিত হয়নি। পুরাতত্ত্ব বিভাগের কাছেও যেন বিষয়টি তেমন গুরুত্ব পায়নি। এটি একটি সংরক্ষিত পুরাকীর্তি। কিন্তু সংরক্ষণের নামে সামান্য ইট কাঠের কাজ ছাড়া এই কীর্তি যাঁর তাঁর প্রকৃত পরিচয় উদঘাটনে সামান্যতম উৎসাহও ব্যয় করা হয়নি।

ব্যক্তিগত উদ্যোগে তাঁর পরিচয় উদ্ধারে যিনি প্রথম আত্মনিয়োগ করেন তিনি হলেন শ্রীসতীশচন্দ্র মিত্র। তিনি অবশ্য এ সম্পর্কে যে মন্তব্য করেছেন তা সর্বাংশে গ্রহণযোগ্য নয়। তাঁর মতে শর্কী রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা খাজাজাহান ও এই খানজাহান একই ব্যক্তি। তবে এ বক্তব্য ঠিক নয়। আধুনিক গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে তাঁরা ভিন্ন লোক। এ, এফ, এম, আবদুল জলিলের মতে বাগেরহাটের খানজাহান ফিরোজশাহ তোঘলকের মন্ত্রী খান-ই জাহান মকবুলের পৌত্র। তবে এ সম্পর্কেও তিনি কোন জোরালো প্রমাণ উপস্থিত করতে পারেন নি। তিনি এ উক্তি করেছেন অনেকখানি অনুমানের উপর নির্ভর করে।

তবে এক্ষেত্রে সমস্যা যে নেই তা নয়। তা হল প্রয়োজনীয় তথ্যের অভাব। তাঁর কবরের উপর মৃত্যু তারিখ ছাড়া উল্লেখযোগ্য কিছু লিখিত

www.pathagar.com

নেই। মাজারের পাথরের বিভিন্ন স্তরে আরও অনেক কথা লিখিত থাকলেও তা আজও পর্যন্ত সম্পূর্ণ পাঠোদ্ধার হয়েছে কিনা সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ আছে। পাঠোদ্ধার হলে হয়তো এ সম্পর্কে আরও নতুন নতুন তথ্য পাওয়া যেতে পারে।

মাজারলিপি মতে তিনি ৮৬৩ হিজরী অর্থাৎ ১৪৫৯ খৃষ্টাব্দে মৃত্যুবরণ করেন। আগেই বলেছি ঐ সময় একাধিক খানজাহানের অস্তিত্ব ছিল। খানজাহান কোন নাম নয়, উপাধি। সে যুগে অনেকেই এই উপাধি ধারণ করতেন বলে জানা যায়। এর মধ্যে বাগেরহাটে যিনি আসেন তিনি কোন খানজাহান? তিনি দিল্লী থেকে আসেন না স্বাধীন বাংলার রাজধানী গৌড় থেকে প্রেরিত হন? তিনি কার প্রতিনিধি হিসাবে দীর্ঘকাল ধরে দক্ষিণবঙ্গ শাসন করেন? এ প্রশ্ন আজ আমাদের সামনে।

বর্তমান গ্রন্থে এ সকল প্রশ্নের উত্তর দেয়ার চেষ্টা করেছেন সৈয়দ ওমর ফারুক। জনাব ফারুক জন্মগ্রহণ করেন খানজাহান আলীর মাজার-শরীফ সংলগ্ন দীঘিরপাড় গ্রামে। জন্মসূত্রেই তিনি এসব কীর্তিরাজির সঙ্গে আবাল্য পরিচিত। কলেজজীবন থেকেই তিনি এ বিষয়ে তথ্য সংগ্রহের কাজ শুরু করেন। উদ্দেশ্য এ বিষয়ে কিছু লিখবেন তারপর কর্মজীবনে প্রবেশ করে নানা কর্মব্যস্ততার মধ্যেও তিনি এ নিরবিচ্ছিন্ন চেষ্টার অবসান ঘটাননি। অবশেষে তাঁর কর্মপ্রচেষ্টার আকাংখিত ফসল প্রকাশিত হল। গ্রন্থটির সার্থকতা ব্যর্থতা বিচারের ভার রইল সুধি পাঠকবৃন্দের উপর। তবে তিনি যে এক্ষেত্রে একটা প্রশংসনীয় দায়িত্ব পালন করেছেন সন্দেহ নেই। এটিই মনে হয় একক খানজাহান আলী সম্পর্কে লিখিত প্রথম দীর্ঘ পুস্তক। গ্রন্থটি খানজাহান আলী সম্পর্কে গবেষণার ক্ষেত্রে নতুন পথের সন্ধান দিতে সমর্থ হবে বলে আমাদের বিশ্বাস। গ্রন্থকারের প্রতি রইল আমার অভিনন্দন। আমি গ্রন্থটির বহুল প্রচার কামনা করি।

শেখ গাউস

প্রভাষক, বাংলা বিভাগ

সরকারী পি, সি, কলেজ।

১১. ১১. ৮২

বাগেরহাট।

www.pathagar.com

॥ প্রকাশকের নিবেদন ॥

বিছমিল্লাহির রহ্মানির রাহিম

"A people that can feel no pride in the past in its History and literature, loses the mainstay of its national character. (Maxmuller)

"যারা তাদের পুরাতন ইতিহাস ও সাহিত্য নিয়ে গর্ববোধ করে না, তারা তাদের জাতীয় চরিত্র হারিয়ে ফেলে।"

এই কথাটা সর্বজন স্বীকৃত যে হযরত পীর খান জাহান আলীর (রঃ) জীবন কাহিনী উদ্ধার করা খুব সহজ কাজ নয়। কারণ তাঁর অসংখ্য কীর্তিরাজি মাজারের উপরে উৎকীর্ণ তাঁর নাম ও বিক্ষিপ্ত কিছু ঘটনা এবং প্রবাদ ছাড়া ধারাবাহিক কোন ইতিহাস কোথাও লিপিবদ্ধ পাওয়া যায় না। তবুও তাঁর সঠিক জীবনী উদ্ধারের জন্য একটা প্রচেষ্টা চালাবার ইচ্ছা ছাত্রজীবন থেকেই আমি মনে মনে পোষণ করে আসছিলাম। অবশেষে ১৯৮০ সালে এই কাজ আমি শুরু করি। কিন্তু এই হারিয়ে যাওয়া ইতিহাস ও মুসলিম ইতিহাসের অসাধারণ এই নায়কের বহু কীর্তিরাজি সম্মুখে নিয়ে এই গতিশীল পৃথিবীর পথে এতো দিন ধরে আমি শুধু ঘুরপাক খেয়েছি মাত্র। ধারাবাহিক কিছু লিপিবদ্ধ করা সম্ভব হয়নি। শৈশব কৈশোর পার হয়ে যৌবনে পড়ে এই মূক ইতিহাসের মাঝে বসে থেকে বার বার শুধু মনে হয়েছে, কে এই মহাপুরুষ? কে এই গৌরবময় ইতিহাসের নায়ক? তাঁর সঠিক সন্ধান মেলা কি কোন মতেই সম্ভব নয়?

যৌবনের পড়ন্ত বেলায় পা দিয়ে সহসা আমি একদিন জড়িয়ে পড়লাম "খানজাহান আলী ইসলামিক রিসার্চ একাডেমী"র সংগে। এই একাডেমীর

www.pathagar.com

প্রচার সম্পাদকের দায়িত্বভার গ্রহণ করে একাডেমী পত্রিকার সম্পাদক হিসাবে সম্পাদকীয়তে যেদিন লিখলাম; "একাডেমীর সকল উদ্দেশ্যের মধ্যে একটি প্রধান উদ্দেশ্য হলো, প্রকৃত হযরত পীর খানজাহান আলী কে? তাঁকে জানা ও তাঁর সঠিক ইতিহাস উদ্ধার করা।" সেদিন থেকেই আমার বার বার মনে হয়েছে; কথাটা শুধু মুখেই বললাম, একটা কলমের আঁচড়ে শুধু কাগজেই লিখলাম, কিন্তু প্রয়োজনীয় প্রচেষ্টা আমরা কিছুই তো করলাম না।

তাঁকে জানবার বা তাঁর জীবনী লেখার প্রচেষ্টা বহুবার বহু লোকেই করেছেন। পুথি লেখক এম, দলিলুর রহমান তাঁর "পীর খাঞ্জালী" নামক পুথিতে যা লিখেছেন তার মধ্যে ইতিহাসের কিছু গন্ধ পাওয়া যায় বটে কিন্তু সর্বোপরি তাকে পুথি ছাড়া ইতিহাস বলা চলে না। তা ছাড়া বাবু সতীশচন্দ্র মিত্র থেকে শুরু করে পশুপতি বাবু, আবদুর রহিম ও আবদুল জলিল সাহেব পর্যন্ত যাঁরা যা কিছু লিখেছেন, আমার হাতে পড়া মাত্রই গভীর মনোনিবেশ সহকারে আমি তা পড়েছি। কিন্তু কোথাও না কোথাও আমার সংগে তাঁদের মতের অমিল ঘটেছে। এমনকি ইতিহাসেও তার অমিল দেখেছি। ফলে মনে প্রাণে তাঁদের ইতিহাসের সবটুকু আমি মেনে নিতে পারিনি।

অন্যদিকে আমি যতবার চিন্তা করেছি ততবারই আমার মনে হয়েছে এই মহামনীষী নিঃসন্দেহে একজন ঐতিহাসিক ব্যক্তি, ইতিহাসের সংগে নিশ্চয়ই তাঁর যোগসূত্র রয়েছে। কাজেই তাঁর পূর্ণাঙ্গ ও ধারাবাহিক ইতিহাস পাওয়া না গেলেও ইতিহাসে তাঁর সঠিক সন্ধান পাওয়া সম্ভব। আমার এই বিশ্বাস নিয়ে আমি এই কাজে হাত দিয়েছি এবং তাঁকে ইতিহাসের অধ্যায়ের মাঝে খুঁজে বের করা আমি আমার জীবনের প্রধান কর্তব্য বলে মনে করেছি। ভেবেছি এই কর্তব্য পালন না করলে এই মনীষীর কাছে আমি অকৃতজ্ঞ বলে প্রতীয়মান হব। কারণ আমি চির ঋণী এই কুতুবুল আলম, ওলিয়ে কামেল, ছরদারে আউলিয়া, হযরত পীর খানজাহান আলীর

www.pathagar.com

(রঃ) কাছে। বাল্যকাল থেকে যে বাতাসে নিঃশ্বাস নিয়ে আমি জীবনধারণ করেছি, যে জায়গার ধুলিমাটি মেখে ছেলেবেলা কাটিয়ে দিয়েছি, সবই তাঁর মাজার সীমানার অন্তর্ভূক্ত। তাঁর মাজারের পার্শ্বের বাড়ীতে থেকে জীবন কাটিয়ে দিলাম কিন্তু একটি দিনের জন্যও তাঁকে কোন খাজনা দিলাম না। ভেবে পাই না দিতে চাইলেও কেমন করে তাঁর খাজনা আমি দেব, তাঁর ঋণ আমি পরিশোধ করব? যে খাজনা চায় না, যে খাজনা নেয় না বা যার দরজায় কাঙ্গালের মতো দাঁড়িয়ে থাকলেও কথা বলে না কেমন করে তাঁকে খাজনা দেওয়া যায়? তাইতো তাঁকে আমি জানতে চাই, সবাইকে জানাতে চাই সে কে? কিন্তু যদি তাঁর দয়া না হয় তবে আমি কেন, কারো দ্বারাই তাঁর জীবনী উদ্ধার করা সম্ভব নয়। যে মহাসাধক, বাদশা হয়েও রিয়া ও গরিমা প্রকাশের ভয়ে, অপরিসীম সতর্কতার সাথে তাঁর আত্মপরিচয় মাটি চাপা দিয়ে গেছেন, তাঁর দয়া না হলে আমাদের মতো সাধারণ মানুষের পক্ষে তাঁকে জানা মোটেই সম্ভব নয়।

এই কঠিন কাজে হাত দিয়ে আমি কোন দিন যে সমাধা করতে পারবো তাতে আমার পুরোপুরি সন্দেহ ছিল। কিন্তু জানিনা; মনে হয় কেউই বলতে পারেনা, কঠিন কাজের সমাধান কখন কিভাবে আসে। কর্মজীবনের তাগিদে গতিবাদের লাইনকে মাথা পেতে নিয়ে একদিন সহসা এসে হাজির হলাম মাগুরা মহকুমার শ্রীপুর থানায়। এই থানায় অবস্থান কালে একদিন নাকোল হাইস্কুলের শিক্ষকদের সাথে দারুণভাবে মিশে পড়ি। এই স্কুলের পুরাতন কিছু ইতিহাসের বই পুস্তকের মধ্যে আমার আরাধ্য ইতিহাসের রূপ-রেখার স্পষ্ট কিছু ইংগিত আমি খুঁজে পাই। নাকোল হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষক মোহাম্মদ বদিউজ্জামান ও নাকোলের মুরুব্বি চাচাস্থানীয় মিয়া আবদুস ছাত্তার সাহেব তাঁর বাটিস্থ পাঠাগার থেকে মূল্যবান কিছু বই পর্য্যা-লোচনা করবার সুযোগ দিয়ে আমাকে দারুণভাবে সাহায্য করেছেন। মাওলানা

www.pathagar.com

হাচান যশোরীর পুত্র জাহাঙ্গীর হোসেন মাওলানা সাহেবের রক্ষিত বইয়ের ভাণ্ডার থেকে "তাওয়ারিখে ফেরেশ্‌তা" বইখানি আমাকে দিয়ে যে সাহায্য করেছেন তা বলার নয়। বাগেরহাটের মহকুমা মুন্‌সেফ ও খানজাহান আলী ইসলামিক রিসার্চ একাডেমীর সিনিয়র সহ-সভাপতি জনাব সিরাজুল ইসলাম আমাকে যে উৎসাহ প্রদান করেছেন তা সত্যিই স্মরণীয়। বন্ধুবর মাওলানা ইউনুস আলী ও সহপাঠী মওলানা আবদুস ওহাব মাজারের উপরের উৎকীর্ণ আরবী শিলালিপি পাঠোদ্ধার করতে বহু কষ্ট স্বীকার করেছেন। এ্যাডভোকেট ফকির মোবারেক হোসেন সাহেব স্নেহের বাণী দিয়ে আমাকে অনুপ্রাণিত করেছেন। বন্ধুবর ওয়ালিউজ্জামান ও ছোট ভাই মনিরুজ্জান আমাকে ছবি তুলে দিয়েছে। বড় ভাই সৈয়দ মোয়াজ্জেম হোসেন। ছোট ভাই সৈয়দ সিরাজুল সালেকীন আলহাজ্জ এম, এ, গফফার ও হামিদুর রহমান তরিক ছাড়াও পরিবারের অনেকের কাছ থেকে আমি উৎসাহ পেয়েছি। জনাব আকরাম হোসেন, জনাব মনোয়ারুল ইসলাম ও অধ্যাপক শেখ গাউস প্রুফ দেখেছেন। এঁদের সবার কাছে আমি কৃতজ্ঞ। সর্বোপরি মাওলানা আফতাব হোসেন ও মাওলানা খেলাফত হোসেনের কাছেও আমি ঋণী ও কৃতজ্ঞ। তাছাড়া তথ্যপঞ্জিতে উল্লিখিত যে সকল গ্রন্থকার ও প্রবন্ধকারের লেখা থেকে আমি সাহায্য গ্রহণ করেছি। তাঁদের প্রতিও শ্রদ্ধার সঙ্গে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

এই মহা মনীষীর জীবনী লিখতে গিয়ে আমি নিজে মনগড়া কোন ইতিহাস তৈরী করে লিখিনি। তবে মহাকালের দুর্বিপাকে পড়ে ইতিহাসের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ সম্ভাব্য সত্য বলে প্রতীয়মান কিছু প্রচলিত কাহিনী ও প্রবাদের সাহায্য নিতে বাধ্য হয়েছি। তাছাড়া সবই সম্পূর্ণ ইতিহাস ভিত্তিক। যাঁর বুনিয়াদ গড়া হয়েছে মাজারের উপরের উৎকীর্ণ শিলালিপি পাঠোদ্ধার করে। এখনও এমন বহু শিলালিপি রয়েছে যা আজও পাঠোদ্ধার

www.pathagar.com

করা সম্ভব হয়নি। আরবী ফারসীতে সুপণ্ডিত কোন ব্যক্তি যদি এই কাজের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন তবে হয়তো তাঁর জীবনের আরো তথ্য উদ্ধার করা সম্ভব। ঐতিহাসিক ভুল ত্রুটির দিকে আমি যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন করতে চেষ্টা করেছি। এতদসত্ত্বেও যদি কোন ভুল ত্রুটি ধরা পড়ে তবে কোন সহৃদয় পাঠক যদি আমাকে শুধরে দেন তাঁর কাছেও আমি কৃতজ্ঞ থাকব।

এখানে যতটুকু ইতিহাস লেখা হল, মাত্র এইটুকুই এই মহাপুরুষের জীবনের চূড়ান্ত ও শেষ ইতিহাস বলে আমি মনে করিনা। তবে মহাসমুদ্রের দিকে যাত্রার এটি একটি সঠিক পদক্ষেপ বলে পরিগণিত হলেই আমি নিজেকে ধন্য মনে করব। ভবিষ্যতে আরও সুন্দর গবেষণামূলক লেখা হবে এই আশায় আমি এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টটুকু রেখে গেলাম।

বিনীত—

লেখক

www.pathagar.com

ঃ সূচী-পত্র ঃ

পৃষ্ঠা

১।	খানজাহান আলী (রঃ) কে ও তাঁর খেতাব কি—	১
২।	ইতিহাসের আলোকে হযরত খানজাহান আলী (রঃ)—	২২
৩।	বাগেরহাটের সর্বপ্রথম কীর্তি—	১৪৪
৪।	হযরত খানজাহান আলীর (রঃ) সর্ববৃহৎ কীর্তি—	১৫৭
৫।	খলিফাতাবাদ, বাগেরহাট ও কিছু মন্তব্য —	১৫৩
৬।	কয়েকটি প্রশ্নের আলোচনা—	১৬৭
৭।	হযরত খানজাহান আলীর (রঃ) সর্বশ্রেষ্ঠ কীর্তি—	১৭৬
৮।	হযরত খানজাহান আলীর (রঃ) সর্ব বৃহৎ দীঘি—	১৯০
৯।	পীর সাহেবের কুমীরের রহস্যময় জীবন—	২০৫
১০।	হযরত খানজাহান আলীর (রঃ) অন্যান্য কীর্তি—	২১২
১১।	পীর আলী মোহাম্মদ তাহের ও তাঁর মাজার—	২৩৫
১২।	সৈয়দ শাহ্ আহম্মদ ওরফে জিন্দাপীর—	২৪০
১৩।	মেলা ও ওরজ, শেরেক ও বেদাত —	২৫৩
১৪।	কিছু প্রবাদ ও কিছু কেরামত—	২৭০
১৫।	শেষ জীবন—	২৮৬
১৬।	কিছু উপদেশ ও নছিহত—	২৯৬

—

www.pathagar.com

॥ লেখকের অন্যান্য গ্রন্থ ॥

১। রক্তের দাগ (গীতি নক্শা)

২। সবুজে রাঙানো মন (যন্ত্রস্থ)

৩। জীবন্ত মৃত্যুর মত।

৪। অনন্তের জাগ্রত অন্তর।

--:০:--

www.pathagar.com

খানজাহান আলী (রঃ) কে ও তাঁর খেতাব কি ?

আমি শুধু নয় বাংলার প্রতিটি মানুষ আজ হযরত পীর খানজাহান আলীর (রঃ) নামের সঙ্গে বিশেষভাবে পরিচিত। প্রতিদিন হাজার হাজার লোক দোয়া লাভের আশায় এই অলির মাজার জেয়ারত করে থাকেন। তিনি যে একজন মস্ত বড় অলি ছিলেন আজ এ বিষয়ে কারো মনে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই। এই অলি কুলচূড়ামণি, হযরত খানজাহান আলী (রঃ) এর মাজারের প্রতিটি ধূলিকণার সাথে অনেকের মত আমিও একাত্মতা বোধ করি। এদেশের প্রতিটি মানুষের কাছে এই ধর্মপ্রচারক ও মহাসাধক "পীর খানজাহান আলী" নামেই পরিচিত। অনেকে এই নামের সংক্ষিপ্তকরণ করে শুধু "পীর খাঞ্জালি" উচ্চারণ করে থাকেন। কিন্তু মাজার গাত্রে শিলালিপিতে খোদাইকৃত তাঁর যে নাম পাওয়া যায় তা হোল :—"খানেল আজম, হযরত খানজাহান আলাইহের রহমাত।" বহু অনুসন্ধান করেও তাঁর নামের শেষে কোথাও "আলী" কথাটা খুঁজে পাওয়া যায় না। লেখা আছে শুধু "আলাইহের রহমাত"। আলাইহের রহমাত ও রহমাতুল্লা আলাইহের অর্থ একই। অর্থাৎ তাঁর উপর শান্তি বা রহমাত বর্ষিত হোক। স্বাভাবিক ও সাধারণ নিয়মেই আদব রক্ষার্থে অলি আল্লাদের নামের শেষে এরূপ পদ ব্যবহৃত হ'য়ে থাকে। কিন্তু তাঁর নামের শেষে "আলী" না থাকলেও, আলী কথাটা এমন কিছু বেমানান হয়নি বা অনেক নামের শেষে স্বাভাবিকভাবে আমরা আলী ব্যবহার করে থাকি। কিন্তু কিভাবে এই "আলী" শব্দটা তাঁর নামের শেষে যোগ হল, তা একটু ভাববার বিষয়। আমার মনে হয় এদেশের সাধারণ মানুষের স্বভাবজাত উচ্চারণ পদ্ধতির সংক্ষিপ্তকরনের ফলে আলাইহের রহমাত শব্দটা একদিন আলীতে রূপান্তরিত হয়ে গিয়েছে ছাড়া অন্য কিছু নয় এবং এই প্রচলিত নামে ভূষিত হ'য়ে বহুকাল অতিবাহিত হওয়ার ফলে এই নামটিই আমাদের কাছে বিশেষ পরিচিত হ'য়ে গিয়েছে।

www.pathagar.com

এই মহাপুরুষের জীবনী জানার জন্য চেষ্টা করার পর থেকে আমি যতটুকুই জানতে পেরেছি তার মধ্যে সবচেয়ে বিস্ময় সৃষ্টি করেছে আমার কাছে তাঁর বহুল খেতাবপূর্ণ নামটি। তাঁর নামের পূর্বে যে সব খেতাব ব্যবহৃত হয়েছে তা আউলিয়াদের নামের পূর্বে ছাড়া ব্যবহার হতেই পারে না। তাঁর নামের পূর্বে সংযুক্ত এই সব খেতাবের মধ্য দিয়ে যতটুকু জানা যায় ও যতটুকু বোঝা যায়—তার অর্থ করলে এই দাঁড়ায় যে তিনি ছিলেন একজন ছরদারে আউলিয়া রসুল পাক (দঃ) এর একজন পদাঙ্কানুসারী, একমাত্র আল্লার মুখাপেক্ষী আওলাদে রসুলের মহব্বতকারী, কাফের ও মোশরেকদের শত্রু ইসলামের বন্ধু, সৎপন্থী আলেম ওলামাদের সাহায্যকারী, আত্মগোপনকারী একজন মহান বোজর্গ (কারো কারো মতে সেনাপতি) ও পরবর্তীকালের একজন শাসক, ধর্মীয় নেতা ও মহাপুরুষ। আমি এই খেতাবগুলির সাধ্যমত ব্যাখ্যা দেওয়ার চেষ্টা করব। এবং এর মধ্য দিয়ে তাঁর প্রকৃতি ও পরিচয় কিছু পাওয়া সম্ভব বলে মনে করি।

এই মহাপুরুষ তাঁর নিজের পরিচয় কোথাও লিখে রেখে যাননি। পিতার নাম কি, মাতার নাম কি, লিখিত কোথাও পাওয়া যায় না। জন্ম কোথায়, তাও কোথাও লেখা নেই। ষাট হাজার ভক্ত মুরিদ ও সৈন্য ছিল শোনা যায়। সভাসদগণ ছিলেন; মুহম্মদ তাহেরের মত জ্ঞানীগুনী বিচক্ষণ উজিরও ছিলেন। কিন্তু তাঁরাও কেউ কোন ইতিহাস বা তাঁর কোন কিছুই লিখে রেখে যাননি আর লিখে রেখে গেলেও তা আমাদের কারোরই হস্তগত হয়নি। কিন্তু লেখা কিছু থাকলে আজ পর্যন্ত কারো না কারো হস্তগত হোতই। কিন্তু সেইসব তাঁর সম্পর্কে কেন যে কেউ কিছু লিখে যাননি এটাই একটা রহস্যময় ব্যাপার। আমার মনে হয় তাঁর সম্পর্কে কিছু না লেখার জন্য নিশ্চয়ই এই মহাসাধকের কোন ইংগিত ছিল। কারণ দুনিয়ার পরিচয় থেকে আখেরাতের পরিচয়কেই তাঁরা বড় করে দেখেছেন। আখেরাতের আশায় দুনিয়ায় তাঁদের নামকে তাঁরা গোপন রাখতে চেয়েছেন।

www.pathagar.com

তাঁর জীবনী লিখতে গিয়ে পুঁথি লেখকদের কেউ কেউ লিখেছেন তাঁর বাল্য নাম ছিল কেশর খাঁ, পিতার নাম ছিল আঁজর খাঁ এবং মাতার নাম ছিল আম্বিনা বিবি। কিন্তু তাঁরা যে কোন সূত্রে এ সব পেয়েছেন তা কেউ লেখেননি বা আমিও কোথাও খুঁজে পাইনি। তাঁরা কেউ কেউ তাঁর বাল্যজীবন সম্পর্কে এইরূপ লিখেছেন যে বাল্যকালে তাঁর পিতৃবিয়োগ হয়। তাঁর পিতার মৃত্যুর পর তাঁর বিধবা মাতা বাড়ী বাড়ী ধান ভেনে তাঁকে মানুষ করেন। এক আড়ি ধান ভানার বিনিময়ে তিনি "দেড় বুড়ি" অর্থাৎ দেড় পয়সা পেতেন। আমাদের বাংলাদেশের নিত্যনৈমিত্তিক এইরূপ ঘটনার বাইরে তাঁরা যেতে পারেননি। এই গল্প লেখার পূর্বে তাঁরা একটু চিন্তা করেননি যে তাঁর বাল্যকাল যে দেশে কেটেছে সে দেশে ধান ভানার কতটা প্রচলন ছিল বা সে দেশের লোকের প্রধান খাদ্যইবা কি ছিল?

সে যাই হোক না কেন আমাদের আলোচ্য হযরত পীর খানজাহান আলী (রঃ) যে কে ছিলেন এবং কেমন লোক ছিলেন তার সাক্ষ্য বহন ক'রে বহু লেখা বুকে ধারন করে আজও স্থির হ'য়ে দাঁড়িয়ে আছে তাঁর মাজার। তাঁর এই মাজারটিকে একদিকে মাজার ও অন্যদিকে একটি পাথরে খোদিত পুস্তক বলা যেতে পারে। তাঁর মাজার গাত্রে আরবী ফারসীতে বিভিন্ন লেখা ও কেতাবগুলি সত্যিই বিস্ময়ের সৃষ্টি করে। এই লেখাগুলির মধ্যে এক জায়গায় তাঁর নিজের নামের সঙ্গে জড়িত করে তাঁর নিজেরই দেওয়া তাঁর নামের সঙ্গে ব্যবহৃত কয়েকটা খেতাব রয়েছে। এই খেতাবগুলির মধ্য দিয়ে অতি সহজেই বোঝা যায় তিনি কে এবং কেমন লোক ছিলেন।

তাঁর নামের পূর্বের প্রথম খেতাব হোল—"আল মুহিববু লি আওলাদ-ই-সাইয়িদুল মুরছালিন।" মাজার গাত্রে উৎকীর্ণ শিলালিপি মুছে গেছে বহু লেখা পাঠের অযোগ্য হ'য়ে পড়েছে। তবুও তার মাঝে এই লেখাটি উজ্জ্বল তারকার মত জ্বলছে। যে পাথরটিতে এটি খোদাই করা হয়েছে পাথরটি দেখতে ঠিক কষ্টি পাথরের মত।" সাইয়িদুল মুরছালিন অর্থ নবী ও রসুলদের

www.pathagar.com

শীর্ষস্থানীয়। অর্থাৎ এখানে আমার রসুল মকবুল (দঃ) এর কথা নির্দিষ্ট করে বলা হয়েছে। এবং "আল মুহিব্বু লি আওলাদ" এর অর্থ তাঁর অর্থাৎ রসুল করিম (দঃ) এর আওলাদ বুনিয়াদের প্রতি একান্ত অনুরক্ত। তাই নিশ্চিত ও সঠিকভাবে তিনি ছিলেন, আল মুহিব্বু লি আওলাদই সাইয়িদুল মুরছালিন অর্থাৎ রসুলে পাক (দঃ) এর আওলাদ বুনিয়াদের প্রতি তিনি একান্ত অনুরক্ত ও মহব্বত করনেওয়ালা ব্যক্তি। যে ব্যক্তি তাঁর সব পরিচয় গোপন করেছেন, তিনি যে শুধু খানেআজম হযরত খানজাহান আলাইহের রহমাত। এই নাম-টুকু ছাড়া অন্য কিছুই জানবার অবকাশ রাখেননি,—তিনিই লিখে রেখে গেছেন তাঁর এই খেতাব তার কবর গাত্রে। এর তাৎপর্য কি?

নিশ্চয়ই এর একটা গুরুত্বপূর্ণ তাৎপর্য রয়েছে। এমন হ'তে পারে যে তিনি নিজেই রসুল পাক (দঃ) এর আওলাদ বুনিয়াদ শাখার অন্তর্ভুক্ত। তাই তিনি নিজের পরিচয় গোপন রাখার উদ্দেশ্যে নিজেকে রসুলের আওলাদ বুনিয়াদের প্রতি একজন মহব্বতকারী ও অনুরক্ত ব্যক্তি হিসাবে চিহ্নিত করেছেন। আবার এমনও হ'তে পারে যে তিনি সত্যিকারের ইসলামের একজন খাদেম। তাই তিনি রসুলের আওলাদ বুনিয়াদের প্রতিও একজন অনুরক্ত ব্যক্তি মাত্র।

আমার বিশ্বাস যদি তাঁকে জানবার জন্য এইসব সূত্র ধরে আমরা অগ্রসর হই ও ইতিহাসকে পথ নির্দেশক হিসাবে গ্রহণ করি তবে নিশ্চয়ই আমরা সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারব। ফকিরকে ফকিরের দরবারে ও বাদশাকে বাদশার দরবারে খোঁজাই উচিত। কিন্তু তার আগে জানা দরকার তিনি বাদশা ছিলেন না, ফকির ছিলেন। না বাদশা ফকির দুই-ই। গল্প আছে কোন এক বাদশার আত্নরী নামের একটি হাতী হারিয়ে গেল আর মাহুত তাকে মাঠে মাঠে খুঁজে ফিরল। তেমন ভাবে খুঁজলে তো আত্নরীকে পাওয়া যাবে না। শেষে বাদশা নিজে গিয়ে তাকে পাহাড় থেকে ধরে নিয়ে এসেছিলেন। ঠিক তেমনি ভাবে খুঁজতে হবে। ভেড়ার পালে মহিষের পালে খুঁজলে হাতীকে

www.pathagar.com

পাওয়া যাবে না। হাতীর পালেই হাতীকে খুঁজতে হবে। তাই আমাদের খোঁজা সার্থক হবে যদি প্রথমে কোথায় খুঁজব তার সঠিক স্থান নিরূপণ করতে পারি।

Law of criminal code-এর সূত্র ধরে মনস্তত্ত্ববিদেরা বলেন প্রত্যেক খুনী হাজার সাবধানতা সত্ত্বেও নিজের অজ্ঞাতে তার খুনের চিহ্ন রেখে যায়। আর এই চিহ্ন রেখে যায় বলেই সে একদিন ধরা পড়ে। সামান্য একজন খুনীর বেলায় যদি এ কথা সত্য হয় তবে যাঁর হাতে রাজদণ্ড ছিল, বাদশাহী ছিল আর যিনি নিজেকে "মুহিব বুলি আওলাদ-ই-সাইয়িদুল মুরছালিন" ও আরও উপাধিতে ভূষিত করেছেন তাঁর কোন পদচিহ্ন বা ইতিহাস রেখা খুঁজে না পাওয়ার কোন কারণ আছে বলে আমি মনে করি না। যদিও কালের ঘূর্ণায়মান চক্রে পড়ে, দীর্ঘ সময়ের ব্যবধানেও সময়ের কাজ সময়ে না করার ফলে সহজ কাজটি আজ কষ্টসাধ্য হয়েছে। তবুও আমার বিশ্বাস এ ইতিহাস উদ্ধার করা সম্ভব এবং তাঁর এ খেতাব গুলোকে চিহ্ন হিসাবে ধরে নিলে, সঠিক পথে এগিয়ে যাওয়া সম্ভব হবে।

তাঁর নামের সঙ্গে জড়িত এই খেতাবগুলোতে অন্ততঃ এটুকু নিশ্চিত হয়েছে যে তাঁর ইসলামের সঙ্গে একটা অবিচ্ছেদ্য যোগসূত্র ছিল। প্রথম খেতাবের পরে দ্বিতীয় যে খেতাবটি পাওয়া যায় সেটি হোল "আল মুখলিছু লি উলামা ইর রাশিদিন।" এটি তাঁরই দেওয়া। তাঁর দ্বিতীয় পরিচয় যাকে প্রথম পরিচয়ের পরিপূরক বলা যেতে পারে। এই জন্যই এর অর্থ ও ব্যাখ্যা দেওয়া প্রয়োজন।

"আল মুখলিছু" শব্দের অর্থ হচ্ছে সাহায্যকারী। নিকটতম সঙ্গী হিসাবে সৎকাজে সহায়তা দানকারীই হচ্ছে—"আল মুখলিছু"। কিন্তু এই সহায়তা দানকারী ছিলেন তিনি কাঁদের? "লি উলামা ইর রাশেদিন"-দের জন্য। অর্থাৎ সৎপন্থী আলেম উলামাদের জন্য। তাহলে তিনি ছিলেন সৎপন্থী আলেম উলামাদের একজন নিকটতম সহায়তা দানকারী। তিনি যে কেমন ব্যক্তি ছিলেন এটি তার দ্বিতীয় পরিচয়।

www.pathagar.com

তিনি খোলাফায়ে রাশেদিনদের আমলে আসেননি। রসুলে মকবুলের সাহাবা হ'তে পারেননি, তাবেরিনদের সময়েও আসেননি। তবে তাবেয়িন-দের কেউ হওয়া তাঁর পক্ষে স্বাভাবিক হতে পারে। খোলাফায়ে রাশেদিনদের তিনি ধর্মপ্রচারে বা ধর্মযুদ্ধে সহায়তা দান করতে পারেননি। কিন্তু ইসলাম প্রচারে তিনি নিজের জীবন উৎসর্গ করে গেছেন। শুধু তিনি নয়, জীবন উৎসর্গ করেছেন তাঁর ধর্মপ্রাণ ষাট হাজার মুরিদ সৈনিক ও আরও এগারোজন দোস্তদার আউলিয়া ও সৈন্যাধ্যক্ষ। যাঁর বুনিয়াদ আজও আমাদের সামনে স্থির হ'য়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে ও আমাদের অনুপ্রাণিত করছে। ধর্ম প্রচারের খাতিরে এদেশে এসে বিধর্মীদের সঙ্গে তাঁদের জেহাদ করতে হয়েছে।

আবার তাঁকে নবী করিম (দঃ)-এর পর ইসলামের খলিফাদের মত বাদশা-গিরিও করতে হয়েছে এবং তা করতে হয়েছে ইসলামকে জিন্দা রাখার খাতিরে; মানব কল্যাণের জন্য ও এই শান্তির ধর্মে মানবকে দীক্ষিত করার জন্য। জোর করে নয় বা জবরদস্তি করে নয়, ইসলামকে নিজের জীবনে আচার, আচরণে প্রতিফলিত করে মানুষকে মুগ্ধ ও বিমোহিত করে। আর এই কাজ কাঁদের দ্বারা সম্ভব? সৎপন্থী রিয়া ও হিংসাহীন উৎসর্গীকৃত আলেম ওলামাদের দ্বারা। তাই তিনি নিজেকে "আল মুখলিছু লি উলামাইর রাশিদিন" বলে আখ্যায়িত করেছেন এব তিনি নিজেও এই সৎপন্থী আলেম-উলামাদের একজন ছিলেন।

এ ক্ষেত্রে স্বাভাবিক ভাবে একটা প্রশ্ন এসে যায় যে তাহলে কি আর একদল অসৎপন্থী আলেম উলামা তখনও ছিলেন বা এখনও আছেন? এই প্রশ্নের সঠিক উত্তর প্রদান করতে গোটা যুগের ইতিহাস একটু আলোচনা করলেই আমাদের কাছে এই কথাই পরিস্ফুট হয়ে উঠবে যে একদল অসৎপন্থী আলেম উলামা আগের যুগেও বিদ্যমান ছিলেন এবং এ যুগেও বিদ্যমান আছেন। তাঁরা শুধু দুনিয়াদারির শান-শওকত ও বিলাসের জন্য তাঁদের এলেমকে তাঁরা চিরকাল কাজে লাগিয়ে থাকেন। এমনি যে আলেমদের দল, এই দলের তিনি মোখলেছ বা বিশ্বাসী সঙ্গী ছিলেন না।

www.pathagar.com

ইসলামের ইতিহাসে দেখা যায় যে বহু জবরদস্ত আলেম তাঁদের হেকমত ও প্রতিপত্তি বিস্তার করার মানসে একই আরবী শব্দের বিভিন্নরূপ অর্থের সংযোগ নিয়ে নিজেদের মত খাঁড়া করতে গিয়ে বিপথগামী হয়েছেন। যেমন খারেজি মতবাদের লোকেরা আলেম কম ছিলেন না। তাঁরা যুক্তির বেড়াজাল দিয়ে আল্লার বাণীকে ও তাঁর বক্তব্যকে ব্যর্থ করেছে। এ সম্পর্কে মওলানা রুমী তাঁর "সলবি রুমী"তে লিখেছেন যার অনুবাদ এইরূপ।

তাজা কর ঈমান তোমার কথায় নহে বাতেনীতে
প্রবৃত্তিরে করছ কেবল তাজা, সেজন অলক্ষিতে
প্রবৃত্তি যে তাজা বলে ঈমান তাজা নাহি রহে
প্রবৃত্তি যে সেই দরজার তালা ছাড়া কিছুই নহে
করলে সেজন টিপ্পনি ভাই শুদ্ধপুতঃ বচনগুলির কোরানে
নিজের কর টিপ্পনি ভাই নিন্দা ছাড়ি পুণ্যবানের॥

এই আলেমগণই, মওলানা রুমীর মনেও ব্যথার সঞ্চার করেছিল। বর্তমান যুগেও এই আলেমদের অভাব নেই। যে বাগেরহাটে হযরত খানজাহান আলাইহের রহমাতের মত একজন উলামা ইর রাশিদিন চিরনিদ্রায় শায়িত। সেই বাগেরহাটেই এমনি একজন আলেম তাঁর শিষ্যবর্গ নিয়ে আজও বহাল তবিয়তে বিদ্যমান। তিনি হলেন বাগেরহাটের বাসাবাটি গ্রামের মওলানা আবদুল করিম সাহেব। তিনি ও তাঁর সুযোগ্য মুরিদ ছাবদুল হাজী প্রচার করে বেড়ান আল্লার নামের সঙ্গে মোহাম্মদ (দঃ) এর নাম জড়িয়ে পড়া চলবে না। কলেমা তৈয়াব মারাত্মক ভুল। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু পর্যন্ত বলতে হবে। সঙ্গে মোহম্মদ রাছুলুল্লাহ্ বলা শিরিকি গুণাহ্। অর্থাৎ তাঁদের কথায় নবী আরও আসবেন এবং তিনিই সেই নবী। কোরানের কোন এক আয়াতের অর্থ তাঁরা এইভাবে করেছেন। শুধু এই কথা বলেই তাঁরা ক্ষান্ত হননি। ধনী ছাবদুল হাজী সাহেব এক একটা কাপড়ের বিনিময়ে গরীব মেয়েদের আরজ করে নিয়ে গিয়ে খাতনা দিয়ে চলেছেন। এতবড় অপরাধ ও নির্লজ্জতার পরাকাষ্ঠা তাঁরা দিনের

www.pathagar.com

পরদিন দেখিয়ে চলেছেন, কিন্তু কেউ আজও তাঁদের স্তব্ধ করে দেয়নি। শনিবার জুম্মা পড়া ইত্যাদি এ সব দিকেও ইশা নবী ও যিশু খৃষ্ট সম্পর্কে তাঁর যে মতবাদ তা ইহুদীবাদকেও ছাড়িয়ে যায়। তাঁরা নূতন যে কলেমা সৃষ্টি করেছেন তা হোল—লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু আল্লাহু আকবর। মাথার উপর হাত তুলে তাঁরা মোনাজাত করেন। কাজেই দেখা যায় যে, মানুষকে ধর্মের ভিতরে থেকে বিপথ-গামী করবার জন্য এইরূপ অসৎপন্থী আলেম উলামাদের কোন কালেই অভাব হয়নি বা আজও অভাব নেই। এই কারণেই আমাদের আলোচ্য হযরত খান-জাহান আলাইহের রহমাত এই উপাধি ধারণ করে এঁদের থেকে নিজেকে চির-কালের জন্য আলাদা করে রেখেছেন।

এখন একটি প্রশ্ন স্বাভাবিক ভাবেই এসে যায়, যে যিনি নিজের কোন ব্যক্তিগত পরিচয় প্রকাশ করলেন না, অথচ উদাত্ত কণ্ঠে প্রচার করলেন এবং ভবিষ্যতের মানুষের জানার জন্য তাঁর কবরের পাথর খোদাই করে লিখে রেখে গেলেন যে তিনি হলেন 'আল মুহিববু লি আওলাদই সাইয়াদিল মুরছালিন" "আল মুখলিছু লি উলামা ইর রাশিদিন।" ভাবার বিষয় এইটিই যে তিনি নিজেকে এভাবে প্রচার করে কি বুঝাতে চেয়েছেন? এবং এতে তাঁর কি উদ্দেশ্য হাসিল করার ছিল।

এই প্রশ্নের প্রসঙ্গে একটু ফকিরী মতবাদের আলোচনা করা যাক—। হযরত পীর খানজাহান আলাইহের রহমাতের মাজারে বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে বিভিন্ন ধরণের ফকিরগণ এসে হাজির হন। তাঁদের ফকিরী মতবাদে জেকের ও গানের মাধ্যমে তাঁরা তাঁদের সাধনায় লিপ্ত হন। তাঁরা তাঁদের নিজস্ব ধ্যান ধারণার ভিত্তিতে পীর খানজাহান আলীর আকৃতি ও চেহারার একটা রূপ দান করে থাকেন এবং জনসমাজে এ কথাটা প্রচার করে নিজেদের কেরামত জাহির করতে মোটেই ত্রুটি করেন না। এঁদের বর্ণনার সেই পীর খানজাহান বা পীর খানজাহান আলীর রূপ কি? উক্ত উপাধিধারী ব্যক্তিদের একজনের বর্ণনার একটু পরিচয় দেওয়া গেল।

www.pathagar.com

মাজারের আশে পাশে অবস্থানরত গাঁজা ও অন্যান্য নেশায় আসক্ত কিছু দেশী ও বিদেশী ফকির বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্র সহকারে গান গেয়ে প্রচার করে থাকেন যে আমরা মারফাতপন্থী ফকির, আমরা বাবার ভক্ত। বাবা আমাদের দেখা দেন, আমরা বাবার সঙ্গে কথা বলি। কলেজ জীবন থেকে এইসব ফকিরদের সঙ্গে মিশবার সুযোগ আমার হয়েছে। জিজ্ঞাসা করেছি: "বলতো, তোমাদের বাবা খাঞ্জালী দেখতে কেমন?" তখন তাদের মধ্যে কেউ কেউ "হক মাওলা," "ইয়া খাঞ্জালী" অথবা "পাক পরোয়ার" বলে চিৎকার করে অসম্ভব গম্ভীর হ'য়ে গেছে! কিন্তু কি বুঝাতে চেয়েছে সে এই "হক মাওলা" বা "পাক পরোয়ার" বলে চিৎকার করে, আমি বুঝতে পারিনি। আবার কেউ কেউ আমার মত নাছোড়বান্দার হাত এড়াতে না পেরে, কাউকে না বলার জন্য সাবধান করে দিয়ে গোপনে ডেকে নিয়ে বলেছে, খাঞ্জালী বাবার চেহারার কথা বলে শেষ করা যায় না। ফর্সা সুন্দর চেহারা, লাল তবন পরা, মাথার লাল পাগড়ী ও দুইটা লম্বা জটা আছে। তিনি সাদা দাড়িওয়ালা এক মস্ত ফকির।

চিকন কলকির সেবার বদৌলতে ফকিরি গঞ্জিকার দম যখন তুঙ্গে ওঠে তখন তাদের চোখে আকাশের তারকার মত বহু আলো জ্বলে ওঠে। তখন গাঁজার চূড়ান্ত দমটা তারা গলার ভিতর দিকে চালান করে দেয় এবং দম বন্ধ করে দমের ঘরে তালা দিয়ে চাবিটা তাদের সাঁইয়ের হাতে দিয়ে দেয়, আর নিজেরা আরশে মহল্লায় চলে যায় ও অসংখ্য আল্লার নূর দেখে। বরাত ভাল হলে কেউ কেউ আবার তাদের সাইয়ের কাছ থেকে চাবিটা চেয়ে নিয়ে এই মর্তলোকে নেমে আসে। আর বরাত খারাপ হলে বা শরীর দুর্বল থাকলে অনেকে আবার আরশে মহল্লায় থেকেই যায়, আর ফিরে আসে না। দেখেছি এই মাজারের আশে পাশে দূর থেকে, এসে কিছু ফকির ও সাইবাবা এমনি করে দেহ রেখেছে।

এইসব ফকির বাবার বর্ণিত "বাবা খাঞ্জালী" ও আমাদের আলোচ্য হযরত খানজাহান আলী (রঃ) কোন অবস্থাতেই এক ও অভিন্ন ব্যক্তি নন। তিনি নিজেই ছিলেন উলামা ইর রাশিদিনদের একজন।

www.pathagar.com

খোলাফায়ে রাশিদিনদের তিনি অন্ধ অনুসারী ছিলেন, কোরান হাদিসে ছিল তাঁর অগাধ পাণ্ডিত্য। এর প্রমাণ তাঁর কবর গাত্রে খোদাই করা রয়েছে। তাঁর মাজারে চারি খলিফার নাম লেখা আছে, সুরা ইয়াছিন, সুরা তাকাছুর লেখা রয়েছে। ধন দৌলতের অসারতার কথা লেখা রয়েছে। মাজারের খাদেমগণ মাজারের এইসব লেখা ধৌত করে মানুষকে পানি দিয়ে থাকেন। এখানেও চারজন প্রধান ফেরেস্তার নাম অর্থাৎ জিব্রাইল, মিকাইল, আজরাইল ও ইস্রাফিলের নাম লেখা রয়েছে। কিন্তু হযরত আলীর নামটি মাথার দিকে মাঝখানে লেখা। লেখা দেখলে মনে হয় যে হযরত আলীকে তিনি যেন একটু বিশেষ মর্যাদার আসন দিয়েছেন। এর কিছু কারণও রয়েছে। তাঁর জানা ছিল হযরত আলী সম্পর্কে রসুলে মকবুল (দঃ) বলেছেন, "আনা মদিনাতুল ইলমি ওয়া আলী বাবুহা", অর্থ-আমি যদি হই জ্ঞানের প্রজ্ঞা নগরী তবে আলী তার তোরণ দ্বার।" শুধু তাই নয় হযরত আলী আহলে বয়াতদেরও একজন।

কোন মুসলমান যদি আহলে বয়াতদের উপর ছালাম ও দরুদ পেশ না করে, যদি তাঁদের মঙ্গল কামনা না করে তবে সে বেহেস্তের আশা করতে পারে না। আল্লা পাক এই আহলে বয়াত সম্পর্কে পাক কোরানে আয়াত নাজিল করেছেন—"ইন্নামা ইউরিদুল্লাহ্ লি ইউজহিরা আনকুমর রিজসা আহলিল বায়তি ওয়া ইউতাহহিরা তাতহিরা"। অর্থ হে আহলে বয়াত, অবশ্যই আল্লাহ্ সংকল্পবদ্ধ যে তোমাদের থেকে সকল রকম অপবিত্রতা দূর করে তোমাদের যোগ্য পবিত্রতার আসনে প্রতিষ্ঠিত করবেন।" আবার এই আহলে বায়তের পরিচয় রসুলুল্লাহ্ এইভাবে দিয়েছেন, "আল্লাহুম্মা হাউলায়ি আহলি বায়তি আলিয়াল ওয়া ফাতিমাতা ওয়াল হাসান ওয়াল হুসায়েন রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুম।" রসুল করিম (দঃ) প্রার্থনা করেছেন আল্লার কাছে, হে আমাদের আল্লাহ্ আলী, ফাতেমা, হাসান-হুসায়েন আমার আহলে বয়াত। এঁদের উপর তুমি রাজি বা সন্তুষ্ট থাকো।

www.pathagar.com

জানা যায় রসুল করিম (দঃ তাঁর নাতিদ্বয়কে খুব ভালবাসতেন। একদিন মা ফাতিমার ঘরে খাবার ছিল না। তখন ইমাম হাসান ও হুসাইন মা ফাতিমাকে খাবার দেয়ার জন্য খুব পিড়াপিড়ি করলে মা ফাতিমা তাঁদের ভৎর্সনা করেন। মায়ের কাছে ভৎর্সনা খেয়ে দুভাই কাঁদতে কাঁদতে বাড়ী থেকে বেরিয়ে যায় এবং দুরে গিয়ে এক খেজুর বৃক্ষের নীচে ঘুমিয়ে পড়েন। তাঁদের দীর্ঘ অনুপস্থিতিতে মা ফাতিমা ব্যস্ত হ'য়ে ওঠেন ও তাঁর আব্বাজানকে গিয়ে এই সংবাদ দেন যে হাসান হুসাইনকে পাওয়া যাচ্ছে না। তখন নবী করিম (দঃ) ব্যস্ত হয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে পড়েন ও ডাকাডাকি করে তাঁদের খুঁজতে থাকেন। অনেক খোঁজা খুজির পর এক রাখালের কাছে সংবাদ পেয়ে দুই নাতিকে পেয়ে যান। তখন তাঁদের চুমু খেয়ে দুই নাতিকে দুই কাঁধে তুলে বাড়ীতে নিয়ে আসেন ও মা ফাতিমার কাছে দেন।

এই আহলি বয়াত যে কোথায় স্থান পেয়েছে তা সহজেই অনুধাবন করা যায়। নামাজ ও রোজাকে যে জীবনে প্রতিষ্ঠিত করেছে এবং এর তাৎপর্য যে জীবনে উপলব্ধি করেছে সেই প্রকৃত মুসলমান। কারণ এগুলি পালন করা ফরজ। আর নামাজ পালন করতে যে সব দোয়া ও দরুদের ব্যবস্থা আছে তা হল ওয়াজিব। নামাজের শেষাংশে আত্তাহিয়াতো পড়ার পর যে দরুদ পড়তে হয় তার অর্থ কি? অর্থ "হে আল্লাহ্ তুমি মুহম্মদ (দঃ) এর ও তাঁর আল আওলাদের মঙ্গল বিধান কর, যেমন মঙ্গল বিধান করেছ ইব্রাহিম ও ইব্রাহিমের (দঃ) এর আল আওলাদের জন্য।"

"হে আমাদের আল্লাহ্, তুমি মোহাম্মদ (দঃ) ও তাঁর আল আওলাদের বরকতময় বংশ প্রবর্দ্ধন ও শ্রীবৃদ্ধি সাধন কর। যেমন প্রবর্দ্ধন ও শ্রীবৃদ্ধি সাধন করেছ ইব্রাহিম ও ইব্রাহিমের আল আওলাদের জন্য।"

মুসলমান হ'য়েও, নামাজ পড়েও মুনাফেক কাফের ইয়াজিদ ও তার দল এই নবীর বংশকে হিংসা করেছে ও বিনাশ সাধনে লিপ্ত হয়েছে। নামাজ এদের জীবনে কোন তাৎপর্য বহন করে আনেনি। নামাজের দরুদের অর্থ যদি

www.pathagar.com

এদের মনে সামান্য প্রভাবও বিস্তার করত তবে নিশ্চয়ই ইয়াজিদ সৈন্য হুসায়েনের মাথা কেটে নিয়ে এসে জলদি আছরের নামাজ পড়তে চাইত না। তারা উপলব্ধি করেনি যে আল্লাহ্ তাঁর দোস্ত ও আওলাদদের নামাজের ভিতরে তাঁদের মঙ্গল কামনা করেছেন তাঁদের আল্লাহ্ কত পছন্দ করেছেন। তাঁদের থেকে শ্রেষ্ঠ আর কে হ'তে পারে? আর এই দরুদ ও মঙ্গল কামনার ভিতর দিয়ে আল্লাহ্ কি ভালবাসেন তা বুঝে নেয়ারও সুবিধা হ'য়ে থাকে। তাই যদি না হবে তবে এমন প্রার্থনা ওয়াজিব হ'বে কেন!

এই কথার প্রকৃত মর্ম হযরত খানজাহান আলাইহের রহমাত উপলব্ধি করেছেন বলে তিনি রসুলে মকবুল ও তাঁর আল আওলাদের প্রতি একজন মহব্বতকারী ব্যক্তি হিসাবে নিজেকে আখ্যায়িত করেছেন এবং নির্দিষ্টভাবে খেতাব নিয়েছেন—'আল মহিবব্ লি আওলাদই সাইয়িদিল মুরছালিন।'' আর দ্বিতীয় খেতাব—''আল মুখলিছু লি উলামা ইর রাশিদিন'' নিয়েছেন এইজন্য যে তিনি ঐসব আলেমদের থেকে নিজেকে সম্পূর্ণ আলাদা করে রেখেছেন যাঁরা রসুল বিরোধী ও আলী বিরোধী—আবদুল্লাহ্ ছাবা এবং হুসায়েন বিরোধী ইয়াজিদদের মছলা জীবনে কায়েম করেছে।

যারা মছলা দিয়েছে তরতীব মোতাবেক আয়াত-বয়াত দোয়া দরুদ, নির্ভুল ভাবে ঠিকমত আওড়ালেই নামাজ হয়ে যায়, উচ্চারণ ও দাড়ি কমায় ভুল না হলেই হোল, আয়াত-বয়াত দোয়া-দরুদে যে প্রার্থনা ও যা কিছু বলা হয়ে থাকে, নামাজ থেকে উঠে গিয়ে তার বিপরীত কাজ করলেও কিছু এসে যায় না, মুসলিম নিজের কোন ক্ষতি হয় না, হযরত খানজাহান আলী (রঃ) এই সব মছলাধারী আলেমদের দলে নন। যে সব আলেম বা বিদ্বানেরা যুক্তি দিয়ে জটিল কুহক জাল সৃষ্টি করে মানুষকে ধাঁধায় ফেলে নিজের ইচ্ছা ও মতকে প্রতিষ্ঠা করবার জন্য মরিয়া হয়ে ওঠেন তাঁরা তর্কবাগিশ হতে পারেন, কুটবুদ্ধি-সম্পন্ন হতে পারেন কিন্তু নিঃসন্দেহে তাঁরা রসুল বিরোধী ও আউলিয়া বিরোধী

www.pathagar.com

আলেম ছাড়া কিছুই নয়।

হযরত খানজাহান আলী (রঃ) এঁদের থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন ও স্বতন্ত্র এক ব্যক্তি, যিনি ঐ সব আলেম ওলামাদের সাহায্যকারী ও নির্ভরযোগ্য সঙ্গী যাঁরা বিনা তর্কে আল্লাহ্ ও আল্লার রসুলের পরে ঈমান এনেছেন এবং তাঁদের বাণীর ভিতর দিয়ে সঠিক পথ চিনে নিয়ে আল্লার কাছে মোমেন বলে চিহ্নিত হয়েছেন। যাঁরা আল্লার থিওরী কোরানের আদেশ জীবনের বিনিময়ে, বাস্তবে রূপদান করে মানুষের সম্মুখে তুলে ধরেছেন, ও রসুলের আওলাদের উপর মহব্বত রেখেছেন তিনি তাঁদেরই একজন। তিনি ছিলেন আলেম, মোমেন, ভক্তিবাদী, আল্লার প্রতি তাওয়াজ্জু মহাসাধক ও সুফী। যিনি আল্লাহ্ ও আল্লার রসুলের বাণী, ইসলামের তোরণদ্বার থেকে ইসলাম হাসিল করেছেন, সুফী সাধকদের অনুসরণ করেছেন, মারেফাতের অসাধারণ শক্তি হাসেল করেছেন, ও অলি আল্লাহ্ হয়েছেন। তাই হযরত খানজাহান আলী (রঃ)-এর জীবনে শরিয়ত ও মারেফাতের অপূর্ব সংমিশ্রণ ঘটেছে। মারেফাত হাসিল হয়েছে বলে শরিয়াতের প্রয়োজন নেই, এমনি কথার নজির তাঁর জীবনে নেই। তাহলে তাঁর বাস গৃহটি ৭টি দেওয়াল বিশিষ্ট হোত না। সৎপন্থী আলেম ওলামাগণ যাতে তাকে চিনতে ভুল না করে ও তাকে সঙ্গী হিসাবে মনে করে, এইজন্য এবং তর্কবাগিশ যুক্তিসর্বস্ব আলেমগণ যেন তাঁর দরজায় প্রবেশ না করে ও তাঁর সাহায্য না চায়। এই খেতাব ধারণ করার অন্তর্নিহিত অর্থ এই ছাড়া অন্য কিছুই নয়।

উপরের আলোচনা থেকে এ কথাটা সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে ইংরেজী দশম শতকের মাঝামাঝি সময়ে হযরত খানজাহান আলী (রঃ) দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার সমস্ত অলিদের মধ্যে একজন শীর্ষস্থানীয় ও উঁচু দরজার আলেম ছিলেন। যে কেন জ্ঞানী লোক তাঁর ধারণকৃত এ দুটি খেতাবের তাৎপর্য উপলব্ধি করে উপরোক্ত আলোচনার সত্যতা যাচাই করে নিতে পারেন।

মাজার গাত্রে খোদাই করা হুজুরের ধারণকৃত তৃতীয় খেতাব হোল "আল মুবগিজু লিল কুফ্ফারি ওয়াল মুশরিকিন" ও তাঁর চতুর্থ খেতাব

www.pathagar.com

হোল "আল মহ্নিনু লিল ইসলাম।" এই খেতাব দুটির অর্থ নিয়ে একটু বিস্তৃত ব্যাখ্যা দেওয়ার চেষ্টা করা যাক। "আল মুবগিজু" শব্দের অর্থ হোল ঘৃণা ও বিদ্বেষ পোষণ করি। এক কথায় "শত্রু" বলা যেতে পারে। তিনি একজন বিদ্বেষপোষণকারী শত্রু। কিন্তু কাদের? "লিল কুফফারি ওয়াল মুশরিকিন" তথা কাফের ও মোশরেকদের। অর্থাৎ এককথায় তিনি কাফের ও মোশরেকদের বিদ্বেষপোষণকারী একজন মহাশত্রু। কাফের ও মোশরেকদের অর্থাৎ যারা আল্লার শরিক করে, তাদের শত্রু হিসাবে চিহ্নিত হতে তাঁর বিন্দুমাত্র সংকোচ নেই, ভয় নেই ও ভীতি নেই। এই খেতাবের সঙ্গেই আর একটি খেতাব জুড়ে দেওয়া আছে। এটি চতুর্থ খেতাব যাকে তৃতীয় খেতাবের পরিপুরক বলা যেতে পারে। স্বাভাবিক ভাবে মনে এ প্রশ্ন এসে যায় যে কাফের মোশরেকদের মহাশত্রু যদি তিনি হন তবে বন্ধু কাদের? এই প্রশ্নের জবাব দিয়েছেন তিনি তাঁর পরবর্তী খেতাবে "আল মহ্নিনু লিল ইসলাম"। "আল মহ্নিনু" অর্থাৎ বন্ধু ও সাহায্যকারী "লিল ইসলাম" তথা ইসলামের জন্য। এক কথায় তিনি বন্ধু ইসলামের আর শত্রু ইসলামবিরোধীদের ; কাফের ও মোশরেকদের।

এরপর তাঁর চেতনা সম্পর্কে ও তাঁর ধারণার সুস্পষ্ট ইংগিত বহন করে এমন আর একটি কথা লেখা রয়েছে। সে কথাটি "হল" লাও লেমাল মাইন।" "উলুঘ" শব্দটার পূর্বেই এই শব্দটা লেখা রয়েছে। অনেকেই এ শব্দটা পড়তে ও অর্থ করতে অসমর্থ হ'য়েছেন। যশোরের মওলানা ও ইসলামের ইতিহাসের অধ্যাপক মওলানা আবদুল বাছেত বলেন, শব্দটা নিঃসন্দেহে "লাও লেমাল মাইন"। "লেওয়ামুল মুমিনিন" নয়—লাওলেমাল মাইন।" সঙ্গের "উলুঘ" শব্দের অর্থ "পৃথিবীর এই অবহেলিত প্রান্তে পড়ে আছেন একজন শীর্ষস্থানীয় খানজাহান। "লাও লেমাল মাইন" অর্থ পৃথিবীর এই অবহেলিত প্রান্তে পড়ে আছেন। "উলুঘ খানজাহান" অর্থ শীর্ষস্থানীয় খানজাহান অর্থাৎ 'বুজর্গ খানজাহান'। এখন ইতিহাস

www.pathagar.com

পর্যালোচনা করে যদি আমরা জানতে পারি যে ঐ সময় আউলিয়া ও বুজর্গ খানজাহান কে ছিলেন তাহলেই আমরা আমাদের খানজাহানের সঠিক ইতিহাস উদ্ধার করতে সক্ষম হব।

এখন কথা হচ্ছে তাঁর নামের পূর্বে ও নামের সঙ্গে জড়িত করে এই কথা দুটো ব্যবহারের তাৎপর্য কি? এবং এরই পূর্বের লকব দুটি, যেখানে তিনি নিজেকে কাফের মোশারকদের শত্রু ও ইসলামের বন্ধু হিসাবে নিজেকে জাহির করেছেন তারই বা তাৎপর্য কি?

"আল মুবগিজু লিল কুফফারী ওয়াল মুশরিকিন" এর অর্থ আমি আমার শ্রদ্ধেয় চাচাজী আলহাজ মৌলভী ইসহাকউদ্দিন সাহেবের কাছে জিজ্ঞাসা করেছিলাম। তিনি "আল মুবগিজু লিল কুফফারী ওয়াল মুশরিকিন" কে হতে পারে? তার ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে আবেগপ্রবণ কণ্ঠে তিনি বলেছিলেন—কতখানি জেহাদি মনোভাব হ'লে এই উপাধিতে নিজেকে ভূষিত করা যায়, সোবহানাল্লাহ্ তা আমার বর্ণনার অতীত। এর থেকে পাকা মুসলমান আর হয় না। তিনি যে কতবড় দরজার আল্লার অলি ছিলেন তা উপলব্ধি করা সাধারণ মানুষের পক্ষে বড়ই কঠিন। তাঁকে উপলব্ধি করার চেষ্টা কর, সকল ব্যাখ্যা সেখানেই মিলবে। এ কথার সত্যতা নিঃসন্দেহে প্রণিধানযোগ্য। তবুও এ খেতাবের বিষয়ে আরো একটু আলোচনা করা দরকার। এই খেতাবের পর তাঁর বিশেষ জোর দেওয়ার বা শহরত করে বলার কারণ এই যে তিনি এই উপাধি ধারণ করার যোগ্য কাজ করেছিলেন এবং এই উপাধি ধারণ করতে পেরেছিলেন বলে দো-জাহানে কামিয়াবী হাসিল করেছিলেন। শুধু তাই নয় এর মধ্য দিয়ে তিনি আমাদের জীবনেও কামিয়াবী হাসিল করার পথ বাতলে দিয়ে গেছেন। দ্বিধাহীন চিত্তে তিনি এক পথের অনুসারীদের বন্ধু ও অন্যপথ অনুসারীদের শত্রু বলে ঘোষণা করে দিয়ে আমাদের পথনির্দেশ করে গেছেন। তাঁর জীবনে কাফের মোরশেকদের সঙ্গে সংগ্রামে লিপ্ত হয়েই

www.pathagar.com

তিনি এই খেতাবের মালা গলায় পরতে সক্ষম হয়েছিলেন। হযরত খান জাহান আলী (রঃ) কেমন ছিলেন, তাঁকে জীবনে কত কঠিন কাজ করতে হয়েছে এবং তিনি কি নির্দেশ দিয়েছেন এই খেতাবের মধ্যে তা সম্পূর্ণ পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে।

তাঁর সারা জীবনের ইতিহাসে দেখা যায় কাফের মোশরেকদের সঙ্গে তাঁর কোনদিন আতাত সংঘটিত হয়নি। তাদের সঙ্গে তিনি আজীবন আতাতবিহীন সংগ্রামে লিপ্ত থেকেছেন। তিনি বুঝেছিলেন তাদের সঙ্গে কোন শর্তে আতাত করলে এদেশে ইসলাম প্রতিষ্ঠিত হবে না। তাঁর দুরদর্শিতা তাঁকে এ ধারণা এনে দিয়েছিল যে, অন্যের ধর্মে হস্তক্ষেপ না করা যেতে পারে, ধর্ম স্বাধীনতা সবাইকেই দেওয়া যেতে পারে, কিন্তু আতাতের অজুহাতে ধর্ম ও নিরপেক্ষতার নামে অন্য ধর্মের কোনরূপ পরোক্ষ পুজায় নিজেকে জড়িত করা চলবে না। পৃথিবীতে প্রচলিত অন্য সকল ধর্মই ইসলামের আদর্শের মুখাপেক্ষী এ কথা প্রমাণিত। কিন্তু ইসলাম কোনদিন এক আল্লাহ্ ব্যতীত কোন দেব-দেবী বা কারোরই মুখাপেক্ষী নয়। কারণ ইসলামই দুনিয়ায় সকল মানুষের জন্য আল্লার একমাত্র মনোনীত ধর্ম। যারা নিজেদের উপাস্যদের সকল কিছুর অসারতা বুঝেও জোর করে সত্যপথ থেকে দুরে রাখতে চায়, তাদের সঙ্গে কোনক্রমেই কোনরূপ আতাত চলে না। এ কথা খানজাহান আলী (রঃ) ভাল করেই বুঝেছিলেন। ইতিহাসের সাক্ষ্য তাঁর সম্মুখেই ছিল। দেখা গেছে যে মুসলমান বাদশা, আমীর বা খলিফা যখনই কাফের মোশরেকদের সঙ্গে আতাত করেছেন তিনিই ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছেন। ইসলামের খলিফা মোস্তাছিম বিল্লাহ্ ও মোগল বাদশা আকবর তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। খলিফা মোস্তাছিম বিল্লাহ্ বিধর্মী হিংস্র ও নৃংশস প্রকৃতির মঙ্গলদের সঙ্গে আতাত করে সমস্ত বুদ্ধিজীবি ও আত্মীয়দের পরম বিশ্বাসে তাদের হাতে তুলে দিলেন আর সঙ্গে সঙ্গে হালাকু খানের হাতে ধ্বংসপ্রাপ্ত হলেন। বাগদাদের সভ্যতা ধ্বংসপ্রাপ্ত হোল

www.pathagar.com

বাগদাদ শহর রক্তের বন্যায় প্লাবিত হয়ে গেল। শোনা যায় বড়পীর সাহেবের কিছু বংশধর ছাড়া আর কেউই পালাতে সক্ষম হয়নি। কারণ তারা এই আতাতের ভয়ানক ফলাফল বুঝতে পেরেছিলেন ও এর বিরোধিতা করেছিলেন।

আর বাদশা আকবর হিন্দুদের সাথে হাত মিলিয়ে তাদেরই কন্যা বিয়ে করেছিলেন। তাদেরই তিনি বিচক্ষণ বলে মনে করতেন। তাদের সৌহার্দ্যপূর্ণ কথায় তিনি ইসলামকে বাদ দিয়ে দীন-ই-এলাহি নামে একটা নূতন ধর্মের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন এবং এই ধর্মের নীতি অনুযায়ী দুই ধর্মের আত্মীয়তার ভিতর দিয়ে সমন্বয় সাধনে লিপ্ত হয়েছিলেন। কারণ তার বিধর্মী আত্মীয়কুল বলেছিলেন যে তারা যদি সরাসরি ইসলাম ধর্মগ্রহণ করে তবে তারা কাপুরুষ বলে বিবেচিত হবে কিন্তু যদি তিনি একটা নূতন ধর্ম তৈরী করতে পারেন তবে তারা সবাই সেই ধর্মে দীক্ষিত হবে। তাদের কথামত তিনি তাই করলেন। কিন্তু দেখা গেল যে তারা বিচক্ষণ বাদশা আকবরের সে ধর্মও গ্রহণ করল না। এবং তখনই তিনি বিচক্ষণতা হারিয়ে ইতিহাসে কলঙ্কিত হলেন ও আল্লার অভিশপ্ত হলেন ইহকালে এবং পরকালে। কাফের-মোশরেকদের আতাত চিরকাল এমনিই হয়ে থাকে।

ইসলামের গোড়ার ইতিহাসেও দেখা যায় যে ইসলামের ভিতরে মুসলমান নামধারী একদল লোক হযরত আবুবকরের (রাঃ) কাছে প্রস্তাব দিয়েছিল পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ ও রোজাকে একটু ছাট্ কাট্ করে কমিয়ে দিলে ইসলাম ধর্ম টিকে যাবে। লোকের কাছে ধর্মটা বড় কঠিন হ'য়ে গেছে, একটু সোজা করে দিলে এর প্রচার খুব ভাল হবে। কিন্তু হযরত আবুবকর (রাঃ) কোনদিন তাদের সঙ্গে আতাত করেননি বরং তার দাঁত ভাঙ্গা জবাব দিয়েছিলেন।

হযরত খানজাহান আলী (রঃ) ও তাঁর খলিফাতেআবাদ রাজ্যে

www.pathagar.com

খলিফাদের অনুকরণে ইসলামী আইন চালু করেছিলেন। ইসলামী নীতিতে তিনি অটল ছিলেন বলে বিধর্মীদের সঙ্গে কাফের মোশরেকদের সঙ্গে শত্রুতা করে তিনি টিকে থাকতে সক্ষম হয়েছিলেন, আর এই সক্ষমতা অর্জন করেই তিনি হয়েছিলেন আল্লার অলি। আজ ফাতেহা পাঠে তাঁর রওজা মোবারক নিত্য গুলজার তাঁরকীর্তিসমূহ তাই মহাকালের ভ্রুকুটিকে অগ্রাহ্য করে আজও স্থিরভাবে দাঁড়িয়ে রয়েছে। আল্লার অলি হিসাবে তাঁর নাম আজ সবাই শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করে। হয়তো কেয়ামত পর্যন্তই তাঁর কীর্তি-রাজি ও সুনাম আল্লাহ স্থায়ী রাখবেন।

ইতিহাসে দেখা যায় হযরত খানজাহান আলী (রঃ) এদেশে আগমনের কিছু পূর্বে আর এক ব্যক্তি এদেশে ইসলাম প্রচারে ব্রতী হয়েছিলেন। তিনি হলেন গাজী, কালু। শোনা যায় গাজী ও কালু দুই ভাই কিন্তু ইসলাম প্রচার করতে গিয়ে তিনিই বিভ্রান্ত হয়েছিলেন। গাজী কালু-চম্পাবতীর কেচ্ছা এদেশের মশহুর কেচ্ছা। এক সময় এদেশের ঘরে ঘরে এই পুঁথি পাঠ করা হোত। পুঁথির বর্ণনায় জানা যায় তিনি অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন। তাঁর স্থল বাহিনীতে ছিল বাঘ ও নৌবাহিনীতে ছিল কুমীর। এই বাঘ বাহিনীকে তিনি একদা যুদ্ধের সময়ে লোকালয়ের ভিতর দিয়ে ভেড়া বানিয়ে খেয়ার সাহায্যে যশোরের দড়া-টানা নদীর কূলে ভেড়ার ঘাট নামক স্থান থেকে পার করেছিলেন। এইরূপ অসাধারণ শক্তি সম্পন্ন ছিলেন এই ব্যক্তি। কিন্তু এসত্ত্বেও গাজী কালু ইসলাম প্রচারে ব্যর্থ হয়েছিলেন। এই ব্যর্থতার মূল কারণ অনু-সন্ধানে জানা যায় যে চম্পাবতী নামক এক হিন্দু রমনীর প্রেম উন্মাদনা ছাড়া আর কিছু নয়। তিনি ছিলেন রাজকন্যা তাঁর পিতার রাজ্য ছিল ২৪ পরগণা জিলার বসিরহাট বারাসাতে। এই হিন্দু রাজার সঙ্গে যুদ্ধে জয়লাভ করলে কি হবে, তার দ্বারা ইসলাম প্রতিষ্ঠিত হোল না। হিন্দুরা তাকে পূজা করতে আরম্ভ করল। চম্পাবতীর জন্যই তিনি এই আচরনের

www.pathagar.com

অন্য কিছুই বললেন না। তিনি ধর্মনিরপেক্ষ হলেন। তখন থেকেই মুসলমানদের মধ্যে একটা দলের সৃষ্টি হোল যারা না হিন্দু না মুসলমান। তাদের কাছে মারেফাত ও মার্গ এক হ'য়ে গেল। তারাই বর্তমানে জটা ও আশাধারী ফকির। এরা তখন আল্লাকেও মানতো আবার ওদিকে মনসা লক্ষ্মী সরস্বতীর পূজাও করতো। এই দলের মধ্যে কিছু ধর্মান্তরিত মুসলমানও ছিল। এরাই গাজী কালুকে পূজা দিতে শুরু করলো। যে প্রচলিত রীতি হিন্দু সমাজে আজও বিদ্যমান। তারা এই মুসলমান ফকিরকে সুন্দরবনে আজও পূজা দিয়ে থাকেন। সাতক্ষীরা লাবসাতে তাঁর নামে আজও একটা দরগা বিদ্যমান রয়েছে। কিন্তু এই সব ফকিরের আকড়া ছাড়া এখানে ইসলামের কিছুই নেই।

এদেশে পা দিয়েই হযরত খানজাহান আলী (রঃ) এই সকল কেচ্ছা কাহিনী সবই অবগত হয়েছিলেন যার ফলে তিনি আরও মজবুত ভাবে ইসলামকে আঁকড় ধরতে সক্ষম হয়েছিলেন। একমাত্র তাঁর দ্বারাই এদেশে সত্যিকারের ইসলাম প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। ইমানকে মজবুত রাখতে হলে যে ব্যক্তিত্বের প্রয়োজন হয় তা নিঃসন্দেহ তাঁর মধ্যে ছিল। ইমানকে মজবুত রাখার জন্য যার উপর ভরসা ও যার সাহায্যের প্রয়োজন হয় তাতেও তার কমতি ছিল না। তাই সর্ব্বশেষে তিনি তাকে এই বলে ঘোষণা করেছেন যে তিনি হলেন এমনই এক ব্যক্তি যিনি কোন মানুষ বা অন্য কিছুর মুখাপেক্ষী নন। তিনি হলেন— "আল মোহতাজ ইলার রহমাতিল আলামিন।" মোহতাজ অর্থ মুখাপেক্ষী, ইলা অর্থ দিকে, রহমাতিল আলামিন অর্থ সমস্ত রহমতের মালিক। অর্থাৎ তিনি ছিলেন সমস্ত রহমতের মালিক এক আল্লার ও শুধু মাত্র তার মাবুদেরই মুখাপেক্ষী অন্য কারো নয়। তাঁর জীবনের মূলমন্ত্র এইটিই ছিল বলে তিনি উপরোক্ত সকল উপাধিতে ভূষিত হতে সক্ষম হয়েছেন। তিনি সকল সময় আল্লার মুখাপেক্ষী ছিলেন বলে কোন যুদ্ধে বিজয় তাঁর কষ্টসাধ্য ছিল না।

www.pathagar.com

যুদ্ধ বিজয়ে তিনি আল্লার সাহায্য ছাড়া কোন মানুষের সাহায্য কোনদিন কামনা করেননি। তিনি ছিলেন একমাত্র আল্লার রহমতের কাঙাল। তাই মাজারের পাথরে তিনি খোদাই করেছেন—"অ ছরুম মিনাল্লাহে ওয়া খাতেমুন কারিব অবাশ শিরিল মুয়মিনিনা।" মোমেনদের জন্য আল্লার সাহায্য ও বিজয় অতি নিকটবর্তী।

উপরোক্ত আলোচনায় এটা নির্ভুলভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে হযরত খানজাহানআলী (রঃ) আল্লাহ্ ও আল্লার রছুলের নিশান উদ্ধার হয়ে ইসলাম প্রচারের উদ্দেশ্যে এদেশে এসেছিলেন যা তাঁর কীর্তির মাঝে তিনি আজও উন্নীত করে রেখেছেন। ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রথম দিকেই এদেশে ইসলাম প্রচারের কাজ শুরু হয়। কিন্তু তিনিই প্রথম ব্যক্তি যিনি জীবন উৎসর্গ করে এই দেশেই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করে এদেশে প্রকৃত ইসলামকে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হয়েছেন। ইসলাম প্রচার করতে গিয়ে, ইসলামের একজন খাদেম হতে গিয়ে তিনি জীবনে যে কত কঠোর পরিশ্রম করেছেন তা এই জামানায় বসে আমরা সম্যক উপলব্ধি করতে পারি না। কারণ এই জামানার লোকের মধ্যে অধিকাংশের আক্কেল নেই। আল কোরান আর এই কারণেই আমরা বুঝি না। তাই যারা আক্কেলওয়ালা এই নাবুজ অধিকাংশকে সঠিক পথে পরিচালনার দায়িত্ব তাঁদের। তাই এই আল্লার অলি অসীম ধৈর্য্যের সাথে তাঁর এই দায়িত্ব পালন করে গেছেন। এখানে যিনি অলিয়ে কামেল ছিলেন তাঁর মাজারে এসে যারা আলো পায় না, বয়ে নিয়ে যায় অন্ধকারের বোঝা তাদের মত পোড়া কপাল কমবকত আর এ জগতে নেই।

আমাদের বাগেরহাটবাসীর পরম সৌভাগ্য যে এই মহাদূরদর্শী, অসীম সহনশীল অলিয়ে কামেল, সুলতানুল আউলিয়া খানেল আজম হযরত খানজাহান আলাইহের রহমাত এই বাগেরহাটের মাটিতে শুয়ে আছেন। যিনি দুনিয়া থেকে শিরিক, বেদয়াত দূর করতে চেষ্টা করেছেন,

www.pathagar.com

মোশরেকদের শত্রু হয়েছেন, মৃত্যুর পরেও তাঁর মাজারের আশে পাশে সংঘটিত এইসব শেরেক বেদয়াত তিনি অকাতরে সহ্য করেছেন। এখানকার খাদেমদের নিয়ত হয়েছে শেরেক হোক, বেদয়াত হোক তাতে কিছুই এসে যায় না যদি নজর নেয়াজটা বহুল পরিমাণে বেড়ে যায়। তাই তারা কারো কাজে বাধা দিতে বা কাউকে অখুশী করতে রাজি নয়। আর শেরেক বেদয়াত সম্পর্কে তাদের কোন জ্ঞান আছে বলেও মনে হয় না।

আর এই স্থানের পূর্ণ মুসলমানী আখলাক কায়েম দেখতে চাই বলে আল্লার কাছে আমাদের প্রার্থনা—আল্লাহ্ যেন আমাদের সবার জ্ঞানচক্ষু খুলে দেন। এই মহাপুরুষের জীবনের আদর্শ যেন আমাদের জীবনের আদর্শ হয়। আমরা যেন নবী ও তাঁর পথ অবলম্বন করে ইসলামকে জীবনে কায়েম করতে পারি। জ্ঞান ও বিদ্যার মালিক যে আল্লাহ্ মানুষের নির্মিত সরস্বতী ও লক্ষ্মী নামক ঐ মাটির পুতুলগুলি নয়; যেখানে চাঁদা না দিলেও যে বিদ্যা আমাদের থেকে বিমুখ হয়ে যাবে না, কুমীরের নামে মানত না করলে বা একটা পাথরকে জড়িয়ে না ধরলেও যে সন্তান সন্ততি হ'তে পারে অন্তরে এ বিশ্বাস করবার তৌফিক এনে দাও। তোমার রহমতি ও কুদরতী হাতের ইশারায় এই অলির মাজার থেকে অনাচারগুলিকে দূর করে দাও।

---

www.pathagar.com

ইতিহাসের আলোকে হযরত খানজাহান আলী (রঃ)

যে সকল মহাপুরুষ অলি ও আউলিয়া দুনিয়াতে এসে নিজের সাধনা বলে আল্লাহর নৈকট্য লাভ করেছেন ও তাঁদের কর্ম ও কীর্তিবলে দুনিয়ার বুকে চিরঅমর হয়ে আছেন হযরত পীর খানজাহান আলাইহের রহমাত তাঁদের মধ্যে অন্যতম। প্রায় ছয়শত বৎসর পূর্বে তিনি মৃত্যুবরণ করেছেন। কিন্তু মহাকালের আকাশে ধ্রুবতারার মত উজ্জ্বল তাঁর শত শত কীর্তিরাজীর মধ্যে তিনি আজও বেঁচে আছেন ও ভবিষ্যতেও বেঁচে থাকবেন। আল্লাহ্ বলেন, "আল অলিও লাইয়ামুতু"—আল্লাহর অলি কখনও মরেনা। তাই তিনি জিন্দা ও তাঁর বিস্ময় সৃষ্টিকারী কীর্তির মধ্য দিয়ে মানুষের অন্তরে শ্রদ্ধার পাত্র হয়েও তিনি জিন্দা। তিনি একজন আউলিয়া ছিলেন বলে মানুষ তাঁর মাজার জিয়ারত করলে ফায়দা হাসিল হয় বলে হাজার হাজার মানুষ ভক্তিসহকারে নেকি হাসিলের উদ্দেশ্যে নেক বাসনা পূর্ণ হওয়ার মানসে, বিপদ থেকে উদ্ধার পাওয়ার আশায়, আজও তাঁর রওজা মোবারকে এসে হাজির হয়।

তিনি যে শুধুমাত্র একজন আউলিয়া ছিলেন ও ইসলামের খেদমত করেছেন মাত্র, তাই নয়, তিনি একজন দূরদর্শি রাজ্য শাসক, ধর্মপ্রচারক ও অসাধারণ ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন একজন মহামানবও ছিলেন। তিনি এই অঞ্চলের বিস্তীর্ণ এলাকা ও সমুদ্রপকুল জুড়ে ডাকাতি, খুন ও রাহাজানির অবসান ঘটিয়ে একটি শান্তির রাজ্য প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়েছিলেন এবং সকল শ্রেণীর জনগণের কল্যাণের জন্য আত্মোনিয়োগ করে তাঁদের মন জয় করতে সক্ষম হয়েছিলেন। আউলিয়া হিসাবে সর্বশক্তিমান আল্লাহর দরবারে তাঁর কত বড় স্থান ছিল একথা আমরা সঠিকভাবে বলতে না পারলেও তাঁর কর্ম ও কীর্তি অবলোকন করে একথা আমরা নিঃসন্দেহে বলতে পারি যে তিনি আল্লার সৃষ্টি মানুষকে ভালবেসে, স্নেহ দিয়ে তাদের

www.pathagar.com

সার্বিক কল্যাণে আত্মনিয়োগ করে, এদেশে জীবন ধারণে সাচ্ছন্দ এনে দিয়ে, মানুষের মনের মানুষ ও মাথার মুকুট হ'য়েছিলেন।

তাঁর শত শত কীর্তি মহাকালের নিষ্ঠুর আঘাতে যদিও আজ ধ্বংস প্রাপ্ত হ'য়েছে তবুও তাঁর সমস্ত স্মৃতিচিহ্ন মুছে ফেলা মহাকালের পক্ষেও আজও সম্ভব হয়নি। যদিও পরবর্তী কালের কিছু সংখ্যক লোভী ও হিংসুক মানুষের হস্তক্ষেপের ফলে তাঁর অনেক কীর্তির চিহ্নও নেই, তবুও মানুষের মনে আজও তাঁর স্মৃতি অমর হ'য়ে রয়েছে। বাগেরহাটের কাড়াপাড়ার তৎকালীন প্রতাপশালী হিন্দু জমিদার বাবু উমাকান্ত রায় ও শ্রীকান্ত রায় মরগা গ্রামের পালপাড়ার ছয়গুম্বজবিশিষ্ট বৃহৎ মসজিদটি ভেঙ্গে নিশ্চিহ্ন করে দিয়ে পার্শ্ববর্তী বাগমারা গ্রামে পুরানো ইটের ঐতিহ্য সৃষ্টির মানসে তাদের একটি কাছারী বাড়ী নির্মাণ করিয়েছিলেন। স্থানীয় খোন্দকার বংশের কেউ কেউ লোভের বশবর্তী হয়ে সোনাবিবির বাড়ীর দেওয়াল ও তাঁর ইটগুলি বিক্রি করেছেন। কেউ কেউ আবার মূল বাড়ীটি ভেঙ্গে তার ইট দিয়ে রাস্তা তৈরী করিয়াছেন। শুধুমাত্র কাড়াপাড়ার এই দুই হিন্দু জমিদারই নয়, বনগ্রাম ও নড়াইলের অন্যান্য জমিদারবৃন্দ মিলেও চেষ্টা করেছেন পুরানো মুসলিম ইতিহাসের উপাদানকে ভেঙ্গে ধুলিসাৎ করে দিতে, তাঁরা মিথ্যা প্রবাদের সৃষ্টি করে, স্বপ্নে দেখার অজুহাতে ইসলামের এই প্রতিনিধির নামে কলঙ্ক লেপন করতে চেষ্টা করে ও তাঁর মাজার ও মসজিদকে হিন্দুদের ঠাকুরের মন্দির বলে প্রচারণা করতেও দ্বিধাবোধ করেনি। তাই তাঁদের আমলের দুর্বল মুসলিমদের দুর্বল বাধাকে উপেক্ষা করে তাঁরা তার নির্মিত সুন্দর সুন্দর বহু মসজিদকে ভেঙ্গে ফেলেছেন। অপূর্ব ঢঙ্গে প্রস্তুত তাঁর বাড়ীটিকে ভেঙ্গে একটা মুসলিম পর্দানশীন বাড়ীর ঐতিহ্যকে তাঁরা নষ্ট করেছেন। অবশেষে অপারাগ হয়ে তাঁরা প্রচার করেছেন যে হযরত খানজাহান আলী (রঃ) হিন্দুদের মন্দির ভেঙ্গে রাতারাতি এইসব মসজিদ তৈরী করেছেন। এত কীর্তি ধ্বংসের পরেও মহাকালের বুকে আজ ও

তাঁর যা কিছু সৃষ্টি মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে রয়েছে তাই-ই চিরকাল মানুষের মনে বিস্ময়ের সৃষ্টি করবে। সেই সময়ে অর্থাৎ ছয়শত বৎসর পূর্বে মানুষের খাবার পানির অভাব দূর করতে তিনি যে শতশত দীঘি খনন করেছিলেন, আজও সেই দীঘির সুমিষ্ট পানি পান করে এদেশের নর নারী জীবন ধারণ করছে।

আধুনিক শিক্ষিত অনেক লোকেই আজকাল এমন মন্তব্য করে বলে থাকেন যে পানির অভাবতো একটা ডিপ টিউব ওয়েল দিয়েই পূরণ হতে পারে। তার জন্য এত বৃহৎ এলাকা জুড়ে দীঘি কেটে ফসলের জমি নষ্ট করার কোন অর্থই হয়না। কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে দেখা গেছে যে এই ধারণা ভুল। বর্তমানের বিজ্ঞানের প্রসারতার যুগেও আমাদের প্রয়োজনের খাতিরে তিনিও তাঁর এই অবদান নিয়ে আজও আমাদের পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন। ডিপ টিউবওয়েল বসানোর বহু প্রচেষ্টা ব্যর্থ হওয়ার ফলে সরকারী কর্তৃপক্ষ নিরূপণ করেছেন যে তাঁর দীঘি থেকে পানি সরবরাহ করলেই এখানে একমাত্র ভাল পানি পাওয়া সম্ভব এবং বর্তমানে বাগেরহাট শহরের "পানি সরবরাহ কেন্দ্র" তাঁর দীঘির পানিই শহরে সরবরাহ করছে। এদেশের মানুষের জীবন থেকে তাঁর কীর্তির প্রয়োজন আজও মুছে যায়নি এবং কোনদিনই মুছে যাবে না।

ভারত, পাকিস্তান ও গোটা এশিয়া মহাদেশেই শুধু নয়, অন্যান্য মহাদেশের লোকের কাছেও হযরত পীর খানজাহান আলী (রঃ) নাম আজ অত্যন্ত সুপরিচিত। পীর ও আউলিয়া হিসাবে আজ কত শতাব্দী ধরে লোকে তাঁকে অকুণ্ঠ ভক্তি শ্রদ্ধা নিবেদন করে আসছে। দেশবিদেশ থেকে বহু ঐতিহাসিক ও জ্ঞানী গুনী ব্যক্তিরা এসে থাকেন তাঁর কীর্তিরাজি দেখতে। যে দীঘির সুমিষ্ট পানির কথা পূর্বেই উল্লেখ করেছি সেই ঘোড়াদীঘি। পাড়ে অবস্থিত বৃহৎ ষাটগুম্বজ মসজিদ, বিশাল খাঞ্জালী দীঘি ওরফে (হিন্দু জমিদারদের আখ্যায়িত) "ঠাকুর দীঘি" তার পাড়ে

www.pathagar.com

নয়গুম্বজ মসজিদ, তাঁর মাজার ও সংলগ্ন মসজিদ, সব কিছু এমনই এক সুন্দর পরিবেশ সৃষ্টি করেছে যে প্রতিটি দর্শকের মনে একটা বিরাট বিস্ময়ের সৃষ্টি করে। স্বাভাবিক ভাবেই জানতে ইচ্ছা করে এই ব্যক্তি কে ছিলেন, কি তাঁর প্রকৃত জীবন ইতিহাস ? কিন্তু বিস্ময়ের ব্যাপার এই যে, যে ব্যক্তি এই কীর্তিমালার রচয়িতা তিনি তাঁর জীবনী বা ইতিহাসের চিহ্ন কোথাও রেখে গেলেন না। বংশ পরম্পরায় তাঁর ইতিহাস মানুষের মুখে মুখে চলে আসছে। এমনও শোনা যায়, আজ যেটি দশগুম্বজ মসজিদ এর পার্শ্বেই ছিল "হুসনি দালান" ও সরাইখানা। সেখানে একটি পুস্তকাগারও ছিল। কিন্তু সেই পুস্তকাগারের কাহিনী ছড়া আর কিছুই আমাদের দেখার বা শোনার সৌভাগ্য হয়নি। সেই হারানো ইতিহাস উদ্ধার করতে বসে আজও কেউ সঠিকভাবে বলতে পারলেন না যে ইতিহাসের কোন লোকটি এই ব্যক্তি।

তাঁর জীবনী আলোচনা করতে গিয়ে অনেকে শুধু এই মন্তব্যই করেছেন যে, "তাঁর জীবনের পূর্ববর্তী পরিচয় অত্যন্ত কুয়াশাচ্ছন্ন"। কেউ লিখেছেন, "এই মহাপুরুষের জীবন কাহিনী আজও আমাদের কাছে তমসাচ্ছন্ন।" প্রায় লেখকই এই কথা বলে লেখা শুরু করেছেন। আমিও এ কথার সত্যতা অস্বীকার করিনা। কারণ তাঁকে জানার চেষ্টা শুরু করার পর থেকে এমন কোন পুস্তক আমাদের হস্তগত হয়নি যাতে আমাদের জ্ঞান পিপাসা নিবৃত হতে পারে। এটা নিশ্চিত যে তিনি এদেশের মানুষ নন। কিন্তু তিনি কোন দেশের মানুষ ? কোন সময় তিনি এদেশে এসেছিলেন ? তাঁর আগমনের উদ্দেশ্যই বা কি ছিল ? তাঁর পিতামাতা ইবা কে ? তাঁর আসল নাম কি ? কোন প্রামান্য গ্রন্থের উল্লেখ করে এর সঠিক সিদ্ধান্ত আজও কেউ দিতে পারেননি। ফলে কোন লেখকই কোন সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারেন না।

আমাদের দেশের ইতিহাস সেদিন পর্যন্তও তাঁর সম্পর্কে সম্পূর্ণ উদাসীন ছিল। ইতিহাসের স্বর্ণযুগ সেই ইংরেজ আমলেও তাঁর ইতিহাস জানার জন্য কোন চেষ্টা চালানো হয়নি। বরং মুসলিম ইতিহাসের

www.pathagar.com

সুন্দর দিকগুলিকে কলঙ্কিত করার আপ্রাণ প্রচেষ্টা চালানো হয়েছে। তাঁর সমসাময়িক কোন লেখকের লিখিত কোন পুস্তক আজও আমাদের হস্তগত হয়নি। আর কিছু থাকলেও হুসনি দালানে রক্ষিত পুস্তকমালা এই মুসলিম বিদ্বেষী আমল পার হওয়ার পরও পাওয়ার কোন আশা করা যায় না। কিন্তু তাঁর হারানো ইতিহাস খোঁজার জন্য এমন কোন জোর প্রচেষ্টা আজও শুরু করা হয়নি।

তাঁর মাজারের পাথরে আজও বহু লেখা বর্তমান থাকলেও তাঁর সম্পর্কে আর কোথাও কিছু লেখা ছিল কিনা তাও নিশ্চিত করে বলা যায় না। কারণ মহাকালের বিবর্তনে অনেক লেখা পাথরের উপর থেকে মুছে গেছে। বর্তমানে যতদুর পাওয়া যায় তাতে দেখা যায় লিখিত আছে কিছু তাছাউফ, দরুদ, চার কুল, আল্লার ছেফাতি নামসমূহ, খোলাফায়ে রাশেদিনদের নাম, তাঁদের খেতাব, লকব ও মাজারের প্রথম দরজা দিয়ে ঢুকতেই তাঁর পায়ের দিকে যে অংশ সুন্দর কাপড়ের গেলাবে আবৃত, সেখানে লেখা রয়েছে তাঁর মৃত্যুর সন তারিখ ও নাম। দেখা যায় ৮৬৩ হিজরী ২৬শে জিলহজ্জ বুধবার ইংরেজী ১৪৫৯ সালের ২৩শে অক্টোবর তিনি মৃত্যুবরণ করেন। তাছাড়া এটি যে তাঁরই মাজার এরও একটা সঠিক নির্ণয়ের কথা মাজারে লিখিত আছে। হযরত খানজাহান আলী (রঃ) সম্পর্কে আর কোন প্রামাণ্য তথ্য এইরূপ নিশ্চিতভাবে অন্য কোথাও পাওয়া যায় না। অতীতের সাক্ষী হিসাবে ছড়িয়ে রয়েছে কিছু কেচ্ছা কাহিনী, দাঁড়িয়ে রয়েছে যশোর খুলনার বিভিন্ন স্থানে অসংখ্য জনপথ, রাজপথ, মসজিদ, দীঘি ও দরবার গৃহ। মাজারের পাথরে এমন অনেক লেখা আছে যার পাঠোদ্ধার করা আজও সম্ভব হয়নি। আজ পর্যন্ত হযরত খানজাহান আলী (রঃ) সম্পর্কে যে যত মতই প্রকাশ করুন না কেন তা সবই অনুমানের উপর ভিত্তি করেই করেছেন। অবশ্য এইসব অনুমান তাঁরা ইতিহাসের বিভিন্ন সূত্র ধরেই করেছেন। তাঁদের এইসব অনুমানকে জটাধারী, শিবভক্ত বা গাজীভক্ত,

www.pathagar.com

গঞ্জিকাসেবী মারেফাতপন্থী বলে আত্মপরিচয়দানকারী ফকিরদের বানোয়াট গল্প বলে উড়িয়ে দেওয়া যায় না।

হযরত খানজাহান আলী সম্পর্কে ইতিহাস আলোচনার প্রাক্কালে এ কথা স্বীকার করছি যে আমার বাল্যকাল থেকে শোনা প্রচলিত কেচ্ছা কাহিনী থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত বই কেতাবে যে সকল অভিমত আমি জানতে পেরেছি তার যতদূর সম্ভব উল্লেখ করেও ইতিহাসের আলোকে বিচার করে পাঠকগণকে আমি তাঁর জীবন ইতিহাসের সঠিক সিদ্ধান্তের দিকে নিয়ে যেতে চেষ্টা করব। ইতিহাসের প্রাপ্ত তথ্য হতে কিছু সঠিকভাবে বলা গেলেও, পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে পরস্পর সামঞ্জস্য রক্ষা করে এর সঙ্গে কিছু অনুমান সংযোগ করারও প্রয়োজন রয়েছে। তাঁর সম্পর্কে একটা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার এই ছাড়া অন্য কোন উপায় নেই। অবশ্য অলিয়ে কামেলদের কথা শুনে থাকি, তাঁরা মোরাকাবা মোশহেদার মধ্য দিয়ে তাঁর সম্পর্কে অবশ্য কিছু জানতে পারেন। কিন্তু যেহেতু আমাদের কোন শক্তি নেই, সেই হেতু ইতিহাসকে নির্ভর করেই আমাদের অগ্রসর হতে হবে।

হযরত খানজাহান আলী (রঃ) সম্পর্কে বলতে গিয়ে কেউ কেউ বলেছেন, "তিনি পারস্য দেশীয় একজন ধনবান মুসলমান। ব্যবসা বাণিজ্য সংক্রান্ত কাজে দিল্লীর সম্রাট মোহাম্মদ-বিন-তোঘলকের সময় ভারতে আগমন করেন এবং প্রথমে তাঁর অধীনে একটি সাধারণ সরকারী চাকুরী গ্রহণ করেন। পরে স্বীয় প্রতিভা বলে প্রধান উজিরের পদে উন্নীত হন। পরে ষাটহাজার সৈন্য ও এগারোজন আউলিয়াসহ ইসলাম প্রচার ও রাজ্যস্থাপন মানসে বাংলাদেশে আগমন করেন।" কেউ বলেন, "তিনি ইরান দেশীয় মুসলমান ব্যবসা বাণিজ্য সংক্রান্ত কাজে প্রথমে দিল্লীতে আসেন ও মূল্যবান পাথর বিক্রির উদ্দেশ্যে রাজদরবারে গমন করেন ও রাজদরবারে পরিচিত হন। তাঁর সততায় বাদশা তাঁর প্রতি আকৃষ্ট

www.pathagar.com

হন।" কেউ বলেন 'তিনি ইয়ামন দেশীয় একজন মুসলমান সওদাগর। ব্যবসা উপলক্ষে সপরিবারে দিল্লীতে আসেন।" কেউ আবার ভিন্নমত পোষণ করে বলেন, "সওদাগর ছিলেন তাঁর পিতা। বাল্য অবস্থায় হযরত খানজাহান আলী (রঃ) পিতা মাতার সঙ্গে দিল্লীতে এসেছিলেন। তাঁর পিতার মৃত্যুর পর তাঁর বিধবা মাতা বহু কায়ক্লেশে তাকে লালিত পালিত করেন। কিন্তু কোন লেখকই তাদের বর্ণিত ইতিহাসের সঠিক নজির হিসাবে কোন সন তারিখের উল্লেখ করেননি। সেই সময়ের ঘটনার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে তাঁর এদেশে আসার কারণ সম্পর্কে মোটামুটি একটা ঘটনাও তাঁরা বর্ণনা করেছেন।

তাঁরা লিখেছেন, "মোহাম্মদ বিন তোঘলকের উজিরে আজম থাকাকালে জুলুম, অত্যাচার, ষড়যন্ত্র, ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপ ও তজ্জনিত অসংখ্য লোকের প্রাণহানি দেখে তাঁর মনের অবস্থার একটা পরিবর্তন ঘটে এবং এই কারণেই তিনি প্রধানমন্ত্রীর পদ ত্যাগ করে জৌনপুরে চলে আসেন তারপর সেখানে তিনি বিরাট একটি মসজিদ নির্মাণ করেন এবং সেখানে বসেই তিনি দিনরাত আল্লার এবাদত বন্দেগী ও মানুষকে নছিহত করতে থাকেন। ঠিক এই সময় তিনি শাহ নেয়ামতুল্লাহ্ (রঃ) নামক জনৈক দরবেশের সাক্ষাৎ লাভ করেন। শাহ্ নেয়ামত উল্লাহ্ ছিলেন হযরত বড়পীর সাহেবের বংশধর ও একজন বিখ্যাত অলিয়ে কামেল। এই আলয়ে কামেলের নিকট যখন প্রথম হযরত খানজাহান আলী (রঃ) আগমন করেন তখন প্রথম দর্শনেই তিনি তাঁর আগমনের কারণ বুঝতে পারেন এবং তাঁর নিকট কিছুদিন অবস্থানের নির্দেশ দেন। হযরত খানজাহান আলী এই প্রস্তাবে রাজী হয়ে যান। অতঃপর এক শবে কদরের রাত্রিতে তাঁর পীর হযরত শাহ্ নেয়ামত উল্লার (রঃ) দোয়ায় সাধনায় সিদ্ধিলাভ করেন। ইসলামের জ্বলন্ত শিখা তাঁর ভিতর প্রজ্জ্বলিত হয়ে ওঠে।"......

"অতঃপর তিনি বহুদিন জৌনপুরে অবস্থান করেন এবং তার

www.pathagar.com

সুখ্যাতি চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে। তখন অসংখ্য লোক এসে তাঁর নিকট মুরিদ হতে থাকে ও মারেফাত বিদ্যায় জ্ঞানলাভ করতে থাকেন ঠিক এই সময় এগারোজন আউলিয়া সহ ইসলাম প্রচারের উদ্দেশ্যে, ইসলামের আলো থেকে বঞ্চিত বাংলার সুন্দরবন অঞ্চলে আগমন করেন।

ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে খলিফা মোস্তাজিজাবিল্লার সময়, হালাকু খানের বাগদাদ আক্রমনের প্রাক্কালে হযরত শাহ্ নেয়ামতউল্লাহ (রঃ) পলায়ন করতে সক্ষম হন। শুধু তিনিই নন, বড়পীর সাহেবের বংশের অনেক লোকই পলায়ন করতে সক্ষম হয়েছিলেন। এটা ১২৫৮ খৃষ্টাব্দের কথা। উপরের বক্তব্য সম্পর্কে আমার আরও বক্তব্য এই যে তাঁদের এই বক্তব্যের মধ্যে হযরত খানজাহান আলী (রঃ)র এদেশে আগমন ও ইসলাম প্রচারের নির্দিষ্ট সময়কাল তাঁরা উল্লেখ করেননি। এই বক্তব্যের মধ্যে তাঁর এদেশে আগমনের উদ্দেশ্য সম্পর্কে কিছু সত্যতা নিহিত থাকলেও একে সম্পূর্ণ সত্য বলে মেনে নেওয়া যায় না। কারণ এর মধ্যে সময়ের সামঞ্জস্য খুঁজে পাওয়া ভার।

হযরত শাহ্ নেয়ামতুল্লাহ্ (রঃ) যে বড়পীর সাহেবের বংশধর ছিলেন এ কথা সত্য কিন্তু হযরত খানজাহান আলী যে তাঁর মুরিদ ছিলেন তার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না বা এরূপ কোন যোগসূত্র যে কোনদিন ঘটেছিল সে সম্পর্কেও কিছু পাওয়া যায় না। শাহ্ নেয়ামত উল্লাহ (রঃ) তাঁর এই-রকম একজন মুরিদ সম্পর্কেও কোন বাণী রাখেননি। অথচ সময়ের একটা সামঞ্জস্য এই বক্তব্যের মধ্যে রয়েছে। মওলানা হাসান যশোরী লিখিত "হযরত শাহ্ সাহেবের ভবিষ্যৎ বাণী" গ্রন্থে মওলানা সাহেব বলেন যে "আজ হইতে প্রায় আটশত বৎসর পূর্বে দিল্লী শহরে হযরত শাহ্ নেয়ামত উল্লাহ্ নামক একজন প্রখ্যাত আউলিয়া বাস করিতেন।' জৌনপুরে তিনি বসবাস করেছিলেন বলে জানা যায় না। হযরত শাহ্ নেয়ামত উল্লাহ্ অতি বৃদ্ধ বয়সে ৮৩৪ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন ও হযরত খানজাহান

www.pathagar.com

আলী ইন্তেকাল করেন ৮৬৩ হিজরীতে। কাজেই তাঁদের সাক্ষাৎ সম্ভব হলেও হতে পারে। কারণ দিল্লী বা জৌনপুরের এই পীর সাহেব ছিলেন একজন প্রখ্যাত আউলিয়া। কিন্তু এই সময় দিল্লীর বাদশা ছিলেন ফিরোজ শাহ তোঘলক, মোহাম্মদ বিন তোঘলক নয়। কাজেই একই সময় মুহম্মদ বিন তোঘলকের প্রধানমন্ত্রী থাকা ও হযরত শাহ্ নেয়ামতউল্লার মুরিদ থাকা আদৌ সম্ভব নয়। কাজেই এখানে তাঁদের বর্ণিত কাহিনীর একটি গোজামিল পরিলক্ষিত হয়। তাই এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে এর কোন ঐতিহাসিক ভিত্তি নেই।

লেখক ভুল করেছেন এইখানে যে খানজাহান উপাধিধারী মোহম্মদ বিন-তোঘলকের যে প্রধানমন্ত্রী ছিলেন তাঁকেই তিনি আমাদের আলোচ্য বাগেরহাটের খানজাহান আলাইহের রহমত বলে ধরে নিয়েছেন। এইরূপ একটা সিদ্ধান্ত নেবার পূর্বে তিনি একবারও তাঁর কবরগাত্রে লিখিত মৃত্যু তারিখের সঙ্গে মোহাম্মদ-বিন-তোঘলকের প্রধানমন্ত্রী খানজাহানের সময়কাল মিলিয়ে দেখেন নি। অতএব একথা নিঃসঙ্কোচে বলা যায় যে আমাদের হযরত খানজাহান আলী (রঃ) ও মোহাম্মদ-বিন-তোঘলকের প্রধানমন্ত্রী খানজাহান এক ও অভিন্ন ব্যক্তি নয়। এবং যেহেতু তিনি ফিরোজ শাহ্ তোঘলকের সময়ের লোক নন যেহেতু হযরত শাহ্ নেয়ামত উল্লাহ্ (রঃ)রও মুরিদ নন।

অন্য একজন লেখক বর্ণনা করেছেন, "তিনি সম্রাট আকবরের সভাসদ ছিলেন। সম্রাট আকবর তাঁর প্রতি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হয়ে প্রচুর ধনরত্নসহ তাঁকে দক্ষিণাঞ্চলে সুন্দরবন এলাকায় এই জায়গীর প্রদান করেন।"

কিন্তু দেখা যায় এই লেখকও সময় নিরূপনে ভুল করেছেন। কিন্তু লেখকের অনুমানকে একেবারে অমূলক বলা চলে না। আইন-ই-আকবরীতে এমনি একটি ঘটনার উল্লেখ আছে বটে কিন্তু আকবরের সেই খানজাহান বৃদ্ধ বয়সে এসেছিলেন; তবে বাগেরহাটে তিনি আসেননি। তাঁর রাজধানী

www.pathagar.com

বিজয়পুরে ছিল বলে উল্লেখ রয়েছে। তবুও লেখক কেন এ অনুমান করেছেন বলা যায় না। আমার মনে হয় তিনি "আইনই আকবরীতে" খানজাহান নাম উল্লেখই যথেষ্ট মনে করেছেন। তাঁর রাজধানী বিজয়পুরকে মনে করেছেন রণবিজয়পুরই হবে। তা বাদেও এত বড় বড় দিঘী ও বিরাট বিরাট মসজিদ দেখে তিনি মনে করেছেন যে এই সকল নির্মাণ করতে যে বিপুল ধনরত্নের প্রয়োজন হয় তা ইতিপূর্বে এক আকবর বাদশা ছাড়া আর কারোরই ছিল না। কিন্তু আকবর বাদশার আমল যে ১৫৫৮ থেকে ১৬০৫ খৃষ্টাব্দে পর্যন্ত ও হযরত খানজাহান আলী (রঃ) ইন্তেকাল করেন ১৪৫৯ খৃষ্টাব্দে এটা মিলিয়ে দেখার অবকাশ তিনি আদৌ পান নি। কাজেই এটা একটি গল্প বিশেষ, কোন ঐতিহাসিক ভিত্তি এতে নেই।

হযরত খানজাহান আলী (রঃ) সম্পর্কে এইরূপ শতাধিক মত রয়েছে যার কোন ঐতিহাসিক ভিত্তি নেই বা ইতিহাসের সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষা হয়নি। সেই সমস্ত লেখকের সকল মতবাদ উদ্ধৃত করে এবং তা খণ্ডন করে অহেতুক কলেবর বৃদ্ধি না করে সম্ভাব্য মন্তব্যগুলির কিছু আলোচনা করে যাওয়াই আমি শ্রেয় মনে করি। তাই অনেক মন্তব্য আমি বর্জন করতে বাধ্য হলাম।

আমার বাল্যকাল থেকে আজ পর্যন্ত স্থানীয় প্রধান ও বিচক্ষণ লোকদের কাছ থেকে এবং বিভিন্ন দেশ ভ্রমণ করার সময় বিভিন্ন স্থান থেকে যতটুকু জানতে পেরেছি ও প্রচলিত গল্প কাহিনীতে যত যা কিছু জানতে পেরেছি না কেন তার মধ্যে সব কিছু বাদ দিলেও সর্বক্ষেত্রে একটা কথার মিল খুঁজে পাওয়া যায় যে তিনি সর্বপ্রথম বারোবাজার নামক স্থানে এসে আত্মপ্রকাশ করেন। অতএব এটা সঠিক ভাবে ধরে নেওয়া যায় যে এইস্থানে আত্মপ্রকাশকারীই আমাদের আলোচ্য খানজাহান আলী (রঃ)। এগারোজন আউলিয়া সহ বহিরাগত এই ব্যক্তি এখানে কারো মতে সর্বপ্রথম এসেছিলেন। তাঁকে নিজেকে সহ এই ১২

www.pathagar.com

জন ব্যক্তি বিপুল সৈন্যসহ কোথা হতে এখানে আগমন করেছিলেন,— এই মতামতের মধ্যে জৌনপুরের সমর্থকই বেশী। তারপর দিল্লীর ও তারপর গৌড়ের। তবে এর যে স্থান থেকেই তিনি যাত্রা করে এসে থাকুন না কেন সবাই এখানে একমত যে বিশাল সৈন্যবাহিনীসহ তারা বারেন্দ্র ভূমি পার হয়ে আসেন এবং বারোবাজারেই প্রথম ঘাটি স্থাপন করেন। পূর্বে এই স্থানের নাম কি যে ছিল তা আজ আর জানা যায় না। কিন্তু বারোজন আউলিয়ার নামানুসারে এই স্থানের নাম হয় বারোবাজার।

এই সূত্র ধরে অনেকে বলেন যে হযরত খানজাহান আলী (রঃ) জৌনপুর হ'তে সরাসরি বারোবাজার আগমন করেন। কিন্তু এই উক্তির মধ্যে সম্ভাব্যতা থাকলেও এ কথারও সুস্পষ্ট কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। ইতিহাসে উল্লিখিত খানজাহান উপাধি ধারণকারী অনেক ব্যক্তির মধ্যে তিনি কোন খানজাহান? বা এর কেউই যদি না হয়ে থাকেন তবে অন্য কোন ব্যক্তি এই প্রচলিত উপাধি ধারণ করেছিলেন? হযরত খানজাহান আলী (রঃ) সম্পর্কে কোন নির্দিষ্ট মতামত প্রকাশ করতে গেলে সর্বপ্রথম এই প্রশ্নেরই আলোচনা করা দরকার। অবশ্য ইতিহাস স্পষ্ট সাক্ষ্য দেয় যে জৌনপুরে মালিক সরোয়ার নামক দিল্লীর সুলতান কর্তৃক নিয়োজিত এক শাসনকর্তা ছিলেন। কিন্তু পরবর্তীকালে তিনিই দিল্লীর বাদশাহের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন ও ১৪৩৪ খৃষ্টাব্দে খানজাহান উপাধি ধারণ করে নিজেকে জৌনপুরের স্বাধীন সুলতান বলে ঘোষণা করেন। ফলে জৌনপুরের এই স্বাধীন সুলতান খানজাহানকে নিশ্চিতভাবে আমাদের আলোচ্য পীর খানজাহান আলী (রঃ) মনে করে অনেকে এরূপ উক্তি করেছেন। দেখা যায় তাঁরা সবাই এই পর্যায়ে এসে খানজাহান আলী (রঃ) যে ইতিহাসের কোন ব্যক্তি, তা জানা হয়ে গিয়েছে বলে নিস্তব্ধ হয়ে গিয়েছেন। অধিক আর অগ্রসর হবার প্রয়োজন তাঁরা মনে করেননি।

কিন্তু ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে জৌনপুরের

www.pathagar.com

মালিক সরোয়ার নামক যে খানজাহান, তাঁর প্রকৃত নাম ছিল খানজাহান শর্কি। তিনি স্বাধীনতা ঘোষণা করেন ১৩৩৪ খৃষ্টাব্দে ও মৃত্যুবরণ করেন ১৩৯৯ খৃষ্টাব্দে এবং জৌনপুরে আজও তাঁর মাজার বিদ্যমান। কাজেই একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে জৌনপুরের মালিক সরোয়ার খানজাহান ও আমাদের আলোচ্য হযরত খানজাহান আলাইহের রহমত এক ও অভিন্ন ব্যক্তি নয়। বিভিন্ন লেখকগণ সময়ের সামঞ্জস্য লক্ষ্য করে একই ভুল করেছেন। তাঁর বিশাল কার্যকলাপ দেখে তাঁরা তাঁকে রাজা বাদশা ও সুলতানদের আসরে খুঁজে ফিরেছেন মাত্র। কোন কোন প্রখ্যাত ঐতিহাসিকও এইখানে এসে স্তব্ধ হ'য়ে গিয়েছেন ও ঐ একই ভুল করেছেন। কোন এক প্রবন্ধে বন্দে আলী মিয়া শুধুমাত্র বলেন যে "তিনি জৌনপুর হ'তে সুদূর বাগেরহাটে আগমন করেন।" জনৈক আবদুর রহিম সাহেব ও প্রায় একই মত পোষণ করে বলেন যে "তিনি ছিলেন দক্ষিণবঙ্গের একজন স্বাধীন সুলতান। সম্রাট ফিরোজ শাহ তোঘলকের সময় দিল্লী হতে জৌনপুরে আসেন ও হযরত শাহ নেয়ামতউল্লাহ (রঃ) নিকট বয়াত হয়ে ইসলাম প্রচার উদ্দেশ্যে জৌনপুর হয়ে গৌড়ে যান। পরে গৌড়ের স্বাধীন সুলতান নাসিরউদ্দিন মাহমুদ শাহের অনুমতি নিয়ে সুন্দরবন অঞ্চলে গমন পথে প্রথম বারোবাজার আস্তানা স্থাপন করেন।

যদিও সময়ের একটা সামঞ্জস্য এখানে রক্ষা হয়েছে বলে জনাব রহিম সাহেব কাহিনীর একটা যোগসূত্র স্থাপন করেছেন। কিন্তু ফিরোজ শাহ তোঘলকের সময়ের এমন কোন সুলতানের বা খানজাহান উপাধিধারী কোন ব্যক্তির সন্ধান পাওয়া যায়না যিনি এইরূপ কোন অভিযান করেছিলেন বা ইসলাম প্রচারে বহির্গত হয়েছিলেন। কেউ কেউ বলেন যে "এই ব্যক্তির দিল্লী থেকে জৌনপুর হ'য়ে গৌড়ে আসবার কোন ইতিহাস নেই বা এখনও পাওয়া যায় না। আসলে তিনি ছিলেন গৌড় সুলতানের প্রতিনিধি।" (হেদায়েতুল ইসলাম খান)।

www.pathagar.com

এখন দেখা প্রয়োজন যে এই প্রকাশিত মতামতের ইতিহাসের আলোকে বিচার করলে ফলাফল কি হতে পারে। এক্ষেত্রে বিশদ আলোচনার ক্ষেত্রে একজন প্রখ্যাত ঐতিহাসিকের মতামত উল্লেখ করা বিশেষ প্রয়োজন বলে মনে করি। "যশোর খুলনার ইতিহাস" প্রণেতা স্বর্গীয় বাবু সতীশ চন্দ্র মিত্র মহাশয় তাঁর উক্ত গ্রন্থে বলেছেন যে, "বাগেরহাটের হযরত খানজাহান আলী ও জৌনপুরের স্বাধীন সুলতান খানজাহান আলী শর্কি এক ও অভিন্ন ব্যক্তি।" যদি তাঁর এ মতামত বা অনুমান সত্য বলে ধরে নেওয়া যায়, তবেই হযরত খানজাহান আলী (রঃ) দিল্লী থেকে আগমনের কথা সত্য বলে মেনে নেওয়া যায়। কিন্তু ইতিহাসের পাতা থেকে একথা স্পষ্ট প্রমাণিত হয় যে এই দুই ব্যক্তি মোটেই এক ও অভিন্ন ব্যক্তি নন। জৌনপুরের বিদ্রোহী ও বিঘোষিত স্বাধীন সুলতান খানজাহান আলী শর্কি মৃত্যুবরণ করেন ১৩৯৯ খৃষ্টাব্দে। তাঁর এই মৃত্যু তারিখ নিয়ে ঐতিহাসিকদের মধ্যে কোন দ্বিমত নেই। The History of Bagerhat এর লেখক জনাব মোজহারুল ইসলাম সাহেবও সতীশ বাবুর এই মত সমর্থন করে একই মন্তব্য করেছেন। কিন্তু এ কথা The History of Bengal এর লেখক ডঃ রমেশ চন্দ্র মজুমদার মহাশয় মেনে নেননি এবং আমরাও মেনে নিতে পারিনা। রমেশ বাবু তাঁর History of Bengal vol II তে বলেন, "We have Noticed before how, during the period of counfusion following the invasion of Timur Khwaja Jahan threw off his alligience to the Delhi Sultanat and founded a dinesty of independent rulars at Jaunpur, khown as the Sharki Dynesty after his title Malikush sharque." He died in 1399 leaving his throne to his adopted son Malik Quaranful." এখানে পরিষ্কার জানা যায় তিনি হলেন খাজাজাহান এবং তাঁর রাজ্য তার পালিত

www.pathagar.com

পুত্র মালিক কারামফুলের হাতে দিয়ে তিনি ১৩৯৯ খৃষ্টাব্দে মৃত্যু বরণ করেন। এবং এই খাজাজাহানই মালিক উসশর্ক উপাধি ধারণ করে দিল্লী সুলতান'তের প্রতি বিদ্রোহী হন ও জৌনপুরের সিংহাসনে আরোহন করেন। তাঁর থেকেই জৌনপুরে শর্কি বংশের পত্তন হয়।"

জানা যায় দিল্লীর সুলতান যখন তাঁকে জৌনপুরের শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন তখন শাসনভার গ্রহণ করার পর ব্যক্তিগত জীবনের যে কোন দুঃখজনক ঘটনার কারণে তাঁর ভিতর প্রতিহিংসার আগুন জ্বলে ওঠে। তিনি বিদ্রোহ ঘোষণা করলেন ও নিজেকে স্বাধীন সুলতান বলে ঘোষণা করলেন। দিল্লীর দরবারে থাকাকালীন দিল্লীর সুলতান এক সময় তাঁর প্রতি বড় নির্দয় ব্যবহার করেছিলেন। কেউ কেউ অনুমান করেন যে তাঁর প্রতি নির্দয় ব্যবহার এই ছিল যে, কোন এক অজ্ঞাত কারণে তাঁকে খোজা করে দেওয়া হয়েছিল। প্রথম জীবনে তিনি খোজা ছিলেন না। এই বেদনাই তাঁকে দিল্লীর প্রতি হিংস্র করে তোলে।

জৌনপুরের এই খানজাহান শর্কি ছিলেন খোজা তাই তাঁর কোন পুত্র সন্তান ছিলনা। ফলে মৃত্যুকালে তিনি তাঁর পালিত পুত্র মালিক কারানফুলের হাতে জৌনপুরের শাসনভার অর্পণ করে যান। এতদসত্ত্বেও এই দুই ব্যক্তিকে সতীশ বাবুর অভিন্ন ব্যক্তি হিসাবে মনে করার একটি মাত্র কারণ পাওয়া যায়। বাগেরহাটের বিভিন্ন এলাকায় পীর খানজাহান আলী (রঃ) সম্পর্কে এমনি একটি প্রবাদ প্রচলিত রয়েছে যে তাঁর কোন পুত্র সন্তান ছিল না, কারণ তিনি জীবনে বিবাহ করেননি। তিনি খোজা ছিলেন। এই প্রবাদেরও এইরূপ প্রতিবাদ উঠেছিল যে তাহলে তাঁর বাড়ীতে যে মহিলা ছিলেন তিনি কে? কে বা কাহারা উত্তর করেছিলেন, আসলে তিনি তাঁর স্ত্রী নন, তাঁর পাচিকা। সতীশ বাবুর উপরোক্ত অনুমানের এই একটি ছাড়া অন্য কোন সূত্র খুঁজে পাওয়া যায়না। এই প্রবাদটির প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের ফলেই এইরূপ অনুমান করা সম্ভব

www.pathagar.com

হয়েছে। কিন্তু এই অনুমানের কোন ঐতিহাসিক মূল্য নেই। হিন্দু জমিদারদের রীতির অনুকরণে তিনি বিধবা পাচিকা রাখতেন বলে বিশ্বাস করা যায় না। তবুও এই প্রবাদের সূত্রটুকু ধরেই সতীশ বাবু এবং পরবর্তীকালে অনেকেই এই মত সমর্থন করে সুদূর জৌনপুর থেকে খানজাহান শকিকে বাগেরহাটে আমদানী করেছিলেন। কিন্তু দুজনের মধ্যে যে সময়ের ব্যবধান দেখা যায় তা হোল ১৩৯৯ খৃষ্টাব্দে শকির মৃত্যু তারিখ ও ১৪৫৯ খৃষ্টাব্দে খানজাহান আলীর (রঃ) মৃত্যু তারিখ। মৃত্যুকালের পার্থক্য ৬০ বৎসর। কাজেই তাঁরা কোন মতেই অভিন্ন ব্যক্তি হতে পারেন না।

এ ছাড়াও প্রামাণ্য ইতিহাস গ্রন্থ "তাওয়ারিখে ফেরেশতায়" দেখা যায় যে খাজা জাহান ৬ বৎসর রাজত্ব করার পর ৮০২ হিজরীতে মৃত্যুমুখে পতিত হন ও তাঁর পালিত পুত্র মালিক কারামফুল মোবারকশাহ নাম ধারণ করে জৌনপুরের সিংহাসনে আরোহণ করেন। পরবর্তীকালে মোবারক শাহ ইকবাল খানের সঙ্গে যুদ্ধে ৮০৪ হিজরীতে মৃত্যুমুখে পতিত হন" (উর্দু অনুবাদ থেকে) এরপর দেখা যায় যে ফিরোজ শাহ বরবক এর মন্ত্রী মালিক ফিরোজ আলী আছর খান-ই-জাহান উপাধি পান।" কিন্তু তাঁর দক্ষিণবঙ্গে আগমনের কোন ইতিহাস খুঁজে পাওয়া যায় না। (আবুল কাশেম ফেরেশতা) তাঁর সম্পর্কে আরো মতামত আলোচনার পূর্বে প্রচলিত প্রবাদ ও তাঁর প্রকারভেদ সম্পর্কে একটু আলোচনা করা প্রয়োজন।

একথা অনস্বীকার্য যে, প্রবাদের বিভিন্ন রকম প্রকারভেদ রয়েছে। গল্পের প্রয়োজনে ও স্বীয় কথার সমর্থনে মানুষ প্রবাদ সৃষ্টি করে। কিন্তু নিরপেক্ষ দৃষ্টি ও পারিপার্শিকতা দিয়ে তার গুরুত্ব নিরূপণ করা ও সত্যতা যাচাই করা সম্ভব। অনেক প্রবাদের সৃষ্টি হয় উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য ও বক্তব্যের প্রয়োজনে। এগুলি কোন এক সময় কে বা কাহারা সৃষ্টি করে

www.pathagar.com

থাকে। আর কিছু প্রবাদ রয়েছে যা সত্য, কিন্তু তার সঙ্গে কিছু মিথ্যা অলংকার জড়িত হ'য়ে গিয়েছে। তাঁর বিবাহ সম্পর্কে যে প্রবাদটি ছড়িয়ে রয়েছে বাস্তব প্রমানাদি সহকারে তাঁর একটু বিচার বিশ্লেষণের প্রয়োজন রয়েছে। কারণ ইতিহাসে অনেক খানজাহান আলী সম্পর্কে অনেক কথার উল্লেখ রয়েছে। যার ফলে বাগেরহাটের হযরত খানজাহান আলী (রঃ) কে তাঁকে খুঁজে বের করা একটু মুশকিলই হয়ে পড়েছে। তিনি বিয়ে করেননি এবং তিনি খোজা ছিলেন। এই কথা সত্য ধরে নিয়ে অনেকে তাঁকে ইতিহাসের খাজা জাহানকে এই খানজাহান মনে করেছেন।

বাগেরহাটের খানজাহান আলী (রঃ) যদি বিয়ে না করে থাকেন আর যদি জৌনপুর থেকে ফকিরি হালাতে মরণের আগে বেরিয়ে থাকেন তবে এই সামান্য কদিনের জন্য নিশ্চয় তিনি তাঁর পুত্র কারামফুলকে তার জন্য একটা দুর্গসম বাড়ী বা প্রাসাদ তৈরী করবার আদেশ দিতেন না। এবং ফকিরি হালাতে এই বাড়ীর ও তাঁর এমন প্রয়োজন ছিল না। এবং তাঁর শেষ জীবনের এই অল্প সময়ের মধ্যে এত কীর্তিরাজি কেমন করে সম্ভব তাও বিচার্য বিষয় বটে। কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে দেখা যায় যে আমাদের আলোচ্য খানজাহান আলীর (রঃ) একটি সুন্দর প্রাসাদতুল্য বাড়ী ছিল। এই বাড়ীটি যে শুধুমাত্র প্রাসাদই ছিল তাই নয়, তার ভগ্নস্তূপ ও স্মৃতিচিহ্ন আজও বিদ্যমান। একজন অবিবাহিত লোকের জন্য এমন দেওয়ালঘেরা বাড়ীর কি প্রয়োজন, সেটাও একটা চিন্তার বিষয়। ইদানীং অনেকের মনে এই বিশ্বাস জন্মেছে যে তিনি বিবাহিত ছিলেন। তাঁরা প্রশ্ন করেন, "যদি তিনি বিবাহ না করে থাকেন তবে ষাটগুম্বজ মসজিদ ও তাঁর মাজারের মধ্যবর্তী স্থানে, বর্তমানে কাঠালতলা নামক স্থান হতে মরগার হাটে যাবার রাস্তাটির প্রান্তে "সোনা বিবির" বাড়ী নামে যে বাড়ীটির চিহ্ন আজও বিদ্যমান, যেখানে

www.pathagar.com

তিনি বসবাস করতেন বলে শত শত কেচ্ছা রয়েছে। এটা কি তাঁর বাড়ী ছিল না? এবং সোনা বিবি যদি এ বাড়ীতে থাকতেন তবে সোনা বিবির সঙ্গে তাঁর সম্পর্কইবা কি ছিল? তিনি কি তাঁর স্ত্রী নন? যদি স্ত্রী না হয়ে তিনি কারো মতে রক্ষিতা বা পাচিকা হয়ে থাকেন তবে কেমন করে লোকে তাঁকে পীর বলে এত বড় স্বীকৃতি দান করল? কেমন করে তাঁর এত কেরামতি জাহির হোল?

গল্প ও প্রবাদ ছড়িয়ে রয়েছে যে সোনা বিবির বাড়ীতে পাথরের ঢেঁকি ছিল। সেই ঢেঁকিতে দাসী বাদীরা ধান ভানতো, গম ভাংতো। কিন্তু শুধুমাত্র শব্দ শোনা যেতো অথচ তাঁদের দেখা যেত না। এত বড় বড় যাতা ছিল যে সাধারণ মানুষের পক্ষে তা ঘোরানো সম্ভব বলে মনে হয় না। লোকে বলে এসব যাতায় জিনে এসে আটা পিষে দিয়ে যেত। এই প্রবাদের কিছু সত্যতার প্রমাণ হিসাবে সেই ঢেঁকি ও যাতা আজও বিদ্যমান রয়েছে। নিকটবর্তী একটি ছোট বাড়ীতে এসব আজও তাদের হেফাজতে রয়েছে। তারপর সোনা বিবির বাড়ীটির মূল ঘরের চিহ্ন থেকে বেশ কিছু দূরে ৩টি দেওয়ালের চিহ্ন আজও বিদ্যমান। শোনা যায় ৭টি চওড়া দেওয়ালে পরিবেষ্টিত ছিল এই বাড়ীটি। এই দেওয়ালের অনেক ইট মাটি খুঁড়ে বের করেও বিক্রী করে দেওয়া হয়েছে তবুও অর্থ ব্যয় করে খুড়ে দেখলে ৭টি দেওয়ালের নজির মনে হয় আজও পাওয়া যাবে। এই বাড়ীর ভিতরে "বিচ পুকুর" নামে একটি পুকুর ছিল। এর পানি খুব স্বচ্ছ। "বীচ" নামের এই পুকুরটি আজও বিদ্যমান থেকে এর অস্তিত্ব ঘোষণা করছে। বীচ শব্দের অর্থ মধ্যে। বাড়ীর ভিতরের পুকুর বলেই একে "বীচ পুকুর" বলা হোত। এখানে সোনা মসজিদ নামে এক গুম্বজ বিশিষ্ট একটি সুন্দর মসজিদ ছিল। কিন্তু কালের গর্ভে আজ তার অস্তিত্বও বিলীন হয়ে গিয়েছে। এই বাড়ীটির ধ্বংসস্তুপের মধ্যে

www.pathagar.com

ঢেঁকি ছাড়াও অনেক বড় বড় পাথর পাওয়া গিয়েছে এবং আজও পড়ে আছে যা হয়ত বাড়ীটির খাম্বা হিসাবে ব্যবহার করা হয়েছিল। বেশীদিন আগের কথা নয়, মরগা গ্রামের পালপাড়ার ছত্রধর পাল ও অন্যান্য লোকেরা এই বাড়ীর নিকটেই মাটি খুঁড়তে গিয়ে বাক্স ভর্তি যে সোনার গহনা পেয়েছিল তা সবই মহিলাদের আংটি ব্রেসলেট, চুরি, রুলি ইত্যাদি। এই গহনাগুলি সবই পশ্চিমা মহিলাদের গহনার অনুরূপ। মরগা গ্রামের মতিয়ার রহমান নামক জনৈক বিশিষ্ট ব্যক্তি তৎকালীন এস, ডি, ও, বাহাদুরের সহায়তায় এর কিছু কিছু উদ্ধার করে সরকারের তহবিলে জমা দিতে সক্ষম হয়েছিলেন। তিনি আজও জীবিত রয়েছেন।

উপরোক্ত প্রমানটির দ্বারা সোনা বিবি যে কে ছিলেন মনে হয় তা আর বলার অপেক্ষা রাখেনা। একজন পাচিকার জন্য এত দামী গহনা ও এইরূপ প্রাসাদ বাড়ীর কোন প্রয়োজন হয় বলে আমার মনে হয় না। সোনা বিবি সম্পর্কে প্রাপ্ত প্রবাদের সঙ্গে অধুনাপ্রাপ্ত এই নজিরগুলি এই কথাই প্রমাণ করছে যে সোনা বিবি নামে এই মহিলা হযরত খানজাহান আলী (রঃ) এর বাদী ও স্ত্রী ছিলেন। পাচিকা বা রক্ষিতা বলে রটনা করা প্রবাদটি আদৌ সত্য নয়।

এ কথা আজ নিঃসন্দেহে বলা যায় যে এই সোনা বিবি নামে পরিচিত মহিলাটিই ছিলেন হযরত খানজাহান আলীর (রঃ) বাদী ও স্ত্রী। এবং সপ্ত দেওয়াল ঘেরা বাড়ীতে ইসলামিক শরা-শরিয়াত মত, পর্দার ভিতরে রেখে তাঁকে নিয়ে তিনি সুখী দাম্পত্য জীবন যাপন করেছেন। নিশ্চয় তিনি তাঁর কোন সাধারণ দাসী বাদী হতে পারেন না। কারণ তিনি ছিলেন অলিয়ে কামেল। তাঁর নামের শেষে লেখা আছে "আলাইহের রহমাত," খেতাব রয়েছে লি আওলাদই সাইয়িদুল মুর ছালিন" ইত্যাদি। রক্ষিতা কথাটি পরবর্তীকালে কাফের মোনাফেকদের একটি

www.pathagar.com

ঘটনা মাত্র। কারণ তাদের তিনি চিহ্নিত শত্রু ছিলেন। সেদিনের হিন্দু জমিদারগণও তাঁর ও এই স্থানের মর্যাদা ক্ষুন্ন করতে কম যে চেষ্টা করেননি।

তবে একটা কথা রয়েছে। অনেকে যুক্তি হিসাবে বলেন যে "সোনা বিবি কি একটা নাম হোল। আর এমনি সাধারণ নামের কোন মহিলা হযরত খানজাহান আলী (রঃ) এর মত লোকের স্ত্রী হ'তে পারে? এই কথার জবাবে আমার বক্তব্য এই যে এই নামটি সত্যই হযরত পীর খানজাহান আলী (রঃ) এর স্ত্রীর নাম নয় এবং হতেও পারে না। তবে এ নামটি কি? সঠিক কথা হোল, সপ্ত দেওয়াল পরিবেষ্টিত এই বাড়ীর মধ্যে পর্দানশীন জীবন যাপনে রত এই মহিলাকে, প্রবাদ সৃষ্টিকারী এই দেশের মানুষেরা কেউ কোনদিন দেখেনি। কিন্তু পীর খানজাহানকে তারা দেখেছে। তাদের হুজুর তাদের বাদশা জনদরদী খানজাহান আলী (রঃ) তাদের সোনার হুজুর। এমন হুজুর আর হয় না। এই বাংলার মানুষ বড় বিচিত্র, বড় কোমল তাদের প্রাণ। যদি তার ছেলেটা খুব ভাল হয় তবে সে ছেলে যে সে ছেলে নয়, সোনার চাঁদ, হীরের টুকরো ছেলে। সোনা হীরের গল্প এরা শুনেছে কিন্তু এত দামী জিনিষ এদেশের মানুষেরা কোনদিন দেখেনি। এদের দামী গহনার ধাতু ছিল রূপা। এই দিয়ে তৈরী গহনা এরা পরত, পায়ের মল, গলার হাসুলি, কোমরের বিছা। তাই কোন কিছু ভাল হলে সেটা হোত এদের কাছে সোনার মত ভাল। এ প্রচলন বাংলায় আজও আছে। বাংলাদেশইতো সোনার বাংলা। যে সব দেশে সোনার খনি রয়েছে সে সব দেশের নামের সঙ্গে সোনার কোন সংশ্রব আছে বলে আমার জানা নেই। কিন্তু এই বাংলার নামের সঙ্গে সোনা মিশ্রিত রয়েছে। তাই খানজাহানের বিবি এদেশের মানুষের কাছে সোনার বিবি হয়ে রইলেন। তাঁর আসল নামটি

www.pathagar.com

পর্যন্ত কেউ কোনদিন জানলো না। এবং যে বাড়ীতে তিনি বসবাস করতেন সেই বাড়ীর নাম সোনা বিবির বাড়ী ছাড়া এদেশের লোকের কাছে অন্য কোন নামই হ'তে পারে না। কাজেই এ কথা নিশ্চিত করে বলা যায় যে আমাদের আলোচ্য খানজাহান আলী (রঃ) বিয়ে করেছিলেন এবং সোনা বিবিই তাঁর স্ত্রী।

এখন প্রধান বিচার্য বিষয় হোল গৌড় না জৌনপুর? দিল্লীর ফিরোজ শাহ্ তোঘলক না গৌড়ের নাসিরউদ্দীন মাহমুদ শাহ্। এর কোন সময়ের কোন খানজাহান বাগেরহাটের বুকে ঘুমায়ে রয়েছেন। জনাব আবদুর রহিম সাহেব আলোচ্য খানজাহান আলীর যাত্রা দিল্লী থেকে শুরু করেছেন এবং জৌনপুর ও গৌড় হয়ে প্রথমে বারোবাজার ও পরে বাগেরহাট পর্যন্ত স্থগিত করেছেন। তাঁর বর্ণিত সময় ফিরোজ শাহ্ তোঘলকের. কিন্তু তাঁর কোন সরকারী কর্মচারী কখন এই যাত্রা করেছিলেন সে সম্পর্কে তিনি কিছুই বলেননি। আলোচ্য এই ব্যক্তি তাঁর প্রধানমন্ত্রী খানজাহান আলী মকবুল কিনা সে ব্যাপারেও তিনি কোন মন্তব্য করেননি। সকল মতামতের তিনি একটা সমন্বয় সাধন করেছেন মাত্র, কাউকেই তিনি অসন্তুষ্ট করেননি। কিন্তু দিল্লীর সুলতান ফিরোজ শাহ্ তোঘলকের প্রতিনিধি হিসাবে তিনি যদি এদেশে আগমন করে থাকেন তবে তাঁর ঐতিহাসিক ভিত্তি কি? এই কথাটি ইতিহাসের আলোকে আলোচনা করলে দেখা যায় যে এর কোন ঐতিহাসিক ভিত্তি নেই।

সুলতান ফিরোজ শাহ্ তোঘলক ১৩৫২ খৃষ্টাব্দে যখন হাজী ইলিয়াসের বিরুদ্ধে প্রথম অভিযান করেন তখন তাঁর উজিরে আলা বা প্রধানমন্ত্রী খানজাহান মকবুল তাঁর সাথে ছিলেন সত্য কিন্তু তিনি বাগেরহাটে আগমন করেননি। ইতিহাসে উল্লেখ রয়েছে যে হাজী ইলিয়াসের বিরুদ্ধে এই যুদ্ধে তিনি নিজে শরীক হয়েছিলেন এবং যুদ্ধ বিগ্রহ শেষে বার্ধক্য

www.pathagar.com

জনিত কারণে সুলতান ফিরোজ শাহের সঙ্গে তিনি আবার দিল্লীতে ফিরে যান। ঐতিহাসিকগণ বলেন তিনি ১৩৭০ খৃষ্টাব্দে মৃত্যুবরণ করেন। আলোচ্য খানজাহান আলীর মৃত্যু তারিখ ১৪৫৯ খৃষ্টাব্দ। এদের মৃত্যুকালের ব্যবধান ৮৯ বৎসর।

তাঁর মৃত্যুর পর অবশ্য তাঁর পুত্র জুনা শাহ্ খানজাহান উপাধি লাভ করেন। কিন্তু কোন ঐতিহাসিক সূত্র ধরে জুনা শাহ্ খানজাহানকে বাগেরহাটের হযরত খানজাহান আলী (রঃ) বলে ধরে নেওয়া যায় না। কারণ, উপরোক্ত কারণের মতো একই। খানজাহান আলীর (রঃ) মৃত্যু হয় ১৪৫৯ খৃষ্টাব্দে এবং জুনা শাহ্ খানজাহানের মৃত্যু হয় এর অনেক পূর্বে ১৪১৫ খৃষ্টাব্দে মতান্তরে ১৪২১ খৃষ্টাব্দে। কাজেই ঐতিহাসিক সাক্ষ্যে প্রতীয়মান হয় যে জনাব আবদুর রহিম সাহেবের মতামতের প্রথম অংশের সমর্থন ইতিহাসে আদৌ মেলে না। অর্থাৎ ফিরোজ শাহ্ তোঘলকের সময়ের কোন খানজাহানই আমাদের আলোচ্য পীর খানজাহান আলী (রঃ) নন। বাকি অংশটুকু ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোন দিয়ে যাচাই করে দেখা যাক।

এম দলিলুর রহমান নামক একজন পুঁথি লেখক হযরত খানজাহান আলীকে হোসেন শাহের প্রতিনিধি বলে এবং সমসাময়িক বলে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু এ কথার একটা সামঞ্জস্য থাকলেও পুরা মিল খুঁজে পাওয়া যায় না। কারণ বাংলার সর্বশ্রেষ্ঠ সুলতান হোসেন শাহ সিংহাসনে আরোহণ করেন ১৪৯৩ খৃষ্টাব্দে। তবে তাঁর পক্ষে হোসেন শাহের সমসাময়িক হওয়া সম্ভব নয়। তবে এর মধ্যে হোসেন শাহের প্রতিনিধি বা তাঁর সনদ পাওয়ার সত্যতা কিছু লুক্কায়িত থাকতে পারে। তবে সতীশ বাবু প্রমুখ ঐতিহাসিকগণ অনুমান করেন যে বাল্য অবস্থায় হোসেন শাহ্ পীর খানজাহান আলীর (রঃ) সংস্পর্শে এসেছিলেন এবং পরিণত বয়সে তিনি তাঁকে সনদ দিতেও পারেন। এ অনুমান অনেকখানি সত্য বলে প্রতীয়মান হয়।

www.pathagar.com

জনৈক শামছুদ্দিন আহম্মদ সাহেব তাঁর Islam in south Bengal নামক এক প্রবন্ধে পীর খানজাহান আলীকে দিল্লীর সৈয়দ বংশীয় সুলতানদের দরবারের একজন প্রসিদ্ধ ব্যক্তি বলে উল্লেখ করেছেন। তিনি অনুমান বলেছেন যে "সৈয়দ বংশের প্রতিষ্ঠাতা খিজির খাঁর মৃত্যুর পর গৃহ-বিবাদের সময় দিল্লী ত্যাগ করে তিনি বঙ্গদেশে আগমন করেছিলেন ও স্বীয় ক্ষমতা বলে ক্রমে খলিফাতাবাদ রাজ্য স্থাপন করেছিলেন। তাঁর ধর্মীয় কার্যকলাপের দিকে তিনি তেমন কোন গুরুত্ব আরোপ করেননি। তবে নিঃসন্দেহে তিনি একজন প্রজাব্যঞ্জক শাসন ছিলেন।'

কিন্তু এ মতও নিঃশঙ্কোচে গ্রহণ করা সম্ভব নয়। কেননা হযরত খানজাহান আলী (রঃ) যদি সৈয়দ বংশীয় সুলতানদের দরবারে একজন প্রসিদ্ধ ব্যক্তিই হ'য়ে থাকেন তবে তৎকালীন ইতিহাসে নিশ্চয়ই তার কিছু না কিছু উল্লেখ থাকতো, যার ফলে সেইসূত্রে এই অনুমান করা সম্ভব হোত। কিন্তু সমসাময়িক ইতিহাসে এ সম্পর্কে কোন কিছুই পাওয়া যায় না। এই মতামত যাচাই করতে গিয়ে জনাব হেদায়েতুল ইসলাম খান তাঁর "খানজাহান আলী" নামক প্রবন্ধে বলেছেন "সে যুগের বিখ্যাত ঐতিহাসিক ইয়াহিয়া-বিন-আহম্মদ সিরহিন্দির রচিত প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক গ্রন্থ "তারিখ-ই-মোবারক শাহীতে" তার কোন উল্লেখ নেই। কিন্তু বাংলার আরও মোবারক শাহ্ নামের শাসনকর্তা ছিলেন। তবে সেখানেও এমন কোন ঘটনার উল্লেখ নেই। তবুও একথা সত্য যে হযরত খানজাহান আলী সৈয়দ বংশীয় সুলতানদের সমসাময়িক ছিলেন। সূত্র এই একটি মাত্র যা ধরে সামছুদ্দীন আহম্মদ সাহেব এ অনুমান করেছেন।

কেউ কেউ আবার খানজাহান আলীকে (রঃ) ইলিয়াসশাহী সুলতান সেকেন্দার শাহের প্রতিনিধি বলে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু এ মতও গ্রহণ সম্ভব নয়। কেননা সেকেন্দার শাহ্ মৃত্যুবরণ করেন ১৩৯৩

www.pathagar.com

খৃষ্টাব্দে। তাঁর প্রতিনিধি হয়ে এত বৎসর শাসনকার্য পরিচালনা করা কতদুর সম্ভব তা নিয়ে প্রশ্ন সকলের মনেই উঠবে।

এ ছাড়াও অনেকে মনে করেন যে হযরত খানজাহান আলী (রঃ) হাবসি বিদ্রোহের সময় পলায়ন করে বাগেরহাটে আগমন করেন এবং পরে নিজেকে স্বাধীন সুলতান বলে ঘোষণা করেন। এ কথারও কোন ঐতিহাসিক ভিত্তি নেই। হাবসি বিদ্রোহ অনুষ্ঠিত হয় ১৪৮৬ খৃষ্টাব্দে এবং হযরত খানজাহান আলী (রঃ) মৃত্যুবরণ করেন ১৪৫৯ খৃষ্টাব্দে। অবশ্য হাবসী বিদ্রোহের সময় সুলতান ফতেহ্ শাহের খানজাহান আলী নামক একজন মন্ত্রী ছিলেন। কিন্তু তাঁর বাগেরহাট আগমনের কথা কোন ইতিহাসে উল্লেখ নেই। কাজেই আমাদের আলোচ্য খানজাহান আলী তিনি হতেও পারেন না।

সদ্যপ্রকাশিত জনৈক রশিদ আহম্মদ সাহেব লিখিত "তাজকেরাতুল আউলিয়া" গ্রন্থে দেখা যায় তিনি হযরত খানজাহান আলাইহের রহমাতঃকে আউলিয়াদের মধ্যে একজন গণ্য করে তাঁর সংক্ষিপ্ত জীবনী আলোচনা করতে গিয়ে তিনি লিখেছেন যে "ফিরোজ শাহ তোঘলকের আমলে বংশানুক্রমে খানজাহান উপাধি পান যে বংশ, তিনি তারই একজন। ১৩৮৯ খৃষ্টাব্দে তাঁর পিতার মৃত্যু হইলে তিনি অর্থাৎ উলুঘ খান খানই জাহান উপাধি লাভ করেন। তারপর তিনি তোঘলক বংশীয় সুলতানদের সেনাপতি হন।"

এই বক্তব্যের পুনর্বার আলোচনার কোন প্রয়োজন আছে বলে আমি আমি মনে করি না। কারণ জনাব রশিদ আহম্মদ সাহেব এ কথা উল্লেখ করেননি যে তিনি ঐ বংশের খানজাহান এবং তাঁর পিতা অমুক ছিলেন। তবুও তিনি তাঁর পিতার মৃত্যু সন কেমন করে উল্লেখ করেছেন জানিনা। প্রামাণ্য পুস্তকের কোন উল্লেখ না করে এমন বক্তব্য রাখার কোন যৌক্তিকতা আছে বলে মনে করিনা এবং একে ইতিহাসও বলা চলে না।

www.pathagar.com

শ্রীধনঞ্জয় দাস মজুমদার নামক ওপার বাংলার জনৈক লেখক তাঁর "বঙ্গের অনন্ত সামন্তচক্র ও ইসলাম রাষ্ট্রের ইতিহাস" গ্রন্থে হযরত খানজাহান আলীকে বাদশাহ আকবরের সেনাপতি বলে উল্লেখ করেছেন। তিনি আইন-ই আকবরী ও বাহারস্থান গাইবির কোন অংশের উদ্ধৃতি না দিয়ে শুধুমাত্র বরাত দিয়ে বলেছেন যে, 'দিল্লীর নবাব আকবর পাল বংশের রাজা প্রতাপাদিত্য বেগারাকে তাহার নিকট ডাকিয়া লইয়া গিয়া হত্যা করিয়া এই রাজধানী (রণবিজয়পুর) মোগল সেনাপতি খানজাহান আলীকে প্রদান করেন। বৃদ্ধ সেনাপতি ইসলামধর্ম প্রচারের জন্য দরবেশ হইয়া এই স্থানে তাঁহার আস্তানা ও দরগা স্থাপন করেন।"

একই পুস্তকে তিনি এই খানজাহান আলীর কীর্তি সমূহের আলোচনা করতে গিয়ে লিখেছেন "রণবিজয়পুরে ঘোড়া দীঘি, দিনাজপুরের মহিপালের দীঘির ন্যায় সুবৃহৎ; এই স্থানে শত শত মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ আছে। এই সমতট রাজধানী তদানীন্তন সমুদ্র তীরে রামচরিত বর্ণিত মহারাজ ধর্মপাল নির্মিত বিশাল মালগুদাম এবং নৌবন্দর এখন প্রতারক ঐতিহাসিকগণের প্রতারনায় খানজাহান আলীর ষাটগুম্বজ নামে সংরক্ষিত হইয়া ইহা খানজাহান আলীর নির্মিত বলিয়া প্রচারিত হইতেছে।"

ধনঞ্জয় বাবুর উপরোক্ত উদ্ধৃতি দেখে একথা পরিস্কার অনুধাবন করা যায় যে ইসলামের রীতিনীতি সম্পর্কে তার ধারণা নিতান্ত স্বল্প। সংসার ত্যাগ করলে সন্ন্যাসী সাজা যায় কিন্তু সংসার ত্যাগ করলেই দরবেশ হওয়া যায় না এবং জীবিত অবস্থায় কারো কোন দরগা স্থাপিত হয় না। এ কথাটুকু তিনি সম্যক উপলব্ধি করতে পারেননি। শুধু তাই নয় আমার একান্ত মনে হয় যে তিনি বাগেরহাটের খানজাহান আলী (রঃ) সম্পর্কে ঐতিহাসিক কোন তথ্যই অনুধাবন করতে সক্ষম হননি। তিনি রণবিজয়পুরে কোনদিন পদার্পন করেননি। ফলে এই স্থান সম্পর্কে তাঁর সম্যক কোন ধারণাই নেই। তিনি একবার যদি রণবিজয়পুর ভ্রমণ

www.pathagar.com

করতেন তবে তিনি শত শত ভগ্নপ্রায় মন্দিরের বদলে একটি মন্দিরের ধ্বংসাবশেষও দেখতে সক্ষম হতেন না। একজন পুরাতত্ত্ববিদ হয়ে এই ধরণের মন্তব্য তাঁর পুস্তকে স্থান পাওয়া সমীচিন হয়নি। তিনি দিনাজপুরের মহিপালের দীঘি রামসাগর দেখেছেন সন্দেহ নেই কিন্তু ঘোড়া দীঘি ও ঠাকুর দীঘি দেখেননি। দেখলে তিনি বুঝতেন এর একের তুলনায় অন্যকে বুঝানো যায় না এবং এর পার্থক্য কত।

তবে রাজা ধর্মপাল মতান্তরে রাজা রাজভটের নির্মিত বাগেরহাটের অন্তর্গত অযোধ্যা গ্রামে একটি মঠ রয়েছে। বাংলাদেশের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ এই মঠটির রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্বে নিয়োজিত রয়েছে। এই মঠটির নির্মাণ কৌশল ও শিল্প চাতুর্য্যে এবং ষাটগুম্বজ মসজিদের নির্মাণকৌশল ও শিল্প চাতুর্যে যে কত পার্থক্য তা একজন সাধারণ লোকও অনুধাবন করতে সক্ষম হবেন। একথা না বলে উপায় নেই যে ধনঞ্জয় বাবু বর্ণিত রামচরিত বর্ণিত রাজা ধর্মপাল যদি মসজিদের অনুকরণে পশ্চিম দিকে পাথর নির্মিত মেহরাব ও নামাজের স্থান তৈরী করে ষাটগুম্বজের মত এই বিশাল মালগুদাম তৈরী করে থাকেন তবে তাঁর বর্ণিত এই ধর্মপালের নিশ্চয়ই নামাজের প্রতি বেশ আকর্ষণ ছিল; যার ফলে তাঁর মালগুদামটি মসজিদের আকৃতিতে তিনি নির্মাণ করেছেন। এইরূপ মালগুদাম তৈরী করার মত কোন ধর্মপালকেই ইতিহাসে আবিষ্কার করা আমাদের পক্ষে সম্ভব হয়নি।

এই পুস্তকে তিনি অন্যত্র আবার লিখেছেন "আকবরের বৃদ্ধ সেনাপতি খানজাহান আলী নকবের সহিত ষড়যন্ত্র করিয়া প্রতাপাদিত্য বেগারাকে হত্যা করিয়া যে পাল রাজগণের পূর্বপুরুষগণের সমতটের রাজধানী রণবিজয়পুরে তাহার ইসলামধর্ম প্রচারকেন্দ্র স্থাপন করিয়াছিলেন। ঔরঙ্গজেবের বৃদ্ধ সেনাপতিও তদ্রুপ কৌশল অবলম্বন করিয়া

www.pathagar.com

রাজা চন্দ্রকেতুর রাজধানীও প্রাসাদাবলী অধিকার করিয়া ইসলামধর্ম প্রচারের আস্তানা স্থাপন করিয়াছিলেন। গোরাচাঁদ ফকিরের সহিত চন্দ্র কেতুর যুদ্ধ সম্বন্ধে বহু পল্লীগাঁথা ও কিংবদন্তী রহিয়াছে। (পৃঃ ১৪১ ও ১৪০)

মূলতঃ পল্লীগাঁথা ও বিভিন্ন মহলে প্রচলিত এই সমস্ত কিংবদন্তীই ধনঞ্জয় দাস বাবুর এই সব ইতিহাস রচনার প্রধান উৎস। তাঁর বর্ণনা মতে রণবিজয়পুর শুধু প্রতাপাদিত্য বেগারার রাজধানী নয়, তাঁর পূর্বপুরুষগণের সমতটের রাজধানীও ছিল। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে তিনি এত কালের এতবড় পুরাতন ঐতিহ্যপূর্ণ একটা রাজধানীতে তাদের সামান্যতম একটি নিদর্শনের কথাও উল্লেখ করেননি। তবে তারিকই মোবারক শাহী ও তবকতই নাশিরিতে প্রতাপাদিত্য নামে সমতটের এক রাজার নাম উল্লেখ পাওয়া যায় কিন্তু তার রাজধানীর নাম রণবিজয়পুর নয়। আইন-ই-আকবরীতে এইরূপ উল্লেখ আছে যে "মোগল সেনাপতি রাজসিংহ দাউদ খাঁ কররানীকে বিতাড়িত করিয়া সমতটের রাজধানী বিজয়পুরে প্রতাপাদিত্য বেগারাকে প্রতিষ্ঠিত করেন।

আমার মতে শুধু নয়, যে কোন লোকের মনেও একথা সত্য বলে প্রতীয়মান হবে যে, প্রতাপাদিত্য বেগারা কেন হযরত খানজাহান আলীর (রঃ) রাজধানীও রণবিজয়পুরে ছিল না। রাজধানীর কোন নিদর্শনই এখানে কোথাও নেই। হযরত খানজাহান আলীর মৃত্যুকাল ও ইতিহাসে বর্ণিত প্রতাপাদিত্য বেগারার সময়কাল বিবেচনা করলে দেখা যায় খানজাহান আলী এদেশে প্রবেশকালীন যে সমস্ত রাজাদের সঙ্গে যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছিলেন প্রতাপাদিত্য বেগারা তাদের মধ্যেও কেউ নয়। একথা পূর্বেই প্রমাণিত হয়েছে যে আকবরের বৃদ্ধ সেনাপতি খানজাহান আলী ও আমাদের আলোচ্য খানজাহান আলী এক ও অভিন্ন ব্যক্তি নয়। এত বড় একটা সিদ্ধান্ত নেবার পূর্বে খানজাহান আলী (রঃ) মাজারে লিখিত মৃত্যু তারিখটির

www.pathagar.com

প্রতি তিনি কোন লক্ষ্যই রাখেননি তিনি লক্ষ্য করলে দেখতে পেতেন যে মোগল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা ভারত সম্রাট আকবরের পিতামহ বাবর ভারতে আগমন করেছিলেন হযরত খানজাহান আলী (রঃ)র মৃত্যুর তেষট্টি বৎসর পরে।

হযরত পীর খানজাহান আলী (রঃ) সম্পর্কে প্রচলিত একটি কাহিনীর উল্লেখ বিশেষ প্রয়োজন মনে করি, কারণ এই কাহিনীটি যে কে কখন রচনা করেছিল তা জানা না গেলেও, কাহিনীটি এককালে বেশ প্রচারলাভ করেছিল. এই কাহিনীর জোড়াজাল বেশ সুন্দর কিন্তু ঐতিহাসিক বিচারে এর মূল্য কতটুকু পাঠক তা যাচাই করবেন।

কাহিনীটি সংক্ষেপে এইরূপ যে, হযরত খানজাহান আলীর পিতা দিল্লীর বাদশা হোসেন শাহের দরবারের একজন উচ্চপদস্থ কর্মচারী ছিলেন। তাঁর নাম ছিল ফরিদ খাঁন মতান্তরে আজর খান। বৃদ্ধ বয়স পর্যন্ত তিনি নিঃসন্তান ছিলেন যে শহরে তিনি বসবাস করতেন সেই শহরে এইরূপ নিঃসন্তান আর একটি বৃদ্ধা রমনী বসবাস ক'রত। একদিন এই বৃদ্ধা সকালে ভ্রমণ করার সময় ফরিদ খানকে দেখে বলল. তওব, তওবা, আজ হাটখুরের মুখ দেখলাম, সমস্ত দিনটাই আমার নষ্ট হ'য়ে গেল। এই কথা শুনে ফরিদ খান মনে প্রচণ্ড আঘাত পেলেন এবং মনে মনে সিদ্ধান্ত নিলেন যে পরদিন প্রভাতেই তিনি যমুনার পানিতে প্রাণ বিসর্জন দেবেন। পরদিন প্রভাতে তিনি যমুনার তীরে গিয়ে উপস্থিত হলেন। নামাজ অন্তে প্রার্থনা শেষে তিনি নদীতে ঝাঁপ দিতে যাবেন এমনি সময় পিছন থেকে কে যেন তার জুব্বাটি টেনে ধরলো। তিনি ফিরে দেখলেন শুভ্রশশ্রু এক দরবেশ তাঁর সম্মুখে দাঁড়িয়ে দরবেশ তাকে বললেন, "তুমি গৃহে ফিরে যাও। জেনে রেখ জীবনের মালিক আল্লাহ্ ; তুমি নও। তাঁর উপর ভরসা হারিও না। মনবাঞ্ছা তিনিই পুরণ করার মালিক।" এই কথা বলে দরবেশ নদীর উপর দিয়ে পার হয়ে ওপারে অদৃশ্য হয়ে গেলেন।

www.pathagar.com

এই অলৌকিক ঘটনার পরে তিনি আত্মহত্যা না করে গৃহে ফিরে গেলেন এবং কিছুদিনের মধ্যে তার স্ত্রী অন্তঃসত্বা হলেন। সময় সমাপনান্তে তাদের এক পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করল। এই পুত্রের নাম রাখেন তিনি কেশর খান। কেশর খানের এক বৎসর বয়ঃক্রমকালে পিতা আজর খান বা ফরিদ খান মৃত্যুমুখে পতিত হন। বিধবা মাতা পরের বাড়ী কাজ করে অতি কষ্টে তাকে লালন পালন করতে থাকেন। এই সময়ে এক দিনের ঘটনা। একদিন কেশর খান হাতের শাবল দিয়ে রাস্তার উপর অনেক গর্ত তৈয়ার করছিলেন। এই সময় দিল্লীর বাদশাহ হোসেন শাহ হস্তিপৃষ্ঠে আরোহণ করে সেই পথ দিয়ে চলেছিলেন। একটি শিশুকে আপন মনে রাস্তার উপর গর্ত খুড়তে দেখে তাঁর কি যেন মনে হোল, তিনি শিশুটির প্রতি আকৃষ্ট হলেন ও হস্তিপৃষ্ঠ হতে অবতরণ করে বালকটিকে কাছে ডেকে আদর করে জিজ্ঞাসা করলেন, "তুমি পথের উপর এমনি করে গর্ত খুড়ছ কেন? লোক পড়ে গিয়ে তো ব্যথা পাবে। ছেলেটি উত্তরে বলল, "যারা পথ চলবে তাদের কি চোখ নেই? বাদশাহ বললেন রাত্রে তো লোকে দেখতে পারে না। জবাবে ছেলেটি বলল "তুমি তো আচ্ছা বোকা তুমি এইটুকু জাননা যে যারা দেখতে পায় তারা দিনে কেন, রাত্রে এমনকি চোখ বুজেও সমান দেখতে পায়।" কেউ কেউ বলেন ছেলেটি উত্তর করলো, পথ রেখে যে বিপথে চলবে তার মৃত্যু অনিবার্য।

এই কথা শুনে বাদশা অবাক হলেন ও তার পরিচয় জিজ্ঞাসা করলেন। সে তার মার কথা বললে তার মার সঙ্গে দেখা করার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। উত্তরে বালক বলল, আমার মা মুসলমান তিনি কারো সঙ্গে দেখা করেন না। বাদশাহ এই কথায় আরও অবাক হলেন। অবশেষে বাদশা তাদের অন্দরমহলে স্থানান্তরিত করলেন এবং তাকে তাঁর রাজ্যের অর্ধেক দেওয়ার কথা বলে ছেলেটিকে নিয়ে যান।

বাদশার কোন পুত্র সন্তান না থাকায় এই পুত্রটিকে পেয়ে রাণীও

www.pathagar.com

খুব আনন্দিত হলেন এবং তিনি তার লালন পালনের ভার নিলেন। এক বৎসর অতিক্রান্ত হওয়ার পর রাণীর গর্ভে এক পুত্রসন্তান জন্মগ্রহণ করে। তার নাম রাখা হয় শাহানশাহ। স্বাভাবিক নিয়মেই বাদশা পুত্র এবং কেশর খান ভাইয়ের সম্পর্কে লালিত পালিত হতে থাকে। কিন্তু রাণীর মাঝে মাঝে যেন মনে হয়, বাদশাহ কেশর খানকে বেশী ভালবাসেন এবং কেশর খানকে রাণা তাঁর পুত্রের প্রতিদ্বন্দী মনে করেন। এই কারণে একদিন রাণী জল্লাদকে ডেকে কেশর খানকে হত্যার হুকুম দেন। কিন্তু জল্লাদ বাদশার পাঞ্জা ছাড়া এই কাজ করতে অস্বীকার করে। রাণী বললেন, বেশ বাদশার পাঞ্জা সহই পাঠাবো। কিন্তু চিঠিতে যা লেখা থাকবে তুমি সেই মোতাবেক কাজ করবে। একদিন রাণী কৌশলে এমন একটি চিঠি বাদশাকে দিয়ে সই করিয়ে নিলেন, যার মধ্যে লেখা ছিল "পত্রবাহক তোমার হাতে পত্র দেওয়া মাত্র তাকে হত্যা করবে।" এই চিঠিটি কেশর খানের হাতে দিয়ে তিনি জল্লাদের কাছে পাঠিয়ে দিলেন। বার বার করে হুসিয়ার করে দিয়ে বললেন খবরদার কারো হাতেই দেবেনা, অবশ্যই তুমি নিজে জল্লাদের হাতে দেবে।

কেশর খান চিঠি নিয়ে রওনা হয়েছে হঠাৎ কিছুদুর গিয়ে পথে বাদশার ছেলের সঙ্গে তার দেখা হয়ে গেল। সে অন্য ছেলেদের সঙ্গে জুয়ার মত একরূপ খেলা করছিল ও তাদের হাতে বার বার হেরে গিয়ে রাগান্বিত হ'য়ে বলছিল, দাদা থাকলে তোদের দেখিয়ে দিতাম আমাকে কেমন করে হারিয়ে দিস।" ঠিক এমনি সময় সে কেশর খানকে দেখে দাদা বলে জড়িয়ে ধরল এবং বলল, "তুমি এদের সঙ্গে খেলা করে এদের একটু হারিয়ে দাও দাদা।" কেশর খান বলল, "আমি খেলতে পারবো না। একটি জরুরী চিঠি অবশ্যই আমাকে জল্লাদের হাতে দিতে হবে। তখন ছোট ভাই হঠাৎ চিঠিটি তার হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়ে বললো, "কিছুতেই হবে না, আমিই চিঠিটা দিয়ে আসি। তুমি এদের

www.pathagar.com

খেলা করে হারিয়ে দাও। এই কথা বলে সে চিঠি নিয়ে দৌড় দিল। পরে রাণী পরবর্তী সমস্ত ঘটনা জানতে পেরে মুর্চ্ছিত হ'য়ে পড়লেন। বাদশাহ প্রথমে অতিশয় মর্মাহত হলেন ও পরে স্মিতহাস্যে বললেন "এই রাজ্যের উত্তরাধিকারী এখন কেশর খান ছাড়া আর কেউ রইল না।" এইরূপে কেশর খান পরবর্তীকালে খানজাহান উপাধি ধারণ করে হোসেন শাহের সিংহাসনের উত্তরাধিকারী হন ও নিজের জীবনের ঘটনা তাঁর মনে গভীর রেখাপাত করে ও সংসারের প্রতি বৈরাগ্য ভাবের সৃষ্টি হয় এবং পরবর্তীকালে তিনি ইসলাম প্রচারে বহির্গত হন ও বারোবাজার এসে প্রথম আস্তানা স্থাপন করেন।"

এইরূপ কাহিনী শুনলে ভক্ত হৃদয় অতি সহজেই বিগলিত হয় ও পীরের প্রতি ভক্তি শ্রদ্ধা বেড়ে যায় সন্দেহ নেই। কিন্তু এই কাহিনীর কোন যোগসূত্র ইতিহাসের পাতায় খুঁজে মেলা দুষ্কর। দিল্লীর দরবারের কোন বাদশার জীবনীতে এমন কাহিনীর বর্ণনা কোথাও আছে বলে আমার জানা নেই। তবে ইতিহাস যদি এটি সমর্থন নাও করে তবু গল্প হিসাবে এটি একটি সুন্দর ও সার্থক গল্প। ধনঞ্জয় বাবুও তাঁর রাম চরিত বর্ণিত ধর্মপালের কেচ্ছাও এমন সুন্দরভাবে বর্ণনা করতে সক্ষম হননি।

উপরের বিভিন্ন মতামতের উদ্ধৃতি, তার পর্যালোচনা ও ইতিহাসের বিচার বিশ্লেষণের মাধ্যমে সকলের মনে এই প্রশ্নেরই উদ্রেগ হয় যে এরা কেউ যদি তিনি না হন তবে ইতিহাসের কোন ব্যক্তি এই খানজাহান আলী (রঃ)? উল্লিখিত মতামতের যে কোন একটিকে সঠিক ধরে নিয়ে আমরা মোটামুটি সন্তুষ্ট হতে পারতাম, কিন্তু তার মূলে কুঠার আঘাত হেনেছেন হযরত খানজাহান আলী (রঃ) নিজে এবং তাঁর সঙ্গী ও সভাসদগণ, তাঁর কবরগাত্রের শিলালিপিতে তাঁর মৃত্যুর সন তারিখ উল্লেখ করে। যেহেতু সন তারিখ ছাড়া কোন ইতিহাস লিখিত হয়নি সেহেতু এত প্রকাশিত মতামত বার বার খণ্ডিত হয়ে চলেছে এবং বার বার একই প্রশ্ন উঠছে কে এই খানজাহান আলী (রঃ)?

www.pathagar.com

এ প্রশ্নের সমাধান যে সহজ নয় তা ইতিপূর্বেই বলা হয়েছে, কারণ তাঁর সম্পর্কে সমসাময়িক কালের লিখিত নির্দিষ্ট কোন ইতিহাস পাওয়া যায়নি। এখনও ঠিক ভবে জানা যায় না যে কত বৎসর বয়ঃক্রমকালে তিনি মৃত্যুবরণ করেছেন তাহোল তাঁর জন্মকালের একটা সঠিক সীমায় পৌছানো যেত। কিন্তু তাও আমাদের কাছে অজ্ঞাত। তবুও এই প্রশ্নের সন্তোষজনক একটা মীমাংসায় পৌছানোর চেষ্টা করা উচিত, যে কে এই যুগ নন্দিত শত শত কীর্তির স্থাপক। এবং এই ব্যক্তির পূর্ব ও দক্ষিণ বঙ্গের সুন্দরবনের নিম্নাঞ্চল পর্যন্ত আগমনের কি কারণ থাকতে পারে। যদি তিনি এই পরগণার প্রতিনিধি হয়ে থাকেন, তবে তিনি কার প্রতিনিধিত্ব করেছেন?

এই প্রশ্ন আলোচনার প্রারম্ভেই একটি বিশেষ দিক বিশ্লেষণের প্রয়োজন, যে তৎকালীন বঙ্গের শাসন ব্যবস্থা কিরূপ ছিল এবং সেখানে ঐ সময় কিরূপ পরিস্থিতি বিরাজিত ছিল যার জন্য কারো আগমন এখানে বিশেষ প্রয়োজন ছিল।

ইতিহাসে দেখা যায় খিজির খাঁ ও তৎকালীন সেন রাজাদের আমলে এই বঙ্গকে চার ভাগে বিভক্ত করে শাসনকার্য পরিচালনা করা হোত। সেন রাজাদের আমলে শ্রেণী বিন্যাসের বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী এই চার ভাগের নামকরণ করা হয়। সমস্ত অঞ্চল বিভক্ত হয়ে নামকরণ হয় বঙ্গ, রাঢ়, বারেন্দ্র বাগ্রি অঞ্চল। এর সমস্ত অঞ্চলেই মানুষ তখন শ্রেণী সংঘাতে জর্জরিত হ'তে থাকে। বর্তমান পশ্চিম ও উত্তর বঙ্গের সমস্ত ভূমিকে বলা হোত বঙ্গভূমি। হাওড়ার পর থেকে বর্তমান পশ্চিমবঙ্গকে বলা হোত রাঢ় অঞ্চল। বারেন্দ্র ভূমি বলা হোত, জলপাইগুড়ি পাহাড়ের পাদদেশ থেকে পুরা রাজশাহী অঞ্চলকে ও যশোর খুলনা ও বরিশালের দক্ষিণ অঞ্চলকে বলা হোত বাগ্দি অঞ্চল। এই রাজ্যের রাজধানী গৌড় ছিল রাঢ় অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত। একে কখনও পাণ্ডুয়া ও কখনও লক্ষণাবতী নামকরণ করা হয়েছে।

www.pathagar.com

যে সময়ে হযরত খানজাহান আলী, যে দেশ থেকেই হোক এ দেশে আগমন করেছিলেন বলে সবাই ধারণা করেন, সে শতকে এ দেশের অবস্থা ছিল বড়ই করুণ। বাংলায় মুসলমান শাসকদের তখন একটা অধঃপতনের সময়। যদিও অনেক মুসলমান বাদশাহ্ গৌড়ে বাদশাহী করেছেন কিন্তু যে কারণেই হোক বঙ্গের সকল অঞ্চলে ইসলাম তখনও যথোচিত বিস্তার-লাভ করেনি। আশ্চর্যের বিষয় এই যে সমস্ত বাগ্দি অঞ্চল ছিল সম্পূর্ণ ইসলাম বহির্ভূত একটি অঞ্চল। ফলে এই অঞ্চল হতেই মুসলিম বিদ্বেষের আগুন পরবর্তিকালে দানা বেধে উঠতে থাকে। স্বাভাবিক নিয়মেই এই প্রশ্ন এসে যায় যে এই অঞ্চলের নিম্নশ্রেণীর দুর্বল অমুসলমানগণের এইরূপ ধ্যান-ধারণার পৃষ্ঠপোষকতা কে করতেন? সেন রাজাদের প্রচলিত কৌলিণ্যবাদ ও বৌদ্ধ বিতাড়নের পরেও এমন কোন প্রতিনিধি ছিলেন যার ছত্র ছায়ায় তারা লালিত পালিত হতে থাকে। ইসলামের এইরূপ প্রতিদ্বন্দ্বী কে ছিলেন যিনি ইসলামের প্রচারের প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেছিলেন যার ফলশ্রুতি হিসাবে এদেশে ইসলাম প্রচার শুরু হয়েছিল।

ইতিহাসের পাতায় দেখা যায় ইসলামকে বাংলার বুক থেকে মুছে ফেলার মানসে ইসলামের প্রতিদ্বন্দ্বী হিসাবে তখন খাড়া হয়েছিলেন একমাত্র "রাজা কান"। ১৪০০ শতকের শেষের দিকে গৌড়ের রাজা ছিলেন রাজা গণেশ এবং ইনিই রাজা কান বলে পরিচিত ছিলেন। যদিও অনেক ইতিহাস লেখক তাঁর ত্রুটি চাপা দেওয়ার চেষ্টা করে তাঁকে ধর্ম-নিরপেক্ষ রাজা বলে আখ্যায়িত করতে চেষ্টা করেছেন। কিন্তু তিনিই ছিলেন চরম মুসলিম বিদ্বেষী। অত্যাচারী ও উৎপীড়ক রাজা বলে ইতিহাসের পাতায় তাঁর নাম উল্লেখ রয়েছে। তাওয়ারিখ ফেরেশতায় তাঁকে গাদ্দারণ (নর পিচাশ) বলে অভিহিত করা হয়েছে। ঐ শতকে তাঁর অত্যাচারে এদেশ থেকে মুসলমান প্রায় নিঃশেষ হয়ে যেতে বসেছিল। তাঁর আমলের মত মুসলিম নারী ও শিশু নির্যাতন বাংলার ইতিহাসে ইতিপূর্বে আর

www.pathagar.com

কখনও ঘটেনি। পর্দানশীন বহু মুসলিম রমণীকে তিনি বদ্ধ গৃহে অগ্নিদগ্ধ করে হত্যা করে তাদের পর্দাকে পরীক্ষা করেছেন। বহু শিশুকে হস্তীপদতলে নিক্ষেপ করেছেন। তাঁর অত্যাচারের ভয়ে বহু মুসলিম অসহায় শিশু ও স্ত্রী ফেলে জঙ্গলে পালাতে বাধ্য হয়েছে। এই সময়ে অনেক ধর্মপ্রাণ মুসলমান মসজিদে আশ্রয় গ্রহণ করছিল ও আল্লার কাছে ক্ষমা প্রার্থনায় রত ছিল। অবশ্য তাওয়ারিখে ফেরেশতায় তাঁর জীবনের শেষের দিকে পরিবর্তনের কথার উল্লেখ রয়েছে। রাজা গণেশের অত্যাচারের চরম মুহূর্তে জৌনপুরের বাদশার এক সেনাপতি রাজা গণেশকে আক্রমণের কথা ইতিহাসে উল্লেখ রয়েছে। বাদশার আদেশে তিনি সর্বপ্রথম রাজা গণেশের রাজধানী গৌড় আক্রমণ করেন (১৪০৯/১০)। তিনি রাজা গণেশকে পরাজিত করেও কোন এক অজ্ঞাত কারণে তিনি আর জৌনপুর বাদশার সেনাপতির কাজে যোগদান করেন না। পরবর্তীকালে রাজা গণেশের চুক্তি ভঙ্গের কারণে তিনিই রাজা গণেশকে দ্বিতীয় বার আক্রমনের প্রস্তুতি নেন। আমার ধারণা ইতিহাসের এই ব্যক্তিই আমাদের আলোচ্য খানজাহান আলী (রঃ) ছাড়া আর কেউ নন। তাঁর এই অঞ্চলে আগমনের সময় ও রাজা গণেশের রাজত্বকালের সময় একই। পৃথিবীর ইতিহাসে দেখা গিয়েছে যে যখন মানুষ মানবিক আচরণ ভুলে গিয়ে অমানবিক ও জাহেলি আচরণ শুরু করেছে তখনই সেখানে আর বিপরীত শক্তির আবির্ভাব ঘটেছে, তাই সে পৃথিবীর যেখানেই হোক না কেন।

তা বাদেও খানজাহান আলী (রঃ) র মৃত্যু তারিখ ধরে বেশ কিছু পিছনের দিকে গেলে বাংলার রাজধানীর সিংহাসনে রাজা গণেশকেই উপবিষ্ট পাওয়া যায়। যার কর্মকাণ্ড জাহেলিয়াত যুগের মতই ছিল। যে কারণে হযরত খানজাহান আলী (রঃ) র মত একজন অলিয়ে কামেলের এদেশে আগমণের প্রয়োজন হয়েছিল। এখন দেখা প্রয়োজন কোন সময়ের লোক কে ছিলেন এবং কোন পরিস্থিতির ভিতর দিয়ে তিনি এদেশে আগমন করেছিলেন। এ সম্পর্কে ইতিহাস কি সাক্ষ্য দেয়।

www.pathagar.com

এদেশের বহু প্রবীন ব্যক্তির মুখে এ কথা শোনা যায় যে, হযরত খানজাহান আলী (রঃ) দীর্ঘ ৪১ বৎসর, কারো কারো মতে ৫০ বৎসর এই পরগণার শাসনকার্য পরিচালনা করেন। জীবনের শেষের ১০ বৎসর তিনি একান্তভাবে আল্লার আরাধনায় নিয়োজিত ছিলেন। অবশেষে বৃদ্ধ বয়সে এক শবেকদরের রাত্রিতে তিনি প্রাণত্যাগ করেন। তাঁর সম্পর্কে প্রচলিত বিভিন্ন প্রবাদের মত এই কথাটিও বহুকাল ধরে এতদঞ্চলে ছড়িয়ে রয়েছে। যে শবেকদর রাত্রিতে তিনি কামলিয়াতি হাসিল করেন তেমনি এক শবেকদরের রাত্রিতেই তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

তাহলে একথা নিশ্চিত যে তারও কিছুকাল পূর্বে তিনি এদেশে আগমণ করেছিলেন। এই প্রচলিত কথাটা শুধু একটা কথিত প্রবাদই নয়, এ কথাটি ইতিহাসের তথ্য হবার যোগ্য। তাঁর এই সমস্ত কীর্তি যশোর খুলনার বিস্তীর্ণ এলাকায় আজও বিদ্যমান রয়েছে। সে সকল নির্মাণ করতে গেলে যে সময়ের প্রয়োজন হয় তাতে নিঃসন্দেহে এমনি সময়ের কাছাকাছি একটা সময়ের প্রয়োজন। এখন, এই তথ্য অনুযায়ীও তাঁর মৃত্যুকাল থেকে এতটা সময় পিছিয়ে গেলে যাদের রাজত্বকালের সন্ধান পাওয়া যায় তা হোল ইসলামী শাহী সুলতানদের আমল। জৌনপুরের শর্কি বংশীয় সুলতানগণ তখন মসজিদ অধিকার করে বসে আছেন। কিন্তু কে সেই সুলতান যার সেনাপতির গৌড় বা বঙ্গ অভিযানের কাহিনী জানা যায়? যদি তিনি 'মালিক উস শর্ক' না হয়ে থাকেন তবে কে?

এই সময়ের ইতিহাসের ঘটনা এইরূপ যে ইলিয়াস শাহী সুলতান সেকেন্দার শাহের মৃত্যুর পর বাংলার মুসলিম রাজশক্তি ক্রমেই দুর্বল হয়ে পড়ে। এই সুযোগে সুলতান দরবারে কর্মরত বুদ্ধিমান বহু হিন্দু কর্মচারীও সুলতান নিয়োজিত প্রভাবশালী কিছু কিছু জমিদার মহা-পরাক্রমশালী জমিদাররূপে আবির্ভূত হন। অবশ্য গেয়াসয়ায়ন সুলতান গিয়াসুদ্দীন পর্যন্ত মুসলিম শক্তি কোন রকমে টিকে ছিল।

www.pathagar.com

তার মৃত্যুর পর তার পুত্র সামছুদ্দিনের অপদার্থ পুত্র সাইফুদ্দিন হামজাশাহ সিংহাসন লাভ করেন। তিনি অতি মাত্রায় দুর্বলচেতা ছিলেন। তার দরবারের হিন্দু কর্মচারীদেরই তিনি বিচক্ষণ বলে মনে করতেন। তাদের হাতে তিনি শাসনভার ছেড়ে দিয়ে বিভিন্ন ধরণের ফূর্তির খেয়ালে মশগুল থাকতেন এবং তারাই তার সমস্ত খেয়ালের ইন্ধন যুগিয়ে রাজকার্য হতে ফিরিয়ে রাখতো। এই সুযোগে দিনাজপুরের হিন্দু জমিদার রাজা গণেশ প্রবল পরাক্রমশালী হ'য়ে ওঠেন। ক্রমে ক্রমে তিনি ১৪১০ থেকে ১৪১৪ খৃষ্টাব্দের মধ্যে গৌড়ের সুলতান হামজা শাহকে পরাভূত করে নিজেকে স্বাধীন রাজা বলে ঘোষণা করেন। এই সময়ে জৌনপুরের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন শর্কি বংশীয় ধর্মপ্রাণ সুলতান ইব্রাহিম শর্কি। সময়কাল ১৪১৫ খৃষ্টাব্দ।

স্বাধীনতা ঘোষণা করার পর কিছু কালের মধ্যেই রাজা গণেশ মনস্থ করলেন যে তাদের পৈত্রি ভূমি বাংলা থেকে মুসলমান ও বহিরাগত মুসলমান প্রভূত্ব চিরতরে খতম করে দেবেন। তিনি ইচ্ছা প্রকাশ করেন যে অবশ্যই অতি শিঘ্র তিনি তাঁর রাজ্যটিকে একটি মুসলমান বর্জিত হিন্দু রাজ্যে পরিণত করবেন। তার রাজ্যে একটি মুসলমানও থাকবেনা এই সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে তার বাড়ীর একটি অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে কাকে আনিত গরুর গোস্তের অজুহাতে শুরু হয়েছিল তার এই মুসলিম নির্যাতন ও হত্যাকাণ্ড। সেন রাজত্বেও বঙ্গের মুসলমানগণ একবার এইরূপ ষড়যন্ত্রের স্বীকার হয়েছিল বলে জানা যায়। এই রাজা গণেশ সম্পর্কে প্রায় সমস্ত ঐতিহাসিকগণ প্রায় একই মত পোষণ করেন যে তিনি মুসলমান বিদ্বেষী রাজা ছিলেন এবং তাদের উপর তিনি অকথ্য অত্যাচার করেছেন। কিন্তু তার সগোত্রিয় কিছু কিছু লেখক তার অধ্যায়টাকে একটা গৌরবময় অধ্যায়রূপে বর্ণনা করে তার সপক্ষে কলম ধরেছেন। বাবু দক্ষিণা চরণ রায় (D. C Roy) তার Historical

www.pathagar.com

reader of Indian পুস্তকে লিখেছেন, "Raja Gonesh of Dinajpur was at first a powerful hindu Zaminder, Afterwords he seized the throne of Bengal by killing the grandson of Giasuddin. He was very strong and brave man. He reigned only seven years, during which he gave ample profs of his great governing facelties. He looked on the Hindu and Muslim with as equal eye. The Musalmans belived that at heart he was more reverer of Mohamadan than Hindu relegion. They so loved him that when he died they cl imd hurry his dead body. Raja Gonesh's son. Jadu embraced Mohadan religion and ascended the the throne after the name of Jalsluddin. He made Gour his Capital ...

অর্থ—"রাজা গণেশ প্রথমতঃ দিনাজপুরের শক্তিশালী হিন্দু জমিদার ছিলেন। পরবর্তীকালে তিনি সুলতান গিয়াসুদ্দিনের পুত্রকে নিহত করিয়া বাংলার সিংহাসন অধিকার করেন। তিনি অতি শক্তিশালী ও সাহসী ব্যক্তি ছিলেন। তাঁর ৭ বৎসর রাজত্বকালের মধ্যে তিনি সুদক্ষ রাজ্য-পরিচালনের প্রচুর প্রমাণ রাখিয়াছেন। তিনি হিন্দু ও মুসলমান প্রজাদের সমান চোখে দেখিতেন। মুসলমানগণ মনে করিত যে তিনি হিন্দু ধর্মের চাইতে মুসলমান ধর্মের প্রতি অধিক আকৃষ্ট ছিলেন। তাই মৃত্যুর পর তাহারা তাহাকে কবর দিতে চাহিয়াছিল। রাজা গনেশের পুত্র যদু ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করিয়া জালালউদ্দীন নাম ধারণ করিয়া সিংহাসনে আরোহন করেন। তিনি তাঁহার রাজধানী গৌড়ে স্থাপন করেন।"

রাজা গনেশের পুত্র জালালুদ্দীনের পর তাঁর পুত্র ইলিয়াস এই বাংলা শাসন করেন কিন্তু সে ছিল হাবসী রাজা ফিরোজ শাহের হাতের পুতুল।

www.pathagar.com

কিন্তু সে ইতিহাসের উল্লেখ এখানে নিষ্প্রয়োজন। তবে D. C. Roy এর ইতিহাসে একটি সত্য প্রকট হয়ে উঠেছে যে যবন দোষে দুষ্ট বলে কোন হিন্দু তার শবদাহ সংকারে অনিচ্ছা প্রকাশ করায়, মুসলমানগণ এমনকি তার পুত্র জালালুদ্দিনও লাকে কবর দিতে চেয়েছিল। গণেশের পুত্র কেমন করে জালালুদ্দিন হলেন সে ইতিহাস আলোচনার ক্ষেত্রে এটা পরিস্কার হয়ে উঠবে। এখন রাজা কান সম্পর্কে একজন ইংরাজ ঐতিহাসিক কি বলেন তাহই একটা উদ্ধৃতি দেওয়া যাক—ঐতিহাসিক বাচানন হেমিলটন (Bochanan Hamilton) তাঁর History of Dinwaj গ্রন্থে বলেছেন,

"Then Gonesh a Hindu and Hakim of Dinwaj (Denajpur) Sieged the govt. Enraged at Sk. Badar - I. Islam and his son Faiz-I- Islam who refused to give him the compliment due to the rank he had assumed, he put them to death. The saint Kutub shah wrote to Sultan Ibrahim who in complience with the request, come from Rajmahol with an army and encamred at Satra. The Raja of Dinwaj was then terrified and applied in great penitence to Qutub shah and obtain his toregeiveness by making his son odu sen (Jadu Sen) Mohamadam.

অর্থ,—তখন দিনাজপুরের হিন্দু শাসক গণেশ সুলতান প্রতিনিধি বদর-ই-ইসলাম ও তৎপুত্র ফয়জ-ই-ইসলামের নিকট হইতে শাসকের স্বীকৃতি না পাওয়ায় সে তাহাদের হত্যা করে ও রাজশক্তির কোপানলে পতিত হয়। তখন দরবেশ কুতুব শাহ সুলতান ইব্রাহিমের নিকট এই মর্মে এক পত্র লেখেন। তাহার অনুরোধ রক্ষার্থে তিনি সসৈন্যে রাজমহল

www.pathagar.com

হইতে রওনা হইয়া সাত্রায় শিবির স্থাপন করেন। দিনাজপুরের রাজা তখন ধর্মপালের জন্য অনুতপ্ত হইয়া অতি বিনয়ের সহিত দরবেশ কুতুব শাহের নিকট ক্ষমা ভিক্ষা করেন। তখন তার পুত্র যদু সেনকে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করাইয়া তাহার ক্ষমা লাভ করেন।"

এই ইতিহাস যে নির্ভুল তাতে কোন সন্দেহ নেই। ক্ষমতাশালী হয়ে সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করা এবং বদর-ই-ইসলাম ও তৎপুত্র ফয়জ-ই-ইসলামকে হত্যা করাই শুধু তার পাপ নয় তার আরও অনেক পাপ ছিল যার জন্য সে অনুতপ্ত হতে বাধ্য হয়েছিল। সে যে অনুতপ্ত ও সত্যিকারের ক্ষমাপ্রার্থী এবং তখন সে যে মুসলমান নিধন করবে না এর নিশ্চয়তা স্বরূপ সে তার পুত্র যদু সেনকে মুসলমান করে বাদশার কাছে শুধু নয়, দরবেশ কুতুব শাহের নিকটও ক্ষমা ভিক্ষা করেছিল। তৎকালে এই ইতিহাস-বিখ্যা ত' কুতুব উল আলম" কে ছিলেন যার পত্রের জন্য বাদশাহ স্বয়ং এতবড় মর্যাদা দিয়েছিলেন?

তৎকালীন ইতিহাস-বিখ্যাত কুতুবের পূর্ণ নাম ছিল "নুর-ই-কুতুবউল আলম" তিনি ছিলেন তৎকালীন আধ্যাত্মিক শক্তি সম্পন্ন সাধারণ বেশী একজন মহাপুরুষ ও নীরব সাধক। ইতিহাসে দেখা যায় বাংলার সুলতানদের পতনম্মুখ মুহূর্তে তারই প্রচেষ্টায় বাংলায় ইসলাম পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। তৎকালিন বিলাসী সুলতানদের অন্দরমহলের বিলাস ও মদের বিলুপ্তি ঘটেছিল তারই হুকুমে। রাজা গণেশের ইসলামকে নির্মূল করার ইচ্ছা তিনি আধ্যাত্মিক শক্তি বলে অনুধাবন করেছিলেন ও ইসলাম প্রচারের জন্য তাঁর শিষ্যদের তিনি বাংলার দিকে দিকে দিকে প্রেরণ করেছিলেন।

ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে রাজা গণেশ স্বাধীনতা ঘোষণা করার পর মুসলমানদের উপর অবর্ণনীয় অত্যাচার করেছিলেন। এক প্রবন্ধকার বলেন, "Raja Gonesh was not a clear minded man. He did not

www.pathagar.com

made himself Muslim but his son" রাজা গণেশের মন পরিষ্কার ছিল না কারণ তিনি নিজে মুসলমান না হয়ে কুমতলব হাসিলের উদ্দেশ্যে তাঁর পুত্রকে মুসলমান করেন। এরও একমাত্র কারণ এই যে তাঁর পুত্রকে মুসলমান না করলে তিনি নিজে প্রাণভিক্ষা পান না।

সারা জাহানের কুতুব বলে খ্যাত নুর-ই-কুতুব উল আলমের রঃ) সে যুগে ইসলামের প্রতি কর্তব্যপালনের পূর্ণ বিবরণ ও রাজা গনেশের অত্যাচারের মাত্রা সম্পর্কে "রিয়াজ-উস-সালাতিন" গ্রন্থে এইরূপ উল্লেখ আছে

When Sultan Shamsuddin died Raja Kans (Gonesh) a Hindu Jaminder gaining supremacy over all the country of Bengal, sat down on the the seat of the ruler and began to practice oppression and bloodshed, Setting himself to the slanghter of Muslim's. He put to the sword many of the theological scholass and shaiks and wish to root out Islam from his realm ......

The saint Nur Qutub-ul-Alam exited by the news of the infidels supremacy and his Slaughter of Muslims wrote to Sultan Ibrahim Sharqi to invade Bengal and save Islam,'

অর্থ :—"যখন সুলতান সামছুদ্দিন মৃত্যুমুখে পতিত হন তখন রাজা কান (গণেশ) নামক এক হিন্দু জমিদার সমগ্র বাংলায় তাহার আধিপত্য বিস্তার করেন এবং এক সময় শাসকের আসনে উপবেশন করিয়া অত্যাচার ও রক্তপাত প্রবাহিত করিতে আরম্ভ করেন। তিনি বিশেষ করিয়া মুসলমানদের হত্যাকারী বলিয়া পরিগণিত হন। তাহার তরবারির তলে বহু মুসলমান সম্ভ্রান্ত ও ধর্মপ্রাণ জ্ঞানী গুণী ব্যক্তি প্রাণ বিসর্জন দেন। তিনি তাঁর রাজ্য হইতে চিরতরে ইসলামের মুলোৎপাটন করিতে ইচ্ছা করেন।

www.pathagar.com

এই সময় নুর-কুতুব-উল আলম নামক এক দরবেশ তাঁর (রাজা গণেশের) একছত্র আধিপত্য ও মুসলমানদের হত্যাযজ্ঞের সংবাদে মর্মাহত হন এবং ইসলামকে রক্ষা করিবার জন্য অনুরোধ করিয়া সুলতান ইব্রাহিম শর্কির নিকট এক পত্র লেখেন।"

একটি নির্ভরযোগ্য ইতিহাস গ্রন্থের উপরোক্ত উদ্ধৃতি থেকে একথা অতি সহজেই বলা যায় যে রাজা গণেশ জাহেলিয়াত যুগের একজন মুসলিম বিদ্বেষী আরব থেকে কোন অংশে কম ছিলেন না। তাঁর অত্যাচার এত চরমে উঠেছিল যে বাংলার সমস্ত মুসলমান তখন জীবন ভয়ে ভীত হয়ে পড়েছিল কিন্তু ধর্মরক্ষার ব্যাপারে অনেকেই দৃঢ় প্রত্যয়ের পরিচয় দিয়ে মৃত্যুবরণ করেছিলেন। তখন নুর-ই-কুতুব উল আলম নামক একজন সাধারণবেশী ফকির যিনি সবার নিকট সুফি দরবেশ বলে খ্যাত ছিলেন এই সকল সংবাদে উৎকণ্ঠিত হয়ে ওঠেন এবং সেদিন ইসলামের দুর্দিনের আশঙ্কায় শংকিত হয়ে রাজমহল ও জৌনপুরের অধিপতি সুলতান ইব্রাহিম শর্কির নিকটে ইসলামকে রক্ষা করার অনুরোধ করে রাজা গণেশের রাজধানী গৌড় আক্রমণ করবার জন্য অনুরোধ করেন। সুলতান ইব্রাহিম শর্কি তৎক্ষনাৎ এই দরবেশের অনুরোধ রক্ষা করেন ও গৌড় আক্রমণ করেন। রাজা গণেশ এই যুদ্ধে চরম লাঞ্ছিত হন ও পরাজয় বরণ করেন। রাজা গণেশ তখন মুসলমানদের বীরত্ব ও দয়ার কথা উল্লেখ করে বাদশার নিকট ক্ষমা ভিক্ষা করেন। কিন্তু বাদশা দরবেশের প্রতি ইংগিত করায় তিনি দরবেশের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করেন। এই যুদ্ধের পর ইব্রাহিম শর্কির প্রধান সেনাপতি খান-ই-জাহান উপাধিতে ভূষিত হন।

আশ্চর্যের ব্যাপার এই যে, সুলতান ইব্রাহিম শর্কির প্রধান সেনাপতির অনুরোধে সংশোধন হবার জন্য শেষ সুযোগ দানের প্রতিশ্রুতিতে নুর-ই-কুতুবুল আলম তাকে ক্ষমা করেছিলেন। (দুঃখের বিষয় রিয়াজ-উস-সালাতিনে এই প্রধান সেনাপতির কি নাম, তার কোন উল্লেখ নেই।) তখন শর্কি

www.pathagar.com

সুলতান গণেশের পুত্র যদু জালালউদ্দিন নাম ধারণ করলে, তার হাতে রাজ্যভার অর্পণ করে গৌড় ত্যাগ করেন। কিন্তু সুলতানের গৌড় ত্যাগ করার পর কিছুদিনের মধ্যেই কুচক্রী রাজা গণেশ আবার নিজ মূর্তিতে আবির্ভূত হন। রিয়াজ-উস-সালাতিনে এ সম্পর্কে এইরূপ উল্লেখ আছে

"......Kan bacame more tyrcnical and violent then before and began to oppress the followers and relatives of saint Qutub-al-Alam and plander their property"

অর্থঃ—"রাজা কান (তাঁদের বিদায়ের পর) পূর্বের থেকেও আরও ভয়ানক অত্যাচারী হ'য়ে ওঠেন এবং দরবেশ নূর-ই-কুতুব উল আলমের আত্মীয়-স্বজন ও শিষ্যদের প্রতি অত্যাচার আরম্ভ করেন ও তাদের ধন ও সম্পত্তি লুটতরাজ করেন।"

এই সময় নুর-ই-কুতুব উল আলম গৌড়েই বসবাস করতেন এবং তাঁর বাসস্থানের সংলগ্ন নিজস্ব একটি মাদ্রাসায় শিক্ষকতা করতেন। এই মাদ্রাসায় সেই সময় ইসলামী শিক্ষা দেওয়া হত বলে এই প্রতিষ্ঠানটি রাজা গণেশের কোপানলে পতিত হয়। কিন্তু যেহেতু তিনি দরবেশ ও অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন ব্যক্তি বলে সবার নিকট পরিচিত ছিলেন সেজন্যই রাজা গণেশ তার প্রতি হস্তক্ষেপ করতে সাহস পান নাই। রাজা গণেশের এইরূপ মনোভাবের কথা নুর-ই-কুতুবুল আলম বুঝতে সক্ষম হ'য়েছিলেন। ফলে এই দরবেশ তাঁর প্রতি একটা দৃঢ় মনোভাব গ্রহণ করেছিলেন।

শুধু এই সময়ই নয়, ঐতিহাসিক ঘটনাবলী প্রমাণ করে সে বাংলায় ইসলাম বিস্তারের শুরু থেকেই বহিরাগত মুসলমানদের সঙ্গে এদেশের পৌত্তলিক হিন্দুদের সঙ্গে একটা দ্বন্দ্ব ও সংঘাত চলছিল। সেন রাজাদের আমলে হিন্দু প্রভুত্ব ও শক্তিশালী হওয়ায় এই পরিস্থিতি আবার প্রকট হ'য়ে দেখা দেয়। ফলে মুসলমান শাসকদের শাসন ব্যবস্থা থেকে নিজেদের শাসন ব্যবস্থার পার্থক্য ঘটিয়ে বাংলাকে বঙ্গ, রাঢ়, বারেন্দ্র ও বাগ্দি এই চার অঞ্চলে

www.pathagar.com

বিভক্ত করে যে ব্যবস্থা করেছিলেন সেই ব্যবস্থাপনার উত্তরসূরী হিসাবেও এই দেশের বিশেষ প্রতিনিধি হিসাবে আবির্ভূত হলেন রাজা গণেশ। তাঁর মুসলিম নির্যাতন ও অত্যাচার যখন তাঁর পরাজিত হওয়ার পরও প্রশমিত হোল না বরং আরো বর্ধিত হোল তখন হজরত নূর-ই কুতুব-উল-আলম চিরদিনের জন্য তাঁকে স্তব্ধ করার মানসে আবার ইব্রাহিম শর্কির নিকট পত্র লেখেন। এই পত্রে তিনি উল্লেখ করেন যে তিনি যেন অবশ্যই একটা নির্দিষ্ট তারিখে একটি নির্দিষ্ট স্থানে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। পত্র মোতাবেক সুলতান তাঁর সঙ্গে এক বৈঠকে মিলিত হন। এই বৈঠকে তাঁরা যে পরিকল্পনা গ্রহণ করেন তাতেই রাজা গণেশের পতন ঘটে। তাঁরা কি পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিলেন সে আলোচনা পরে করা গেল। এই পর্যন্ত ইতিহাস বর্ণনার প্রামাণ্য পুস্তক রিয়াজ-উস-সালাতিন।

ইতিহাসের কোন ব্যক্তি আমাদের হযরত খানজাহান আলী (রঃ) এই আলোচনায় একটি অধুনা প্রকাশিত মতামতের একটু আলোচনা করা দরকার। হযরত খানজাহান আলীর (রঃ) মাজারে শিলালিপিতে উৎকীর্ণ তাঁর নামের পূর্বে উলুঘ শব্দটি যুক্ত দেখে অনেকে সন্দেহ পোষণ করেন ও মত প্রদান করেন যে তিনি উলুঘ বেগ কিনা? কেউ বলেছেন যে তিনি উলুঘ বেগ হলে, তিনি কার পুত্র একথা বলতে আমাদের মোটেই কষ্ট হবার কথা নয়। কথাটা অযৌক্তিক নয় কিন্তু তাঁর পূর্বে আমাদের নিশ্চিত হওয়া প্রয়োজন যে তিনি উলুঘ বেগ কিনা? ইতিহাসের আলোকে আমার মতামত এই যে তিনি কোন, যুক্তিতেই উলুঘ বেগ হতে পারে না এ সন্দেহ নিতান্ত অমূলক। ঐতিহাসিক লেন পুল (Lane Pool) W. Hunter প্রকাশিত তাঁর Rular of India Voll II তে বাবর সম্পর্কে বলতে গিয়ে এ ধারণা পরিষ্কারভাবে খণ্ডন করেছেন। তিনি লিখেছেন,

Everyone of the rumerous progemy of Timur was a climent of some throne. Mowarana her or transoxiana,

The land of the two great river, Oyus and Iayartep, the Amu or Sirdaria of to day was a cockpit for the gealousy and stribe of a multitude of petty priences, who whether called themselves Mirla or plaine Amir in Arabic rcsembles one anothers closely in character and ambision. ………our this view of sheming advantnrrs, the king of Samarkand endeavoured to maintain some show of Authority, This was sultan Ahamad Mirla Babears uncle a weak easy going to per manage by his Beg or nobles.

Ahmed brother Mahmud ruled the country of the upper oxus, Kundul and Badakhshan up to the icy barior of the Hindukush. A third brother ulugh Beg held Kabul and Gazni and a forth Babar's to the Omar Shaik was king of Farghana or as it was afterwords called Khakad,

অর্থঃ তৈমুর বংশের প্রত্যেকটি লোক এক একটি সিংহাসনের দাবীদার ছিল। মাওয়ারান্নাহার অথবা ট্রানসোক্সিয়ানা অকসাস ও ইকজারটেজ নদী বর্তমানে আমু ও শিরদরিয়া নামক দুই নদীর মধ্যবর্তী ভূ-ভাগ ছিল। অগণিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজন্যবর্গের ইর্ষা ও আকাংখার পীঠস্থান যাহারা তাহাদিগকে মীর্জা ও সহজ আরবী ভাষায় আমীর উপাধিতে ভূষিত করিতেন এবং যাহাদের একে অন্যের সংগে চরিত্রে ও আকাঙ্ক্ষায় সামঞ্জস্য ছিল……… …।

এই সমস্ত পরিকল্পিত অভিযানকারীদের মধ্যে সমরখন্দের রাজা নিজেকে সকলের প্রধান বলে মনে করিতেন। বাবরের চাচা সুলতান আহম্মদ মীর্জা তিনি ছিলেন দুর্বল চরিত্রের এক সাধারণ ব্যক্তি। তিনি নিজেকে বেগ অথবা

www.pathagar.com

সম্মানিত ব্যক্তি বলিয়া আখ্যায়িত করিলেন।

আহম্মদের ভাই মাহ্‌মুদ অকসাস নদীর উপরিভাগে কুনগুজবা কনৌজ বদোকশান হইতে হিন্দুকুশের হিমালয় পর্যন্ত রাজ্য শাসন করিতেন। তৃতীয় ভ্রাতা উলুব বেগ ও গজনীর শাসনকর্তা ছিলেন ও চতুর্থ ভ্রাতা বাবরের পিতা ওমর সেই ফরঘানা রাজ্যের রাজা ছিলেন যাহাকে পরবর্তীকালে খাকান্দ বলা হইত।

আমাদের আলোচ্য খানজাহান আলী (রঃ) কোন মতেই বাবরের তৃতীয় চাচা কাবুল ও গজনীর রাজা উলুঘ বেগ হতে পারেন না। একথা Stanley Lane Poole সাহেব তাঁর একই ইতিহাসে স্পষ্ট ভাষায় লিখেছেন যে,

"Ulugh Beg Babars uncle, The King of Kabul died in 1501, his young son Abd-ur-Razzk had been deposed by a revolution anarchy had followed and a usurper, Mukim Beg an Arghun Mongol from Kandahar sized the throne."

অর্থঃ "বাবরের চাচা কাবুলের রাজা উলুঘ বেগ ১৫০১ খৃঃ মৃত্যুমুখে পতিত হন। তাঁর পুত্র আবদুর রাজ্জাক এক আন্দোলনের দ্বারা সিংহাসনচ্যুত হন। তখন একটা অরাজকতা বিরাজ করতে থাকে এবং কান্দাহার থেকে আগত মুকিম বেগ নামক একজন দুর্দান্ত মোঘল অন্যায়ভাবে সিংহাসন অধিকার করে।" কাজেই উপরোক্ত ইতিহাসের আলোকে একথা আমরা নিঃসন্দেহে বলতে পারি যে তিনি কোন মতেই বাবরের চাচা উলুঘ বেগ হতে পারেন না।

ইতিহাস আমরা আরও যতই আলোচনা করিনা কেন মাজারে খোদাইকৃত সন ও তারিখের জন্যও আলোচিত ইতিহাসের সামঞ্জস্যপূর্ণ যুগের জন্য বার বার আমাকে জৌনপুরের শাসনকর্তা সুলতান ইব্রাহিম শর্কির আমলে ফিরে আসতে হয়। অনেকের মতো আমিও বিশ্বাস করি যে

www.pathagar.com

তিনি জৌনপুর থেকে আগমন করেছিলেন, কিন্তু তিনি বাদশা নন। আবার তিনি গৌড় অধিপতিদের নফর বা প্রতিনিধি ছিলেন একথাও মিথ্যা নয়। ইতিহাস আলোচনায় আমার এ ধারণাও বদ্ধমূল হয়েছে যে এই সময় হজরত নুর-ই-কুতুবুল আলমের নির্দেশ মোতাবেক বাংলার ইসলামকে রক্ষা করার জন্য ও ইসলাম প্রচারার্থে যে দলটি প্রেরণ করা হয়েছিল বলে ইতিহাসে জানা যায় এবং সেই দলের প্রধান হিসাবে যাকে নির্বাচন করা হয় ও যিনি জৌনপুর থেকে ৬০ হাজার সৈন্য নিয়ে যাত্রা শুরু করে রাজা গণেশের রাজধানী গৌড়-এর মধ্য দিয়ে বারেন্দ্রভূমি পার হয়ে বারোবাজার এসে আস্তানা স্থাপন করেছিলেন তিনি ইব্রাহিম শর্কির সেই প্রধান সেনাপতি ছাড়া আর কেউ নন এবং তিনিই আমাদের হযরত খানজাহান আলাইহের রহমাত।

আলোচ্য ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিতে আমি একথাও বলতে চাই যে নিশ্চয় সুলতান ইব্রাহিম শর্কি এবং তাঁর প্রধান সেনাপতি পরবর্তীকালে যিনি খানজাহান উপাধিতে ভূষিত হয়েছিলেন দুজনেই হযরত নুর-ই-কুতুব উল আলম ; দরবেশ বলে যাঁর নাম ইতিহাসের পাতায় উল্লেখ রয়েছে, তাঁরই মুরিদ ছিলেন। তা না হলে জৌনপুরের মহামান্য সুলতান হয়ে গৌড়ের সামান্য মক্তবের একজন শিক্ষক ও ফকিরের ডাকে সাড়া দিয়ে, তাঁর একটি মাত্র চিঠি পেয়ে ও তাঁর উপর বিশ্বাস স্থাপন করে সৈন্য সামন্ত নিয়ে গৌড় আক্রমণ করতে ছুটে আসতেন না। একবার নয় দ্বিতীয়বার ও তিনি তাঁর চিঠির মর্যাদা দিয়েছিলেন ও ইসলাম এবং মুসলমানদের জানমালের খাতিরে তাঁর নির্দেশ মোতাবেক তিনি অসাধারণ সাহায্য প্রদান করেছিলেন। হযরত নুর-ই-কুতুব-উল আলমের নির্দেশ ছিল যে এই অত্যাচারী রাজা গণেশের রাজ্যের মধ্যে প্রবেশ করে ইসলাম প্রচার করা, মানুষকে শান্তিপূর্ণভাবে ইসলামে দাওয়াত দেওয়া। এই কাজে যদি তাঁরা বাধাপ্রাপ্ত হন তবে তার মোকাবেলা করার জন্য ইব্রাহিম শর্কির প্রধান সেনাপতি ও আমাদের আলোচ্য খানজাহান আলির নেতৃত্বে ৬০ হাজার সৈন্য প্রেরণ করেছিলেন। এই

www.pathagar.com

কারণেই এই কাফেলার প্রত্যেকটি লোক জেহাদের জন্য সর্বদা প্রস্তুত হয়ে থাকতেন। সে ১২ জন প্রধানের অধীনে, প্রত্যেকের ৫ হাজার করে ৬০ হাজার সৈন্য পরিচালিত হয়েছিল তাঁরাও নিতান্ত ক্ষুদ্র লোক ছিলেন না। তাঁরাও একজন আউলিয়া ও যোদ্ধা ছিলেন এবং উক্ত ইতিহাসের বিখ্যাত কুতুবই তাঁদের নির্বাচিত করেছিলেন। কিন্তু তাঁরা যে কে ছিলেন তার পূর্ণ পরিচয় অজ্ঞাত। এটি ইতিহাসের একটি কালমাত্র। ইতিহাসের একজন সুলতানের কার্যকলাপের এটি একটি কাহিনী মাত্র।

এখন দেখা যাক সুলতান ইব্রাহিম শর্কির এই প্রধান সেনাপতির প্রথম জীবনের ইতিহাস কি? এবং নুর-ই কুতুব-উল-আলমের সহিত তাঁর এমন কি সম্পর্ক ছিল যার কারণে তিনি তাঁকে এতবড় দায়িত্বভার দিয়েছিলেন এবং তিনিও এ দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন। এক্ষেত্রে এ কথা সহজে অনুমান করা যায় যে নিশ্চয় তাঁর মুরিদদের মধ্যে যাঁরা তত্ত্বজ্ঞানী ও মারেফাত বিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন। তিনি ছিলেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম। তিনি ছিলেন "দেল মে দেল জুদা করনা মরিদ।" মুর্শিদের উদ্দেশ্য এইরূপ একটি কথার উল্লেখ তাঁর মাজার গাত্রের একটি বিক্ষিপ্ত স্থানে পরিলক্ষিত হয়। ইসলামী ঝাণ্ডা হাতে সেদিন তাঁর সাথে যাঁরা বেরিয়ে পড়েছিলেন তাঁদের মূলধন ছিল মুর্শিদের দোয়া ও আল্লার মেহেরবানী। অতুল ধনসম্পদ নিয়ে তাঁরা বেরিয়ে ছিলেন না। তাঁরা ছিলেন সমস্ত রহমাতের মালিক, একমাত্র আল্লার মোহতাজ। একথারও উল্লেখ মাজারে খোদাই করা রয়েছে। তাঁরা সবাই ওলি ছিলেন এবং খানজাহান আলাইহের রহমাত ছিলেন এই ওলি দলের সর্দার। বারোবাজারে যে বারো'জন আউলিয়ার আগমনের কথা শোনা যায় এবং তাঁদের নজির ও মাজারের হাদিস আজও কিছু কিছু পাওয়া যায় তাঁরা এই বারোজন ছাড়া অন্য কেউ নন। এই দলের প্রধান ব্যক্তি ছাড়া বাকী এগারোজন সম্পর্কে পরে যথাসম্ভব আলোচনা করা গেল। এখন দেখা যাক এরা কেন এবং কোন কারণে তৎকালীন সুন্দরবন অঞ্চলের প্রবেশদ্বার

www.pathagar.com

বারোবাজারে এসে আস্তানা স্থাপন করেছিলেন। অনেকে বলেন ইসলাম প্রচারের জন্য তাঁরা বাংলার বিভিন্ন দিকে ছড়িয়ে পড়েছিলেন এবং বিশেষ এক সময়ে তাঁরা এখানে এসে মিলিত হয়েছিলেন এবং এখানে বসে তাঁরা পরবর্তী কর্মপন্থা নির্ধারনের জন্য মোশাহেরা বা পরামর্শ করেছিলেন। ফলে এখানে বেশ কিছুদিন অবস্থান করতে হয়েছিল। আবার কেউ বলেন এইখানেই তাঁরা প্রথম বাধাপ্রাপ্ত হয়েছিলেন। আমার মতে এই দুই মতের মধ্যেই সত্যতা নিহিত রয়েছে। তবে কি পরামর্শ তাঁরা করেছিলেন এটা সহজেই অনুমান করা যায়।

সুলতান ইব্রাহিম শর্কির দ্বিতীয়বার আগমনের কথা অবগত হবার পর রাজা গণেশ গৌড় ত্যাগ করে দিনাজপুর অভিমুখে যাত্রা করেন। এই সময় অর্থাৎ ১৪১২– ১৪১৪ খৃষ্টাব্দে উক্ত দরবেশের নির্দেশে ও সুলতানের আদর্শে বিপুল সৈন্যসহ রাজধানী গৌড় এর উপর দিয়ে তাঁরা বারেন্দ্রভূমি অভিমুখে যাত্রা করেন। হযরত শাহ কতুমের ইতিহাসের ও আলোচনায় দেখা যায় যে এই সময় এখানে হিন্দু প্রভুত্ব কায়েম হয়েছিল। কেউ কেউ বলেন, যে এই কাফেলা জৌনপুর থেকে তাঁদের যাত্রা শুরু করেছিলেন এবং গৌড়ে হযরত নুর-কুতুব-উল আলমের দরবার হয়ে তাঁরা বাংলার দক্ষিণাঞ্চলের দিকে রওনা হন। কিন্তু তাঁরা যে গৌড় থেকে তাঁদের যাত্রা শুরু করেছিলেন, এই মতের সমর্থন বেশী। তাঁর দক্ষিণাঞ্চলে আসার কারণ এই যে সুলতানের এইরূপ নির্দেশ ছিল যে তিনি যেন ক্রমান্বয়ে দক্ষিণ দিকে অগ্রসর হন ও বাদশার প্রতিনিধি হয়ে ঐ অঞ্চলের শাসনভার (যশোর ও খুলনা) গ্রহণ করেন। নীলমনি ঘটকের কারিকাগ্রন্থের পাওয়া লিপিতে জানা যায় যে, খানজাহান কোন এক বাদশার নফর ছিলেন এবং তাঁরই সনদ লয়ে তিনি যশোর খুলনা শাসন করতে আসেন।

কবির ভাষায়—

খানজাহান মহামণি পাতসা নফর
যশোর সনন্দ লয়ে করিল সফর॥

www.pathagar.com

তাঁর মুখ্য মহাপাত্র মামুদ তাহির
মারিতে বামুন বেটা হইল হাজির।"

কবির বর্ণিত মামুদ তাহির বা মোহাম্মদ তাহের যে খানজাহানের মুখ্য মহাপাত্র ছিলেন আমাদের আলোচিত খানজাহান নিঃসন্দেহে এই খানজাহান। কারণ এই খানজাহানের মাজারের পাশে আজও মোহাম্মদ তাহেরের মাজার বিদ্যমান এবং এই মাজারে তাঁর নাম খোদাই করা রয়েছে। কিন্তু এই খানজাহান যে কোন বাদশার নফর ছিলেন সে সম্পর্কে কারিকা গ্রন্থের লেখক কিছুই বলেননি। কিন্তু তিনি পরিস্কার ভাবে না বললেও তাঁর বক্তব্যের মধ্যে এমন উল্লেখ রয়েছে যার ফলে এ কথা সহজে অনুমান করা যায় যে মুসলমানদের সঙ্গে ব্রাহ্মণদের দ্বন্দ্ব কলহের সময় যখন খানজাহানের মহাপাত্র মোহাম্মদ তাহেরের হাতে তারা ভীষণভাবে পর্যদুস্থ হচ্ছিল সেই সময়ের কিছু পূর্বেই খানজাহানের আগমনকাল। পরবর্তীকালের নবদ্বীপের ব্রাহ্মণদের দ্বন্দ্ব কলহের সময় ছিল গৌড়ের সুলতানদের শাসনামল এবং হিন্দুধর্ম তখন বিলুপ্তির পথে। কাজেই এখানেও দেখা যায় যে যদি তিনি নফর থেকেও থাকেন তবে গৌড়ের সুলতানদের মহামান্য নফর বলে সবাই মনে করেন দিল্লীর সুলতান ফিরোজ শাহ তোঘলকের নফর হওয়ার কোন কারণ বা যুক্তি নেই।

উপরোক্ত কারিকারের মতে "মামুদ তাহির" খানজাহানের মুখ্য মহাপাত্র ছিলেন। তিনি পূর্বে হিন্দু সন্তান ছিলেন। জনৈক মুসলমান রমণীর প্রেমে মজে তিনি ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন এবং পরবর্তীকালে স্বীয় বিদ্যা ও বুদ্ধিবলে খানজাহানের প্রিয়পাত্র হয়ে ওঠেন। শেষ পর্যন্ত তাঁর মুখপাত্র বা প্রধান মন্ত্রীরূপে নিযুক্ত হন।

মামুদ তাহিরের সহায়তায় অল্পদিনের মধ্যে তিনি একটি বড় কল্যাণ রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা করেন। সেটি পরে খলিফাতাবাদ রাজ্য নামে পরিচিত হয়।

কারিকা গ্রন্থকারের বর্ণিত খানজাহানই যে আমাদের আলোচ্য খানজাহান

www.pathagar.com

তাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহের অবকাশ নেই। কারিকাকার একটিমাত্র কথায় তার রাষ্ট্রের সুন্দর বর্ণনা দিয়েছেন। এটি ছিল একটি কল্যাণ রাষ্ট্র। কাজেই খলিফাতাবাদ রাজ্য যে একটি শান্তির রাজ্য ছিল এতেও সন্দেহের অবকাশ নেই। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের সহ অধ্যক্ষ মোঃ আবু তালিব তাঁর উলুখ-খান-ই জাহান প্রবন্ধে এই কথাই বলেছেন যে খানজাহান আলী গৌড়ের সুলতানদের শাসনামলের একজন ব্যক্তি এবং তিনি এই দরবারের নফর ছিলেন এবং তিনি তাঁদের প্রতিনিধি হয়ে তাঁর প্রতিষ্ঠিত খলিফাতাবাদ রাজ্যের শাসন কার্য পরিচালনা করেছেন।

১৯৬১ সালের কার্তিক সংখ্যায় প্রকাশিত জনাব হেদায়েতুল ইসলাম খান তাঁর "খানজাহান আলী" নামক প্রবন্ধে মনোজ্ঞ আলোচনা করে বলেছেন যে, "তিনি গৌড় রাজাদের নফর ছিলেন। প্রথমে তিনি যশোরে আগমন করেন ও পরে বাগেরহাটে আগমন করেন। তিনি হযরত নুর-ই-কুতুব উল আলমের মুরিদ ছিলেন। তখন গৌড়ের স্বাধীন সুলতান ছিলেন নাসির উদ্দিন মাহমুদ শাহ। তাঁর অনুমতি ও সনদ নিয়ে তিনি ইসলাম প্রচারে বহির্গত হন। ......তাঁর মাজারে নাসির উদ্দিন মাহমুদ শাহের নাম লিখিত রয়েছে।"

এই প্রবন্ধ লেখক যদি হযরত খানজাহান আলীর (রঃ) মাজারে নাসির উদ্দিন মাহমুদ শাহের নাম লিখিত দেখে থাকেন তবে আমার বর্ণিত ইতিহাসের ও তার সময়কাল সম্পর্কে যে একটা সুনির্দিষ্ট নিদর্শন পাওয়া গিয়েছে একথা নিশ্চিত করে বলা চলে। একটি প্রাপ্ত তায়েদাদ নামায় আবার হোসেন শাহের নামের উল্লেখ দেখা যায়। অতএব ইতিহাসে বর্ণিত ঘটনাপুঞ্জের পরিপ্রেক্ষিতে এ অনুমানই সঙ্গত যে, তিনি দিল্লী আগ্রার কেউ নন। কিন্তু তিনি যদি নফর থেকে থাকেন তবে নিঃসন্দেহে জৌনপুরের ধর্ম-প্রাণ ও পরাক্রমশালী সুলতান ইব্রাহিম শর্কির প্রধান সেনাপতি ছিলেন ঘটনাক্রমে যিনি খানজাহান উপাধিতে ভূষিত হয়েছিলেন। কিন্তু পরবর্তীকালে

www.pathagar.com

ইসলাম প্রচারে বহিঃর্গত হয়ে যখন তিনি খলিফাতাবাদ নামক এই কল্যাণ-রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা করেন কিন্তু তখন এটি গৌড় রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হ'য়ে পড়ে এবং যেহেতু তিনি নিজে কোন রাজ্যের মালিক হ'তে চাননি ও নিজের জীবনকে আল্লার রাস্তায় উৎসর্গ করেছিলেন সেই হেতু গৌড়ের সুলতান হোসেন শাহ ও পর্যায়ক্রমে নাসিরউদ্দিন মাহমুদ শাহের নিকট থেকে সনদপ্রাপ্ত হয়ে তাঁদের মহামান্য নফর হিসাবেও তিনি এই রাজ্যের শাসনকার্য পরিচালনা করেছেন। কিন্তু তাঁর সুদীর্ঘ শাসনআমলেও এদের মধ্যে নাসিরউদ্দিন মাহমুদ শাহই তাঁকে বেশী সাহায্য ও সহযোগিতা প্রদান করেছেন।

বহুলপ্রচলিত একটি কাহিনীতে একথা জানা যায় যে হযরত খানজাহান আলী (রঃ) যখন এই অভিযানে বহির্গত হন তখন তাঁর অধীনে ৬০ হাজার সৈন্য ছিল। এবং পর্তুগীজ ইতিহাসের একটি তথ্যে জানা যায় যে সুন্দরবনের অভ্যন্তরে সমতট অঞ্চলে পুর্বে 'খাদি' নামক স্থানে একটি শাসনকেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত ছিল এবং পরে এই খাদি অঞ্চল খলিফাতাবাদ রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়ে। এই সময়ের ইতিহাস এমনই যে হযরত খানজাহান আলী (রঃ) যখন ৬০ হাজার সৈন্য সহ রাঢ় ও বারেন্দ্রভূমি পার হ'তে থাকেন তখন রাজা গণেশ বিচলিত হয়ে দিনাজপুরে পলায়ন করেন কিন্তু এদের বাধা প্রদানের জন্য তিনি তাঁর একদল সুশিক্ষিত সৈন্য প্রেরণ করেন। তাঁরা তাঁদের বারোবাজারের অদূরে বিজয়পুর নামক স্থানে বাধা প্রদানের চেষ্টা করে, কিন্তু পরাজিত হয় ও পলায়ন করে। ফেরার পথ রুদ্ধ হওয়ায় তাঁরা সুন্দরবনের অভ্যন্তরে সমতটের এক মগ রাজ্যের নিকট আশ্রয় গ্রহণ করে ও এই খাদি অঞ্চলে অবস্থান করতে থাকে। সেন রাজাদের শাসনামলে ১১ শতকের শেষের দিকে বাগ্দি অঞ্চল শাসন করার নিমিত্ত তারা সুন্দরবনের সমতট অঞ্চলে তাঁরা একটি শাসনকেন্দ্র স্থাপন করেন। তাঁদের বৌদ্ধ বিতাড়নের পুর্বেই এটি স্থাপিত হয়েছিল। এই স্থানটির তৎকালীন নাম ছিল "খাদি অঞ্চল।" এই স্থানে অবস্থানকালে রাজা গণেশের সঙ্গে তাঁদের সমস্ত যোগাযোগ ছিন্ন হ'য়ে পড়ে কারণ তাঁদের

www.pathagar.com

ফেরার পথ রুদ্ধ করে কিছুদিনের মধ্যে হযরত খানজাহান আলী (রঃ) বারোবাজারে তাঁর স্থায়ী আস্তানা স্থাপন করেন। পরে এই সৈন্যদল মগরাজের নিকট যুদ্ধের জন্য শক্তি ও সাহায্য ভিক্ষা করে ও যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হ'তে থাকে।

এদিকে হযরত খানজাহান আলী (রঃ) ও তাঁর দলের সবাই শুধু যুদ্ধ নয়-জীবনের বিনিময়ে যে কোন প্রকার সংগ্রামের মোকাবেলা করার প্রতিজ্ঞা নিয়েই ইসলাম প্রচারে বহির্গত হয়েছিলেন। ফলে এই দুই দলের মধ্যে সংঘর্ষ অনিবার্য হয়ে দেখা দেয়। বারোবাজার অবস্থানের সময় যখন তাঁরা শত্রুদের গোপন ষড়যন্ত্রের কথা জানতে পারলেন এবং ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা নিরূপণের জন্য নিজেদের মধ্যে পরামর্শের নিমিত্ত তাঁরা এখানে বেশ কিছুদিন অবস্থান করেন। গল্পসূত্রে জানা যায়, এই সময় শাহবাজ খাঁ নামক একজন বিখ্যাত যোদ্ধা এই সকল সংবাদে খুব উত্তেজিত হয়ে ওঠেন ও যুদ্ধের জন্য অগ্রসর হওয়ার কথা বলেন কিন্তু হযরত খানজাহান আলী (রঃ) তাঁকে ধৈর্য্য ধারণ করতে ও ঠিক সময়ের জন্য অপেক্ষা করতে নির্দেশ দেন। তিনি বলেন যুদ্ধ আমাদের মোকছেদ নয়। আর তাই যদি হয় তা হলে তোমারা যুদ্ধ কর। আর যদি ইসলাম প্রতিষ্ঠা করা মোকছেদ হয় তবে ইসলামের বুনিয়াদ গঠনের দিকে তোমরা মনোনিবেশ কর। বিজয় আল্লার হাতে। এই উপদেশ শ্রবণে সবাই শান্ত হয়। আক্রান্ত হলে তাঁরা যুদ্ধ করবেন এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।

ইসলামের এই আদর্শকে অনুসরণ করে এই বৌদ্ধ, হিন্দু, বাগ্দি ও মগ অধ্যুষিত এলাকায় তিনি একটি স্বাধীন মুসলিম রাষ্ট্র কায়েম করতে সক্ষম হয়েছিলেন। ইসলামের ইতিহাস প্রমাণ করে যে যেহেতু ইসলাম ধর্ম শুধু জপ ও তপের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয় সেইহেতু ইসলামে ধর্ম ও রাজনীতি কোন আলাদা বস্তু নয়, একে অন্যের পরিপূরক। ধর্ম প্রচারের পর তাঁকে জিন্দা রাখার জন্য তাঁকে রাজ্য বা রাজনীতির দায়িত্ব গ্রহণ করতে হয়। খোলাফায়ে রাশেদীনগণও তাই ফকিরের মত জীবনযাপন করেও অর্ধ পৃথিবীর

www.pathagar.com

শাসনকর্তারূপে রাজ্য পরিচালনা করতে বাধ্য হয়েছেন। হযরত খানজাহান আলী (রঃ) যখন ইসলাম প্রচার করতে করতে বাগেরহাট এসে পৌঁছালেন তখন স্বাভাবিক নিয়মেই একটি ইসলামিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়ে পড়ে। এই এলাকায় তখন তিনি খলিফাদের আদর্শ অনুসারে কোরান ও ছুন্না মোতাবেক ইসলাম শাসন ব্যবস্থা চালু করেন। প্রথম দিকে এই রাজ্যটি একটি স্বাধীন রাজ্য বলে বহির্জগতে পরিচিতি লাভ করে ও ব্যবসা বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে পর্তুগীজগণ এখানে আসতে শুরু করে। পর্তুগীজ মানচিত্রে এই স্থানকে কুইপিট-আভাজ (খলিফাতাবাদ) বলে উল্লেখ করা হয়েছে। হযরত খানজাহান আলী (রঃ) ছিলেন রসুল করিম (দঃ) এর জীবনাদর্শ ও ইসলামের নীতিতে পূর্ণ আস্থাবান এবং খলিফা ওমর ফারুক (রঃ) কে অনুসরণ করে তিনি রাজ্য পরিচালনা করেছেন। খলিফা হয়েও যারা এই নীতি বহির্ভূত তাদের তিনি অনুসরণ করেন নি।

হযরত খানজাহান আলী (রঃ) যে নীতির অনুসরণ করে এই কল্যাণ রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন অনেক মুসলমান শাসক ও খলিফা এইরূপ নীতি অনুসরণ করেন নি। ফলে তাঁরা অভিশপ্ত হয়েছেন। খলিফাদের ইতিহাস ও ইমামদের জীবনী থেকে দু একটা উপমা দিলেই একথার সত্যতা পরিস্ফুট হয়ে উঠবে। —উমাইয়া বংশের খলিফা মতিছাম্বিলএর সময় যুক্তিবাদী মুতাজিলাগণ খুব প্রবল হয়ে ওঠে। কোরানের আয়াতের বিভিন্ন রকম অর্থ করে তাঁরা তাঁদের মতের স্বপক্ষে ও রাসুলুল্লার বক্তব্যের বিপক্ষে যুক্তি খাড়া করতো। যেমন—কুল্লু নাফছেন জায়েকাতুল মউত-এর অর্থ তারা করত প্রত্যেক বস্তুই মরণশীল। কাজেই আল্লাহও একটি বস্তু। অতএব আল্লাও মরণশীল। তাদের মতে কোরান হল মখলুখ অর্থাৎ সৃষ্ট। এই মতবাদের বিরুদ্ধে সেদিন দাড়িয়েছিলেন ইমাম হাম্বল (রঃ)। যখন তিনি তাঁদের প্রতিটি প্রশ্নের জবাব দিলেন ও তাদের যুক্তি খণ্ডন করলেন তখন খলিফা স্বয়ং তাঁর উপর ক্ষিপ্ত হয়ে গেলেন এবং অত্যাচার শুরু করলেন। মার খেতে খেতে এক

www.pathagar.com

সময় তাঁর সমস্ত শরীর অবশ হয়ে আসতে থাকে ও ইজারা বন্ধ খুলে যাবার উপক্রম হয়। বেশরম হবার ভয়ে তিনি ইয়া আল্লা বলে শব্দ করেন এবং সবার সম্মুখে দুটি স্বর্ণময় হাত এসে তার ইজারা-বন্ধ বেধে দিয়ে যায়। তাদের জীবনের ঘটনায় এমনি উল্লেখ আছে যে ইমাম হাম্বল (রঃ) এর জীবনে যখন এমনি একটি ঘটনা ঘটবে তার পূর্বে ইমাম শফি একদিন স্বপ্নে দেখতে পান যে রসুলুল্লাহ তাঁকে বলছেন, হে শফি তুমি হাম্বলকে বলে দাও তার পরে মুছিবত আসছে, সে যেন বিচলিত না হয়। ইমাম শফি অতি দুঃখের সঙ্গে এই সংবাদ তাকে পত্রে লিখে জানান। এই সংবাদ যে রসুলুল্লার তরফ থেকে আসছে, এই কথা জেনে তিনি আনন্দে আত্মহারা হয়ে তাঁর গায়ের একটি মাত্র জোব্বা ইমাম শফিকে দান করেন। ইমাম শফি অতি ভক্তির সহিত এই জোব্বা ভিজিয়ে তার পানি পান করতেন। আর কোরানের মূলতত্ত্ব জানেন বলে ইমাম হাম্বল ইমাম শফিকে শ্রদ্ধা করতেন

ইসলামের ভিতর দুটি দলের সৃষ্টি হওয়ার মূলে ছিল আবদুল্লা বিন ছাবা নামক এক ব্যক্তি। তিনি প্রথমে ছিলেন একজন ইহুদী পণ্ডিত। কিন্তু কোন মতেই ইসলামের অগ্রগতি রোধ করতে না পেরে তিনি সিদ্ধান্ত নিলেন যে তিনি প্রথমে মুসলমান হবেন ও পরে মুসলমানদের ভিতর ভাঙ্গন সৃষ্টি করবেন। সে তার কর্তব্য সাধন করেছিল। তাঁর দলই খলিফাদের হত্যা করে এবং আলিকে আল্লা বলে অভিহিত করে ও আলীর হাতেই অগ্নিদগ্ধ হয়ে ধংসপ্রাপ্ত হয়।

হযরত খানজাহান আলী তাঁর রাজ্যশাসন নীতি ও আদর্শে আবদুল্লা বিন ছাবার দল হতে নিজেকে সম্পূর্ণ পৃথক করে রেখেছিলেন বলে তাঁর দ্বারা এই কল্যাণ রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হয়েছিল। তিনি নিজেকে স্বাধীন সুলতান বলে ঘোষণা করেননি। এই খানে বিভিন্ন স্থান খুড়ে বিভিন্ন মুদ্রা পাওয়া গিয়েছে যাকে নাছির উদ্দিন মাহমুদ শাহের মুদ্রা বলেই সবাই ধারণা করেন এবং সেগুলি কলকাতা মিউজিয়ামে আজও রক্ষিত রয়েছে।

এই রাজ্য প্রতিষ্ঠার প্রাকালে যাদের সঙ্গে তাঁর যুদ্ধ হয়েছে অনেকে

www.pathagar.com

মনে করেন চন্দ্রদ্বীপের রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা (দনুজমর্দ্দিন দেব তাঁদের একজন। অনেকের মতে তিনি তাঁর সমসাময়িক ছিলেন (বিতর্কমূলক)। দনুজমর্দ্দিন দেব অবশ্য নিজ নামে মুদ্রা প্রচলন করেছিলেন। তিনি ১৪১৭ খৃষ্টাব্দে তাঁর রাজ্য স্থাপন করেছিলেন কিন্তু দক্ষিণবঙ্গ জয় করার চেষ্টা তিনি কোনদিন করেননি তাই খানজাহান আলী (রঃ) এর সঙ্গে তাঁর যুদ্ধ বিগ্রহের কোন প্রশ্নই ওঠে না। রাজা গণেশও দক্ষিণবঙ্গ জয়ের কোনদিন কোন চেষ্টা করেননি। ১৪১৮ খৃষ্টাব্দে দিনাজপুরে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। যদিও এই রাজ্য রাজা গণেশের রাজ্যেরই একটি অংশ বিশেষ তবু তিনি এই অংশ তাঁর অধিকারে আনার নিমিত্ত কোনরূপ বিক্রম দেখাতে সাহসী হননি।

রাজা গণেশের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র যদু সেন ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে জালালুদ্দীন নাম ধারণ করে সিংহাসনে আরোহণ করেও তিনি দক্ষিণ বঙ্গ জয়ের কোন চেষ্টা করেননি বা খানজাহানের বিরুদ্ধে কোন সৈন্য প্রেরণ করেননি। ১৪৩১ খৃষ্টাব্দে জালালুদ্দিনের মৃত্যু হয়। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র শামছুদ্দিন আহম্মদ শাহ সিংহাসন লাভ করেন। কিন্তু তিনি ছিলেন কিছুটা তাঁর পিতামহের গুণে গুণান্বিত। নিজের খেয়ালখুশিমত প্রবৃত্তি চরিতার্থের জন্য সর্বদা ব্যতিব্যস্ত থাকতেন এবং অত্যন্ত দুর্বলচেতা ছিলেন। ১৪৪২ খৃষ্টাব্দে তিনি তাঁর দুই ভৃত্য সাদি খান ও নাছির খানের হাতে নিহত হন। এরপর গৌড়ের সিংহাসনে আরোহণ করেন ইলিয়াস শাহী বংশের সুলতান নাসির উদ্দিন মাহমুদ শাহ।

কাজেই দেখা যায় ১৪১০ খৃষ্টাব্দ থেকে ১৪৪২ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত গৌড়ের সিংহাসনে এমন কোন সুলতান অধিষ্ঠিত ছিলেন না যিনি দক্ষিণ বঙ্গ জয়ের কোনরূপ চেষ্টা করেছিলেন। এই সুযোগে ছোট ছোট দ্বন্দ্বসংঘাত পেরিয়ে নির্বিবাদে ইসলাম প্রচার করে হযরত খানজাহান আলী এদেশের মানুষের আপনজন হয়ে উঠেছিলেন ও দক্ষিণ বঙ্গ নিজেকে সুপ্রতিষ্ঠিত করে নিয়েছিলেন। পরবর্তীকালে এক পর্যায়ে নাছিরউদ্দিন মাহমুদ শাহ অবশ্য দক্ষিণ বঙ্গ জয়ের

www.pathagar.com

চেষ্টা করেছিলেন। খানজাহান আলী (রঃ) সম্পর্কে ঐতিহাসিক ডঃ হাবিবুল্লা বলেন যে তিনি যশোর খুলনার এক বিস্তীর্ণ এলাকা জয় করেছিলেন ও মুসলমানদের আবাসভূমিতে পরিণত করেছিলেন। তাঁর History of Bengal (Voil 11) এর এক জায়গায় তিনি বলেছেন—

'Annexation of at last a part of the Jessore and Khulna district is implied by the inscription on the tomb erected at Bagerhat in selhay 863 October 1459 of Khanjahan to whom local tradition as cribes the last Muslim coconilation of the area."

হেদায়েতুল ইসলাম সাহেবের মতে "হযরত খানজাহান আলী মাহমুদ শাহের সাথে কোন সংগ্রামে অবতীর্ণ না হয়ে তাঁর সাথে বন্ধুত্বমূলক সন্ধি স্থাপন করেছিলেন।

এই মত সমর্থনযোগ্য বলে আমিও মনে করি। সিংহাসনে আরোহণ করার পর সুলতান নাছির উদ্দিন মাহমুদ শাহ সর্বপ্রথম অভিযান করেন দক্ষিণ বঙ্গ। কারণ পূর্বাহ্নেই তিনি অবগত ছিলেন যে খানজাহান নামক এক দরবেশ (saint) দক্ষিণ বঙ্গ তাঁর রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত এলাকায় খলিফতাবাদ নামে একটি স্বাধীন রাজ্য স্থাপন করেছেন। দক্ষিণ বঙ্গে এই একবারই তিনি অভিযান করেছিলেন। যশোর সীমান্তে ছাউনি ফেলার পর তিনি জানতে পারেন যে এই রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা খানজাহান একজন ওলি ব্যক্তি। লোকে তাঁকে পীর বলে শ্রদ্ধা করে এবং সবাই তাঁর মুরিদ। তিনি খোঁজ নিয়ে যখন জানতে পারেন যে ইসলাম প্রতিষ্ঠার খাতিরে তিনি এই রাজ্য প্রতিষ্ঠা করতে বাধ্য হয়েছেন এবং নিজ নামে কোন মুদ্রা প্রচলন করেননি তখন তিনি মনে মনে তাঁর প্রতি খুশি হন। তাঁদের দুজনের দেখা হবার পর সমস্ত ভুলের অবসান ঘটে। হযরত খানজাহান আলী তখন সুলতানকে এই রাজ্যের দায়িত্বভার গ্রহণ করার জন্য অনুরোধ জানান কিন্তু তিনি খানজাহানের

www.pathagar.com

হাতেই দায়িত্বভার রেখে সন্ধি স্থাপন করেন। ইসলাম প্রচারের নিমিত্ত ও এই রাজ্যকে সুপ্রতিষ্ঠিত করার নিমিত্ত সর্বপ্রকার সহায়তা প্রদানের প্রতিশ্রুতি দিয়ে তিনি দেশে ফিরে যান। হযরত খানজাহান আলী (রঃ) মৃত্যুর পরও তিনি এই সর্ত পালন করেছেন।

হযরত শাহ মকতুমের জীবনীতেও দেখা যায় যে ৬৮৭ হিজরীতে দেওরাজগণ কর্তৃক তুকরান শাহ হত্যার প্রতিশোধ নিতে তিনি বাগদাদ থেকে প্রেরিত হন। কিন্তু তাঁর মকছেন ছিল ইসলাম প্রচার করা। যদিও তিনি দেওরাজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছেন কিন্তু রাজ্য লিপ্সা তাঁর ছিল না। মূলতঃ তিনি ছিলেন প্রবন্ধকার লেখেন "নাসির উদ্দিন মাহমুদ শাহের সঙ্গে খানজাহান আলীর একটা নিবিড় সম্পর্ক ছিল। কারণ খানজাহান আলীর (রঃ) মাজারে তাঁর নামের উল্লেখ আছে।" তাই যদি থেকে থাকে তবে এ ইতিহাসের সত্যতা প্রমাণের জন্য অন্য কোন দলিলের প্রয়োজন হবে না।

ইতিহাসে জানা যায় যে মাহমুদ শাহ ছিলেন অত্যন্ত ধর্মপ্রাণ মুসলমান। বরিশালে মসজিদকুড় বা মজিদ বাড়ী নামক স্থানের এক পুরাতন মসজিদের উপর মাহমুদ শাহের পুত্র মুজাফফর বারবক শাহের নাম উল্লেখ আছে। এ সমস্ত নজীর থেকে অতি সহজে অনুমান করা যায় যে দক্ষিণবঙ্গে বাদশা হিসাবে মাহমুদ শাহের প্রতিপত্তি বিদ্যমান ছিল। অবশ্য এ কথার কোন প্রত্যক্ষ প্রমান নেই যে মাহমুদ শাহ পীর হিসাবে খানজাহান আলী (রঃ) কে পছন্দ করেছিলেন এবং তাঁর হাতে বয়াত হয়েছিলেন। কিন্তু একথা নিঃসন্দেহে বলা চলে যে তাঁর প্রতি তাঁর এমন আন্তরিক টান ছিল যে তিনি খানজাহান আলীর (রঃ) মর্জি মাফিক তাঁর প্রত্যেকটি কাজে প্রচুর সহায়তা প্রদান করেছেন। অধিকাংশ লোকই এই মত পোষণ করেন যে খলিফাতাবাদ রাজ্যে নাছির উদ্দিন মাহমুদ শাহ একটি টাকশালও স্থাপন করেছিলেন। কেউ কেউ বলেন এই টাকশালটি তিনি খানজাহান আলীর বৃহৎ কাজের অর্থ প্রয়োজন মিটানোর জন্য খলিফাতাবাদ শহরে স্থাপন করেছিলেন।

www.pathagar.com

এতদঞ্চলে এই টাকশালকে কেন্দ্র করে প্রচলিত অনেক গল্প শোনা যায়। কোন এক কর্মচারী খাবার থালার পিছনে আঠা লাগিয়ে রোজ একটি করে টাকা চুরি করে নিয়ে যেতো। কিন্তু একদিন সে নগর কোতয়ালের হাতে ধরা পড়ে। কঠিন শাস্তি বিধান হলেও মায়ের সততার গুণে ও সমস্ত টাকা ফেরৎ দেওয়ায় সে পরিত্রাণ পায়। এখনও অনেকে মনে করেন এই টাকশালটি গুপ্তস্থানে কোথাও রয়েছে এবং প্রচুর ধনরত্ন আজও সেখানে মজুদ আছে। অনেক লোভী লোক বাবার অনুগ্রহে সেই গুপ্ত ধনের খোঁজ পাবার জন্য ফকির বেশে বছরের পর বছর এখানে পড়ে থাকে। এমনি অনেক ফকির কোন এক দুর্বল মুহূর্তে তাদের মনের এ গোপন ইচ্ছাটি ব্যক্ত করে ফেলেছে। কেউ কেউ মনে করেন দীঘির মাঝখানে যে অট্টালিকার অস্তিত্ব অনুমান করা যায় সেখানে এই গুপ্ত ধনাগারটি আজও রয়েছে।

যাই হোক না কেন এ কথা আমরা সহজে অনুমান করতে পারি যে শেষ জীবনে হযরত খানজাহান আলী একাধারে সুলতান মাহমুদ শাহের গুরু ও রাজপ্রতিনিধি হিসাবে হাবেলী পরগণায় বসে গোটা খলিফাতাবাদ রাজ্যের শাসনকার্য পরিচালনা করেছেন। কিন্তু তাঁর বশ্যতা স্বীকারের মধ্য দিয়ে নয় বরং হৃদ্যতামূলক সন্ধির মধ্য দিয়ে। সম্ভবতঃ তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর প্রতিষ্ঠিত খলিফাতাবাদ নামে এই ইসলামী রাষ্ট্রটি সরাসরি গৌড়ের অধীনে চলে যায় কারণ মোহাম্মদ তাহেরের মৃত্যুর পর এই রাজ্যের পরিচালনার ভার আর কারো হাতেই অর্পিত হয়নি। তবে জানা যায় পরবর্তীকালে মোঃ তাহেরের ভ্রাতা মোঃ মোতাহের খলিফা হন।

হযরত খানজাহান আলী প্রকৃত কোন দেশের লোক ও কোথায় বাড়ী এ নিয়ে অনেক প্রশ্নেরই উদ্ভব হয়েছে। অনেকে বলেন তিনি যদি গৌড়ের বাসিন্দা হয়েও থাকেন তবুও তিনি বহিরাগত লোক তাতে কোন সন্দেহ নেই। তবে তিনি যদি হিজরাত করে এসে থাকেন তবে কোন সময়ে কোথা হতে কে হিজরাত করেছিলেন ? এ নিয়েও প্রচুর মতভেদ রয়েছে। কেউ

www.pathagar.com

বলেন তিনি ইরান দেশের লোক, কেউ বলেন ইরাক, কেউ বলেন তুরস্ক, বাগদাদ বা আরব দেশের লোক। কিন্তু কি কারণে তাঁরা তাঁকে এই এলাকার লোক মনে করেন সে সম্পর্কে কিছুই বলেননি। ঐতিহাসিক ঘটনাবলীও খানজাহান আলীর (রঃ) মাজারে লিখিত কাতাবাগুলির ভাষা ব্যবহারের মধ্য দিয়ে আমার এ বিশ্বাস জন্মেছে যে মূলতঃ তিনি তুর্কি বা তুরস্ক দেশের লোক ছিলেন। তাঁর নির্মিত মসজিদগুলির মডেল ও তুর্কিদের স্থাপত্য শিল্পের অনুরূপ। ইসলামিক ফাউণ্ডেশানের খুলনার আবাসিক পরিচালক জনাব খুরশিদ আলম বলেন যে, হয়তো তিনি খাওয়ারিজিম এলাকার অধিবাসী হবেন। যার বর্তমান নাম খিবা। এমন যদি কোন প্রমাণ পাওয়া যায়তো নিশ্চয়ই এটি একটি সুখবর। তিনি এই এলাকার লোক হলে হতেও পারেন। কারণ এই স্থানটি তুরস্কের পাশাপাশি এবং এই মতকে সমর্থন করার কারণ এই যে ইতিহাসে দেখা যায় তৎকালে এই স্থানে বহু মহা মনিষীর জন্ম হয়েছে। এমনকি পৃথিবীর ইতিহাসের শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিকদের মধ্যে অন্যতম মোহাম্মদ মুছা আলি খারেজমি ও এই স্থানের অধিবাসী ছিলেন। কিন্তু তাঁর পুর্বপুরুষগণ হিজরাত করে বাগদাদের কাতরাবল্লি নামক স্থানে যান। তিনি ছিলেন অঙ্কশাস্ত্র আলজাবরার প্রথম আবিষ্কারক। তাঁর পুস্তক "হিসাব আল মুকাবালা" পৃথিবীতে প্রথম এলজাবরা পুস্তক। পারস্যের ওমর খৈয়াম, পিমানগারির, পিওনাদে, ফ্লোরেন্সের মিষ্টার জাকব প্রখ্যাত বৈজ্ঞানিকগণ তার দ্বারাই প্রভাবান্বিত ছিলেন। তাঁর গ্রন্থ লাতিন ভাষায় অনুদিত হয়। সারা ইউরোপ তাঁর দেওয়া জ্ঞানে পুষ্ট। (The History of Arabs : Hitli)

মুসলিম ইতিহাসে দেখা যায় এই এলাকার মুসলমানগণ অনেকেই শুধুমাত্র সুন্নত পালন করার জন্যই হিজরাত করেছেন। আমাদের আলোচ্য হযরত খানজাহান আলী (রঃ) তাঁর পিতা, পিতামহ এইভাবে হিজরাত করে এসে ক্রমান্বয়ে গৌড় বা জৌনপুরে অবস্থান করতেও পারেন।

www.pathagar.com

ঐতিহাসিক পটভূমিকায় আমার ধারনা ইখতিয়ারউদ্দিন মোহাম্মদ বখতিয়ার খিলজির পাক ভারত আগমনের সময় তাঁর পিতা বা পিতামহ দিল্লী বা তুরস্ক থেকে হিজরাত করে এসে গৌড়েই বসবাস করতেন। তাঁকে তুরস্কের অধিবাসী বলার কারণ এই যে ইতিহাসে দেখা যায় সেই যুগে একমাত্র এই এলাকার খানদানি লোকেরা খান উপাধি ধারণ করতেন। ইতিহাসে এমনি উল্লেখ আছে যে, 'পারশ্য ও তুরস্কের খানদানি লোকদের (Prince, Nobles বা blue blood) অর্থাৎ রাজবংশের লোকদের নামের সঙ্গে মির্জা ও খান উপাধি ধারণ করা হোত। পারশ্য দেশের খানদানি লোকেরা উপাধি ব্যবহার করতেন মির্জা ও তুরস্ক দেশের লোকেরা উপাধি ব্যবহার করতেন খান। যদি দুই দেশের একই নামের দুই লোক কোন একস্থানে অবস্থান করতেন তবে এই উপাধি দেখে তাঁরা কোন দেশের লোক তা বলা সম্ভব হোত।"

এই মর্মে ঐতিহাসিক Stanly lane Pool তাঁর Rulars of India Voll II তে বলেছেন, "Sultan was a common title among Turkish and Pursian princes and nobles and did not the suprim Sovereignty of an Osmanli Sultan Mirza after a name connotes royal blood. In general the full stye such as Sultan Mirza and e, will here be curtailed to the essantial name Mahmud and C or Mahmud Mirza when a distinction is needed terom mahmud Khan.

The Turkish title khan distinguishes these Mongol chiefs from their pusianated relations in tranisoxiana. Thus Mahmud Khan was Babars matarnal uncle of Tashkend; Mahmud Mirza was Babars paternal uncle of Hisar."

বাবরের সম্পর্কে বলতে গিয়ে লেনপুল সাহেব এই মন্তব্য করেছেন যে

www.pathagar.com

সুলতান ছিল তুরস্ক ও পারস্যদের সাধারণ উপাধি। উচ্চ বংশীয় লোকেরাই সুলতান ও মির্জ্জা উপাধিতে ভূষিত হতেন। কিন্তু তুরস্কের উচ্চবংশীয় লোকেরা খান উপাধিতে ভূষিত হতেন। মামুদ খান ও মাহমুদ মির্জ্জা কোন দেশের লোক তা এই উপাধি দেখেই বোঝা যেত। তদানীন্তনকালে তুরস্ক থেকেই এই খান উপাধির সূত্রপাত হয়। তাই দেখা যায় বাবরের মামা মাহমুদ খান ছিলেন তুরস্কের তাসখন্দ এর লোক ও চাচা মাহমুদ মির্জ্জা ছিলেন পারস্যের হিসার এক লোক। লেনপল সাহেব বলেন যে তিনি এ তথ্য পেয়েছেন, বৃটিশ মিউজিয়ামে রক্ষিত বাবরের চাচাতো ভাই মির্জ্জা হায়দারের লেখা তারকিশ-ই-রাশিদী ও তাবাকাতই বাবরিতে।

ইতিহাসে দেখা যায় যে ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষের দিকে তুর্কিরা খুব শক্তিশালী জাতিতে পরিণত হয়। শৌর্য্য বিক্রম গরিমায় তাঁরা এই সময় চরম শিখরে আরোহণ করে। ১৪০৫ খৃষ্টাব্দে বারলাস তুর্ক নামক একজন শক্তিশালী ব্যক্তির নেতৃত্বে তুর্কীরা সমস্ত এশিয়াতে ছড়িয়ে পড়ে। বাবরের পূর্ব্বের ইতিহাস আলোচনা করতে গিয়ে লেনপুল সাহেব তাঁর উক্ত গ্রন্থে তুর্কিদের সম্পর্কে এই কথা বলেছেন যে,

'A hundred years has passed since the 'Barlas Turk" is a serius of triumph nt compaigns had made himself master of the western half of Asia, from kashghar on the edge of terrible mid Asian desert to the cliffs of the Aegian sea. He driken the kinghts of Rhodes out of their castle at Smyrna and had even marched into the India and sacked Delhi. In 1405 he was en his way to Subdue China and set all the continent of Asia bereath his feet, when death intervened."

একশত বৎসর ধরে তুরস্কের বীর বারলাস তুর্কির সমস্ত এশিয়াতে বিজয়

www.pathagar.com

ঘোষিত হয়েছিল। তিনি অর্ধ এশিয়ার অধিপতি হয়েছিলেন। শুধু দিল্লীই তাঁর পদানত হয় নাই তিনি চীন বিজয়েও বহির্গত হয়েছিলেন কিন্তু এই সময় তাঁর মৃত্যু হয়। তুর্কীরা বহু পুর্ব্ব থেকেই পৃথিবীর বিভিন্ন দিকে ছড়িয়ে পড়েছিল। এই ভারতবর্ষেও তুর্কিদের কৃষ্টি ও সভ্যতা বিস্তারলাভ করেছিল। ভারতীয় মুসলমানগণ এক সময় তুর্কি টুপি বেশ আভিজাত্যবোধের সঙ্গে পরিধান করতেন। কোন দেশে কোন জাতির অবস্থান না ঘটলে তাদের সভ্যতা সেই দেশে বিস্তারলাভ করে না। এই সমস্ত কারণেও হযরত খানজাহান আলী (রঃ) কে তুর্কি দেশের লোক মনে করার কারণ রয়েছে।

ইতিহাসে আরও দেখা যায় যে চীনা পর্যটক ফাহিয়েন ১৪০৫ খৃষ্টাব্দে নৌপথে সুমাত্রা থেকে চট্টগ্রাম এসেছিলেন। কিন্তু তাঁর ভ্রমণবৃত্তান্তের মধ্যে খলিফাতেআবাদ রাজ্যের কোন উল্লেখ নেই। তিনি সোনার গাঁ গৌড় প্রভৃতি অঞ্চলও পরিভ্রমণ করেছিলেন। কাজেই এটা স্পষ্ট বোঝা যায় যে এই খলিফাতেআবাদ রাজ্য ১৪০৫ খৃষ্টাব্দেও স্থাপিত হয় নাই। কাজেই এইরূপ ধারনা করা চলে হয়তো ১৪০৭ খৃষ্টাব্দে বারবাক তুর্ক এর দেশ বিজয়ের সময়ে অথবা ১৪০৬/১৪০৭ খৃষ্টাব্দে ইখতিয়ার উদ্দিন মোঃ বখতিয়ার খিলজির সময়ে বাল্য অবস্থায় তাঁর পিতার সঙ্গে অথবা তাঁর পিতা মাতা তুরস্ক থেকে হিজরাত করে এদেশে এসে বিশেষত গৌড়ে এসে বসতি স্থাপন করেন। হয়তো প্রথমে তারা দিল্লীতে আসেন ও পরে যে কোন রাজনৈতিক কারণে গৌড়ে বসবাস করতে থাকেন। তাঁর মাজারের উপরে লিখিত তাঁর নামের সঙ্গে জড়িত যে উলুঘ শব্দটি রয়েছে, এটি তুর্কি শব্দ, যার অর্থ খুব সম্মানিত বা 'শীর্ষস্থানীয়'। উপরোক্ত কারণগুলির জন্যই অনেকের সঙ্গে আমিও এই মত পোষণ করি যে তিনি তুরস্কের অধিবাসী ছিলেন। বাল্য অবস্থায় তাঁর পিতা মাতার সঙ্গে হিজরাত করে তাঁরা প্রথমতঃ দিল্লী আসেন এবং যেকোন রাজনৈতিক কারণে পরবর্তীকালে গৌড়ে এসে স্থায়ী বসবাস আরম্ভ করেন।

www.pathagar.com

হযরত পীর খানজাহান আলী (রঃ) সম্পর্কে এক আলোচনায় মাগুরা মহকুমার শ্রীপুর থানার নাকোল গ্রামের জনাব আব্দুছ ছাত্তার সাহেব এক মনোজ্ঞ আলোচনায় আমার মত স্বীকার করে বলেন, যে হযরত খানজাহান আলী (রঃ) ইসলাম প্রচারের জন্য এদেশে এসেছিলেন গৌড় থেকে। গৌড়ের আশে পাশেই তাঁর বাড়ী ছিল। মূলতঃ তারা তুরস্কের অধিবাসী। বাল্য অবস্থায় তিনি মাদ্রাসায় লেখাপড়া করেছেন। নুর-ই-কুতুব উল আলমের নিকট তিনি অধ্যায়ন করেন ও পরে তার নিকট মুরিদ হন। তিনি স্বীকার করেন যে তিনি ইব্রাহিম শর্কির নফর ছিলেন। কিন্তু যে কোন কারণে হোক তিনি চাকুরী ত্যাগ করে পীর কেবলার নির্দেশে ইসলাম প্রচারে বহির্গত হন। ঐ সময় এক বৃহত্তর কাফেলা তাঁর সঙ্গলাভ করেন। তিনি প্রথমতঃ কোন রাজার প্রতিনিধি হয়ে কোন বিদ্রোহী অঞ্চল শাসন করার জন্য এদেশে আগমন করেন নাই, এসেছিলেন হিন্দুদের অত্যাচারে পর্যুদস্ত ইসলামকে রক্ষা করতে। যদিও ইসলাম প্রচার ও ইসলাম প্রতিষ্ঠা ছিল তাঁর মোকছেদ কিন্তু পরবর্তীকালে যেকোন পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে গৌড়রাজের প্রতিনিধিত্ব গ্রহণ করতে তিনি বাধ্য হন। তিনি বলেন ইসলামের এমনই মহত্ত্ব যে কারো জীবনে এর আদর্শ প্রতিফলিত হলে তাঁর সৌন্দর্য্যে বিমোহিত হয়ে মানুষ তাঁর অজ্ঞাতে দীন-ই-ইলাহি মেনে নিতে বাধ্য হয় ও ইসলাম শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়ে পড়ে। এতে কোন জবরদস্তির প্রয়োজন হয় না এবং স্বাভাবিক নিয়মেই ইমাম বা প্রধান ব্যক্তির উপর হুকমত কায়েমের জন্য শাসনভারের দায়িত্ব এসে পড়ে এবং পৃথিবী অর্থ সম্পদ তাঁর পদানত হ'য়ে পড়ে এবং অনেকে তিনি হক পথে খরচ করেন। হযরত খানজাহান আলী (রঃ ছিলেন এমনি একজন ব্যক্তি। তিনি তাওয়ারিখে কাশ্মির গ্রন্থের কথা উল্লেখ করে বলেন যে রাজা রেইন চেইন এর আমলে কাশ্মিরে ইসলাম প্রচারে বহিঃর্গত হন সদরুদ্দিন সৈয়দ আব্দুর রহমান ওরফে বুলবুল শাহ। হযরত খানজাহান আলী (রঃ) তাঁরই সমসাময়িক এবং কেন্দ্র থেকে দুজনে দুদিকে বহির্গত হন।

www.pathagar.com

তিনি প্রসঙ্গক্রমে আল্লামা শিবলি নোমানি, সৈয়দ সোলায়মান নাতভি ও সৈয়দ হাসান মাদানির লিখিত ইতিহাসের উল্লেখ করেন। আত্ম প্রকাশিত মতের মধ্যে বাংলাদেশের প্রখ্যাত ঐতিহাসিক অধ্যাপক কে, আলীর মতামত সমধিক প্রনিধানযোগ্য। কে আলী তাঁর বাংলাদেশ ও পাক ভারতের মুসলমানদের ইতিহাস গ্রন্থে বলেন, জালালুদ্দিন মাহমুদ শাহের পুত্র শামস উদ্দিন আহমদের মৃত্যুতে আমিরগণ ইলিয়াস শাহের পৌত্র নাসির উদ্দিনকে 'নাসির উদ্দিন আবুল মোজাফফর মাহমুদ শাহ উপাধি দিয়া সিংহাসনে অধিষ্ঠিত করেন। তিনি দেশে শান্তি ও শৃংখলা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করেন। তাহার শাসনকালে মুসলিম শাসন বহুদূর পর্যন্ত বিস্তারলাভ করে খুলনা জেলার বাগেরহাট মহকুমার খানজাহান আলীর সমাধিগাত্রে খোদিত লিপি হইতে জানা যায় যে, এই সময় খুলনা ও যশোহর জিলার কিয়দাংশও বিজিত হইয়াছিল। এই বিজয়ের গৌরব খানজাহান আলীরই প্রাপ্য। খানজাহান আলীকে সাহায্য করেন তাহার বহু সহচরবৃন্দ। তিনি তাহাদের সহযোগিতায় এদেশের ভাটি অঞ্চল আবাদ করেন। খানজাহান আলী পীরের কাহিনী বঙ্গ ভারতে সুবিদিত। খানজাহান আলী একজন বিজেতা ধার্মিক ও সদাশয় লোক ছিলেন। তিনি যে সমস্ত জনহিতকর কাজ করিয়া গিয়াছেন তাহার মধ্যে মসজিদ নির্মান দীঘি পুকুর খনন ও রাস্তা নির্মাণ উল্লেখযোগ্য।

উপরোক্ত সকল আলোচনার মাধ্যমে হযরত পীর খানজাহান আলী (রঃ) যে ইতিহাস পাওয়া যায় তার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ অনুমান সহযোগে সংক্ষিপ্ত ইতিহাস এইরূপ দাঁড়ায় যে, "হযরত পীর খানজাহান আলী (রঃ) এবং তাঁর পরিবারবর্গ মূলতঃ তুরস্কের অধিবাসী ছিলেন। ইখতিয়ারউদ্দিন মোহম্মদ বখতিয়ার খিলজীর গৌড় অভিযানের সময় তিনি পিতা মাতার সহিত বাল্য অবস্থায় বাংলায় আগমন করেন অথবা গৌড়ে জন্মগ্রহন করেন অনেকের সঙ্গে আমিও একমত যে হালাকুখানের বাগদাদ ধ্বংসের সময় তিনি পিতা মাতার

www.pathagar.com

সহিত পালিয়ে এসে প্রথমতঃ দিল্লীতে বসবাস করতে থাকেন ও পরে গৌড়ে আগমন করেন। তিনি বড়পীর সাহেবের বংশধর ছিলেন। গৌড়ের নিকটবর্তী নবীপুর নামক স্থানে তাঁর বাড়ী ছিল। তাঁর পিতা ইতিহাসের এমন কোন উল্লেখযোগ্য ব্যক্তি ছিলেন না। কিন্তু তিনি বিদ্বান ব্যক্তি ছিলেন। তিনি রাজপরিবারের গৃহশিক্ষকের কাজে নিয়োজিত ছিলেন। তাঁর বাল্যনাম ছিল শের খান বা কেশর খা, কেশর খান। তাঁর নাম করিদ খান নয়। পিতা ও মাতার নাম কি ছিল সে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যদিও কষ্টসাধ্য। তবুও পিতার নামই সম্ভবতঃ আজর খান অথবা ফরিদ খান। শিক্ষালাভের জন্য তাঁর পিতা তাকে হযরত নুর-ই-কুতুব-উল আলমের মাদ্রাসায় পাঠান এবং এইখানে অধ্যয়নরত অবস্থায় বাল্যবয়সে তাঁর পিতৃ বিয়োগ ঘটে। বিধবা মাতা আগিনা বিবি বহু কষ্টে পরের বাড়ীতে ধান বেনে তাঁকে লালন পালন করতে থাকেন। এই সময় গৌড়ের রাজা পরিবর্তনের কারণে তাদের রাজদরবারের বরাদ্দ ভাতা বন্ধ হয়ে যায়।

পুঁথি এবং এদেশে প্রচলিত কেতাবের মধ্যে যে গল্পটি জানা যায় যদিও তার একটি কেতাবও আজও আমার হস্তগত হয়নি তবুও ঐ কাহিনী সত্য বলেই প্রতীয়মান হয়। মাওলানা খেলাফত হোসেন (নিরন চাচাজী) বলেন, এই কাহিনী সম্পূর্ণ সত্য। তিনি কাহিনীটি এইরূপ বর্ণনা করেন যে, হযরত পীর খানজাহান আলী (রঃ) এর বাল্যনাম ছিল কেশর খান, তাঁর মাতা ছিলেন আগিনা বিবি পিতা ছিলেন ফরিদ খান। অতি বাল্যকালে মাদ্রাসায় যাতায়াত শুরু করার সঙ্গে সঙ্গেই অল্পদিনের মধ্যে তাঁর পিতৃবিয়োগ হয় তিনি এতিম হয়ে যান। আগিনা বিবি বড় নিরুপায় হয়ে পড়েন। কারণ ফরিদ খান ঘরে কোন সম্পদ রেখে যাননি তিনি পরের বাড়ীতে ধান বেনে ছেলেকে মাদ্রাসায় পড়াতে থাকেন। এই সময় বালক কেশর খান একদিন ছুরি দিয়ে আপন মনে পথের এক অংশ কেটে কেটে গর্ত তৈরী করছিলেন। ঠিক ঐ সময় বাদশাহ হোসেন শাহ ঐ পথ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি বালকটিকে বললেন

www.pathagar.com

তুমি পথের উপর গর্ত করছ কেন? লোকে পড়ে মারা যাবে যে। বাদশার এই কথায় কেশর খান উত্তর দিলেন "পথ রেখে যে বিপথে হাটে তার মৃত্যু অনিবার্য্য।"

হোসেন শাহের একটি পুত্র ছিল। তার নাম ছিল শাহানশাহ। শাহানশার বোকামি ও গোয়ার ধরণের ব্যবহার বাদশার মনের বিশেষ ব্যথার কারণ ছিল। তিনি ছেলেটির এইরূপ গুরুত্বপূর্ণ কথায় মুগ্ধ হয়ে যান ও তাকে সঙ্গে করে তার মায়ের নিকট গমন করেন। ছেলেটিকে তাঁর সঙ্গে আনবার জন্য তিনি তার মাকে অনেক বুঝান। কিন্তু তাঁর মা রাজী হন না। শেষে রাজ্যের অর্ধেক দান করার প্রতিশ্রুতি দিয়ে কেশর খানকে ঘরে নিয়ে আসেন। শাহান শাহ ও কেশর খান একত্রে লালিত পালিত হতে থাকেন। কিন্তু মাদ্রাসায় যাবার ফাকে ফাকে শাহান শাহ অন্য ছেলেদের সঙ্গে জুয়া খেলতো। কেশর খান যেদিন তার সঙ্গে খেলতেন সেদিন তিনি খেলায় জিতে যেতেন ও যেদিন সে একা খেলতো সেদিন সে হেরে যেতো।

হোসেন শাহের একজন মন্ত্রী ছিলেন, তাঁর নাম ছিল হেদায়ে আলম। তিনি শিশু কেশর খানের বুদ্ধি দেখে বেশ চিন্তিত হয়ে পড়েন এবং বাদশাকে এইরূপ পরামর্শ দেন যে আপনিতো "খাল কেটে কুমীর এনেছেন।" এই রাজ্যের মালিকতো একদিন কেশর খানই হবে। সেই হবে বাদশা। আপনার ছেলে তার সঙ্গে বুদ্ধিতে পেরে উঠবে না। তখন মন্ত্রীর বুদ্ধিমত তিনি কেশর খানকে হত্যা করার মানসে জল্লাদের নিকট একটি পত্র লেখেন। তাতে লেখা থাকে যে, পত্রবাহক তোমার হস্তে পত্র দেওয়ার পরই তাকে হত্যা করিবে। না করিলে তোমার প্রাণদণ্ড হইবে। এই পত্রখানি তিনি কেশর খানের হাতে দিয়ে তাকে হুকুম করেন যে অন্য কারো হাতে এটি দেবে না, এটা খুব জরুরী চিঠি। তুমি নিজে গিয়ে জল্লাদের হাতে দিয়ে আসবে। চিঠি নিয়ে কেশর খান রওনা হলেন। পথিমধ্যে তার শাহানশার সঙ্গে দেখা হোল। সে অন্য ছেলেদের সঙ্গে জুয়া খেলছিল ও বার বার পরাজিত হচ্ছিল। কেশর খানকে

www.pathagar.com

দেখে সে তাকে ধরে ফেললো। বললো ভাই তুমি এদের সঙ্গে খেলে এদের একটু হারিয়ে দাও। এরা আমাকে বহুবার পরাজিত করেছে। কেশর খান অস্বীকার করে বললেন বাদশার হুকুম আমাকে এই চিঠিটা জল্লাদের হাতে দিতে হবে। আমি পারবো না। যেহেতু শাহানশা কেশর খানের অনেক বড় ছিল সেইহেতু তাকে জোর করে খেলতে বসিয়ে দিয়ে চিঠিটি সে নিজে নিয়ে জল্লাদের হাতে দিতে চলে গেল। বেশ কিছু সময় পরেও শাহানশা যখন ফিরে আসেনা তখন কেশর খান ব্যস্ত হয়ে গিয়ে বাদশাকে জিজ্ঞাসা করলেন বাবা, ভেয়া ভাই কোথায়? তিনি জিজ্ঞাসাবাদ করে যখন সব জানতে পারলেন তখন তিনি নিজের মাথার চুল নিজেই ছিড়তে লাগলেন। কেশর খান বললেন যে আমিতো আপনাকে একদিন বলেছিলাম "যে পথ রেখে বিপথে হাটে তার মৃত্যু অনিবার্য। নীরন চাচাও বলেন এটা সত্য কাহিনী। এইভাবে তিনি রাজগৃহে প্রতিপালিত হয়েছিলেন। হোসেন শাহের মৃত্যুর পরও মন্ত্রী হেদায়ে আলম তাঁর বিরোধিতা করতে থাকেন। ফলে রাজ্য গ্রহণের চেষ্টা না করে তিনি নুরই কুতুব উল আলমের আস্তানায় থেকেই পড়াশুনা করতে থাকেন। কিন্তু হোসেন শাহ মৃত্যুর পূর্বে কেশর খানের জন্য একটি সনদ রেখে গিয়েছিলেন। সেই সনদেই কেশর খানের নাম ও তাঁর সম্পর্ক পালিত পুত্র বলে উল্লেখ আছে।

বেশ কিছুকাল পরের কথা যে কোন কারণেই হোক এক সময় কেশরখান তাদের কাজ ভাতা বন্ধ ও বিভিন্ন অসুবিধার কথা ওস্তাদের নিকট ব্যক্ত করেন। ওস্তাদ নুরই কুতুব উল আলম তার কষ্ট বুঝতে পেরে গৌড়ের সুলতানদের পতনউন্মুখ অবস্থার কারনে চাকরীর জন্য তাকে জৌনপুরের প্রতাপশালী সুলতান ইব্রাহিম শর্কির নিকট একটি পত্রসহ প্রেরণ করেন। এই পত্রে তিনি কেশর খানের নম্র ভদ্র ব্যবহার ও প্রতিভার কথাও উল্লেখ করেন। সুলতান ইব্রাহিম শর্কির নিকট হযরত নুর-কুতুব-উল আলমের একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা ছিল। তাঁর প্রতিটি কথাই সুলতান বিশ্বাস করতেন ও

www.pathagar.com

গুরুত্বসহকারে মেনে নিতেন। এই পাওয়ার পর সুলতান বিনা বাক্যব্যয়ে তাকে একজন সাধারণ সৈনিকের পদে নিয়োজিত করেন। কিছুকালের মধ্যেই তাঁর প্রতিভার বিকাশ ঘটে ও নিজ প্রতিভার গুণেই তিনি পদন্নোতিলাভ করেন ও ক্রমে ক্রমে তিনি তাঁর প্রধান সেনাপতির পদে নিয়োজিত হন।

কেশর খান যখন জৌনপুরের পরাক্রমশালী সুলতান ইব্রাহিম শর্কির প্রধান সেনাপতি, তখন গৌড়ের সুলতানের আসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন সাইফুদ্দিন হামজা শাহ। তিনি ছিলেন অত্যন্ত দুর্ব্বলচেতা। তাঁর এই দুর্বলতার সুযোগ গ্রহণ করে সেন বংশের সর্বশেষ উত্তরাধিকারী জমিদার, রাজা গণেশ গৌড়ের সুলতানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হন ও স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। অল্প দিনের মধ্যেই তিনি রাজপ্রতিনিধি হত্যা করে ক্ষমতা দখল করেন ও শক্তির দম্ভে উন্মাদ হয়ে ওঠেন এবং মুসলমান নিধন ও ইসলাম ধর্ম উচ্ছেদের জন্য তাঁর সকল শক্তি নিয়োজিত করেন। যখন তিনি অত্যাচারের চরম শিখরে আরোহন করেন মুসলমান পল্লীতে সংযোগ করতে আরম্ভ করেন ও মুসলমান পর্দানশিন রমনীদের বাড়ীতে আগুন ধরিয়ে পর্দার পরীক্ষা নিতে আরম্ভ করেন; তখন হযরত-নুর-ই কুতুব উল আলম অধৈর্য্য হয়ে পড়েন ও রাজা গণেশের ক্রিয়াকলাপের কথা উল্লেখ করে তাকে দমন করে ইসলাম রক্ষা করার জন্য জৌনপুরের পরাক্রমশালী সুলতান ইব্রাহিম শর্কির নিকট এক পত্র লেখেন।

এই পত্র পেয়ে জৌনপুরের সুলতান ইব্রাহিম শর্কি ভীষণ উত্তেজিত হয়ে ওঠেন ও তাঁর সেনাপতি কেশর খানের নেতৃত্বে বিপুল সৈন্যসহ রাজা গণেশকে আক্রমণ করেন ও পরাজিত করেন। রাজা গণেশ তখন তাঁর বশ্যতা স্বীকার করে সন্ধি ভিক্ষা করে। সন্ধির সর্ত্ত অনুযায়ী নিজ পুত্র যদু সেনকে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করে নিজের প্রাণ ভিক্ষা করে। তখন বাদশা নিরুত্তর থেকে তাকে নুর-ই কুতুব উল আলমের নিকট প্রাণ ভিক্ষা চাইতে নির্দেশ দেন। এই কুতুবও যখন নিরুত্তর ও চিন্তান্বিত তখন বীর ধর্মে অনুপ্রাণিত হয়ে

www.pathagar.com

কেশর খান তাঁকে শেষ সুযোগ দানের মানসে রাজা গণেশের প্রতি ক্ষমা প্রদর্শনের অনুরোধ জানান। তাঁর অনুরোধে রাজা গণেশকে সেবারের মত ক্ষমা করা হয় ও কেশর খানকে তাঁর এই উদার মনোভাবের জন্য খান-ই-জাহান উপাধিতে ভূষিত করা হয়। তৎকালীন সময়ে তাঁর সমকক্ষ খান-ই-জাহান আর কেউই ছিলেন না। ফলে তাঁর প্রকৃত নামটি খানজাহান নামের আড়ালে চিরদিনের জন্য ঢাকা পড়ে গেছে।

যুদ্ধ বিগ্রহ শেষে সমস্ত রাজকার্য্য সমাধা হবার পর খানইজাহান উপাধিতে ভূষিত হয়ে তিনি সুলতানের নিকট গৌড়ে অবস্থানরত তাঁর মাতার সাক্ষাৎ করার অনুমতি প্রার্থনা করেন। যেহেতু তৎকালীন রীতি অনুযায়ী যুদ্ধের পূর্বে কোন মুসলমান সৈনিকের তার আত্মীয়-স্বজন ও এমনকি স্ত্রী পুত্রের সাথেও দেখা করা নীতিবিরুদ্ধ ছিল। সেইহেতু কেশর খান ইতিপূর্বে তাঁর মাতার সাথে দেখা করেননি। তাই যুদ্ধের পর সুলতানের অনুমতি নিয়ে তিনি তাঁর নিজ বাড়ী নবিপুর তাঁর মাতার সাথে সাক্ষাৎ করতে যান। কিন্তু দুঃখের বিষয় তাঁর মাতার সাক্ষাৎ তিনি পান না। বাড়ীতে গিয়ে দেখেন তাঁর বাড়ী ভস্মীভূত। জানতে পারেন তাঁর মাতা রাজা গণেশের অগ্নিসংযোগের শিকার হয়েছেন। বেপর্দার ভয়ে তিনি ঘরের বাইরে যাননি। গৃহবন্দী অবস্থায় অগ্নিদগ্ধ হয়ে তিনি তাঁর জীবন বিসর্জন দিয়েছেন। এই সংবাদ তাঁর অন্তরে প্রচণ্ড আঘাত হানে ও সীমাহীন বেদনায় মুহ্যমান হয়ে কান্নারত অবস্থায় তাঁর ওস্তাদ ও পীর হযরত নুর-ই-কুতুব উল আলমের নিকট ছুটে যান। ইসলামের বিধান মতে সন্ধি সম্পাদনের পর রাজা গণেশকে তিনি কিছুই বলতে পারেন না। তখন নুরই কুতুব উল আলম তাঁকে সান্ত্বনা দিতে থাকেন। এই সময় তিনি কিছুদিন তাঁর পীরের নিকট থাকার জন্য সুলতানের নিকট প্রার্থনা জানান। এই সংবাদে সুলতানও যারপরনাই দুঃখিত হন এবং তাঁর প্রার্থনা মঞ্জুর করেন।

এই সময় দুনিয়ার ধন দৌলত পদমর্য্যাদা, লোভ লালসা এমনকি

www.pathagar.com

জীবনের প্রতিও তার বীতশ্রদ্ধা জন্মে। একদিকে যুদ্ধ বিজয় ও অন্যদিকে তার মায়ের মৃত্যু তাকে চিন্তার সাগরে টেনে নিয়ে যায়। যদি সে জানতে পারতো তাঁর মায়ের এরূপ মৃত্যু ঘটেছে তবে সে রাজা গণেশকে কিছুতেই ক্ষমা করতো অনুরোধ করতো না। এই সংবাদটুকু যে জানতে পারে নাই বীরত্ব তাঁর কাছে কিছুই না। কোন্ শক্তি বলে এই সংবাদ জ্ঞাত হওয়া যায় এই চিন্তাই তাকে ক্রমান্বয়ে অধ্যাত্ম জগতের দিকে টেনে নিয়ে যায়। হযরত নুর-ই-কুতুব উল আলম তখন তাকে একান্ত আপন করে নেন ও খাস শিষ্য হিসাবে গ্রহণ করে মারেফতি বিদ্যালয় পারদর্শী করে তোলেন। পরবর্তীকালে সুলতান ইব্রাহিম শর্কি বার বার তাগিদ দেওয়া সত্ত্বেও তিনি আর জৌনপুরে ফিরে যান না। জানা যায় তখন ইকবাল খান নামক এক ব্যক্তি জৌনপুর সুলতানের প্রধান সেনাপতির পদে বহাল হন। তিনিও পরে খানজাহান উপাধিতে ভূষিত হয়েছিলেন। (তাওয়ারিখে ফেরেশতা)

হযরত খানজাহান আলী (রঃ) র মায়ের সম্পর্কে আমাদের দেশে একটি গল্প প্রচলিত রয়েছে। এই গল্পটি জীবনে প্রথম আমি মৃত আলহাজ্জ ফকির শদর আলি সাহেবের কাছ থেকে শ্রবণ করেছিলাম। গল্পটি এইরূপ যে, "কোন একদিন হযরত খানজাহান আলী বাল্যকালে পথে খেলা করছিলেন। তখন ঐ দেশের রাজা পথ দিয়ে যাবার সময় এই ছেলেটির সুন্দর চেহারা দেখে তার প্রতি আকৃষ্ট হন ও তার নিকট তার নাম ঠিকানা জিজ্ঞাসা করেন। তখন রাজা তাকে তার মায়ের কাছে নিয়ে যেতে বললেন এবং সেখানে গিয়ে রাজা তার মাকে সম্মুখে কথা বলতে হুকুম করলেন। কিন্তু তাঁর মা পর্দার আড়াল থেকে বলে পাঠাল যে কোন মুসলমান রমনী বেপর্দা হয়ে কোন বেগানা পুরুষের সঙ্গে কথা বলে না। তাই সে যেই হোক না কেন। তার এই উত্তরে রাজা অপমান বোধ করেন ও রাগন্বিত হন। কিছুদিন পরে ঐ রাজা তার গৃহে অগ্নিসংযোগ করেন কিন্তু তবুও তিনি ঘরের বাহির হন না এবং অগ্নিদগ্ধ হয়ে প্রাণ বিসর্জন দেন।

www.pathagar.com

এইরূপে বাল্যকালে তাঁর প্রথমে পিতৃ ও পরে মাতৃবিয়োগ ঘটে।" প্রচলিত গল্পের সময়কালের মিল অমিল যাই থাকুক না কেন ইতিহাসের কিছু গন্ধ যে এর মধ্যে রয়েছে তাতে সন্দেহের অবকাশ নেই।

হযরত খানজাহান আলী (রঃ) মনের এমনি এক অবস্থা নিয়ে যখন তাঁর পীর কেবলার নিকট অবস্থান করছিলেন তখন নিজের অনিচ্ছা সত্ত্বেও পীরের হুকুম মোতাবেক, নবীর আদর্শ ও সুন্নত পালনের জন্য তিনি বিবাহ কার্য সম্পন্ন করেন। কোন এক বোজর্গ বলেন যে হযরত নুর-ই-কুতুব উল আলমের একমাত্র কন্যার সঙ্গেই তাঁর বিবাহ হয়।

নুর-ই-কুতুব উল আলমের কাছ থেকেই তিনি কামলিয়াতি ও বেলায়েতি হাসিল করেন। মাতার মৃত্যুর পরও ইব্রাহিম শর্কির চাকুরী ত্যাগ করার পর দীর্ঘদিন তিনি তাঁর পীর নুর-ই-কুতুব-উল আলমের সাহচর্যে থাকেন ও তাঁর কাছ থেকেই তিনি কামলিয়াতি হাসিল করেন। একদিন ২৭শে রমজানে এক শবে কদরের রাত্রিতে হযরত কুতুব-উল আলম তাঁকে বলেন যে শোন বাবা আমি সংবাদ পেয়েছি আজ রাত্রিতে দুনিয়ার সমস্ত বৃক্ষলতাদি আল্লাকে ছেজদা করবে। আমি একটু ঘুম যাই বাবা। তুমি এই নদীর দিকে চেয়ে বসে থাকো। যখন দেখবে যে নদীর ভিতরে বৃক্ষরাজির ছায়া উলটা হয়ে গিয়েছে তখন তুমি আমাকে ডেকে দিও। পীরের হুকুম মোতাবেক খানজাহান রাত জেগে নদীর দিকে চেয়ে বসে থাকলেন। একসময় তিনি দেখলেন যে নদীর মধ্যে গাছের ছায়া উলটা হয়ে গিয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে জমিনের দিকে চেয়ে দেখলেন সমস্ত বৃক্ষরাজী ছেজদায় পড়ে গিয়েছে। তখন তিনি পীর সাহেবকে ডাকার কথা ভুলে গিয়ে সঙ্গে সঙ্গে নিজেও ছেজদায় পড়ে গেলেন এবং ফজরের আজান পর্যন্ত ছেজদায় পড়ে থাকেন। পীরসাহেব ঘুম থেকে জেগে তাঁকে এই অবস্থায় দেখে জিজ্ঞাসা করলেন আমাকে ডেকে দাওনি কেন বাবা? তখন তিনি উত্তর করলেন যে হুজুর দুনিয়ার এই অবস্থা দেখে আমার কিছুই স্মরণ ছিল না। তখন তিনি তাঁর প্রতি অত্যন্ত খুশি হয়ে বললেন এক

www.pathagar.com

নিজ কন্যার সঙ্গে তাঁর বিবাহ দেন। তারপর কিছুকাল দাম্পত্য জীবন অতিবাহিত হওয়ার পরই ইসলাম প্রচারের দাওয়াত আসে তখন তিনি নিজ পীর ও শ্বশুরের খেদমতের জন্য তাঁর বিবিকে রেখে ইসলাম প্রচারে বেরিয়ে পড়েন। তাঁর প্রথম স্ত্রীর মাজার গৌড়েই রয়েছে। রাজা গণেশের জন্যই তাঁকে চিরজীবনের জন্য ইসলাম প্রচারে বেরিয়ে পড়তে হয়। আসবার সময় খানজাহান তাঁর পীর কেবলাহকে জিজ্ঞাসা করেন যে হুজুর আমার এই যাত্রার শেষ কোথায় হবে? তখন তাঁর পীর কেবলাহ তাঁকে একপাত্র পানি দিয়ে বলেন যে দীঘি খনন করে যেখানে তোমার এইরূপ পানির সন্ধান মিলবে। তুমি মনে করবে সেইটিই তোমার এই যাত্রার শেষ মনজিল। সেই পানিপাত্র সঙ্গে করে তিনি ইসলাম প্রচারে বহির্গত হন। পীরের এইরূপ নির্দেশের কারণেই তিনি তাঁর যাত্রাপথে এবং শেষ অবস্থানের এলাকায় এত দীঘি খনন করেছেন। এইরূপে যখন তিনি তাঁর শেষ মনজিল নির্বাচন করেন তখন তিনি জনগণের কল্যাণের জন্য পানীয় জলের অভাব দূরীকরণের জন্য এই এলাকার মোট ৩৬০টি দীঘি খনন করেন ও ইসলামের খাতিরে ৩৬০টি মসজিদ নির্মান করেন।

এই সময় রাজা গণেশ দিনাজপুরে অবস্থান করেই রাজকার্য্য পরিচালনা করতেন। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই তিনি আবার পূর্ব মূর্তি ধারন করেন এবং আরও কঠিনতম অত্যাচারী রাজা হিসাবে আবির্ভূত হন ও নুর-ই-কুতুব-উল আলমের আত্মীয়-স্বজন ও শিষ্যবর্গদের প্রাণ সংহার এবং ধন-সম্পত্তি লুঠতরাজ শুরু করেন।

ইতিহাস স্পষ্ট সাক্ষ্য দেয় যে এই সময় রাজা গণেশকে চিরতরে দমন করার জন্য ও ইসলামকে স্থায়ী করার উদ্দেশ্যে হযরত নুর-কুতুব-উল-আলম সুলতান ইব্রাহিম শর্কির নিকট আবার এক জরুরী পত্র প্রেরণ করেন। পত্রের নির্দেশ মোতাবেক কোন এক বিশেষ স্থানে তাঁদের মোলাকাত হয় এবং এই মোলাকাতের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সুলতান ইব্রাহিম শর্কি নুর-কুতুব-উল

www.pathagar.com

আলমের খেদমতে ৬০ হাজার সৈন্য প্রেরণ করেন।" হযরত নূর কুতুব-উল আলমের নির্দেশে এই ৬০ হাজার সৈন্য পরিচালনার ভার গ্রহণ করেন নিঃসন্দেহে আমাদের হযরত পীর খানজাহান আলী (রঃ)। এই সৈন্য পরিচালনার ভার কে গ্রহণ করেছেন ইতিহাসে তার উল্লেখ নেই, যেমন উল্লেখ নেই তার নামের ও বালা নামের। তার পীর কেবলার আদেশে এই বিপুল সৈন্য ও আরও এগারো জন আউলিয়া সৈনাধ্যক্ষ সহ নূতন মন্ত্রে তিনি প্রতিজ্ঞা-বদ্ধ হন ও সুলতানের অনুমতি নিয়ে রাজা গণেশের রাজ্য মধ্যে তিনি দৃঢ়তার সহিত ইসলাম প্রচারে বহির্গত হন। তারপর তিনি ইসলামের বিজয় কেতন উড়িয়ে ইসলাম প্রচার করতে করতে গৌড় ও বারেন্দ্রভূমি পার হয়ে অবশেষে যশোরের বারোবাজার নামক স্থানে এসে উপস্থিত হন। সমতটভূম ও সুন্দরবন অঞ্চলের সীমান্ত অঞ্চল বলে এখানে তিনি ছাউনি ফেলেন। এই সময়ের মধ্যে হাজার হাজার লোক ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে এবং তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করে তাঁর অনুগামী হয়ে বারোবাজার এসে উপস্থিত হয়। এই স্থানে ছাউনি ফেলার পর রাজা গণেশ তাঁদের প্রতিহত করার জন্য তার কালো বাহিনী প্রেরণ করে। কিন্তু তারা এই বিশাল মুসলিম বাহিনীর মোকাবেলা করতে সাহসী হয় না এবং ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে সুন্দরবনের গভীর প্রদেশে 'খাদি' অঞ্চলে পলায়ন করে।

এই সময়ও হোসেন শাহের আমল পর্যন্ত দেখা যায় যে হিন্দুধর্মের ছুত মার্গের কড়াকড়ির ফলে হিন্দু ধর্মের প্রতি হিন্দুদের মন বিতৃষ্ণায় ভ'রে ওঠে। ফলে মুসলমান ধর্ম প্রচারকদের উদার মনোভাবের জন্য তাদের ডাকে সাড়া দিয়ে অগণিত হিন্দুর ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করার জন্য হিন্দু ধর্ম তখন প্রায় লোপ পেতে বসেছিল। তাই বাদশা হোসেন শাহ ও যখন ইসলাম ধর্ম প্রচারে মনোনিবেশ করলেন তখন নবদ্বীপে নিমাই নামক একজন বিচক্ষণ হিন্দু চিন্তাবিদ হিন্দু ধর্ম লোপ পাওয়ার কারণ অনুধাবন করে বিদ্বেশপূর্ণ ছুত মার্গকে শিথিল করে ভাব ও ভক্তিকর্তাকে সবার উপরে স্থান দিয়ে ইসলাম থেকে

www.pathagar.com

একেশ্বরবাদ, সাম্যনীতির অনুসরণ করে, ঢোল করতাল সহযোগে কীর্তন কুর্দ্দন সহকারে লোভনীয় রাধা-কৃষ্ণ প্রেম লীলাকে উপসর্গ করে বৈষ্ণব ধর্ম প্রচারের মাধ্যমে ভাসমান হিন্দু ধর্ম রক্ষার্থে ব্রতী হলেন। পরবর্তীকালে তিনিই চৈতন্যদেব নাম ধারণ করেন। ইতিহাস ও বিভিন্ন সূত্র দেখা যায় যে হযরত খানজাহান আলী (রঃ) ধর্ম প্রচারকালে তাঁর প্রধান মন্ত্রী মোহাম্মদ তাহেরের সঙ্গে পরবর্তীকালে এদের সংঘর্ষ হয়। এই সংঘর্ষে তারা চরম পরাজয় বরণ করে।

পরবর্তীকালে হযরত খানজাহান আলী (রঃ) এদেশে ইসলাম প্রচার করার জন্য বিধর্মীদের সঙ্গে অনেক যুদ্ধ বিগ্রহে লিপ্ত হয়েছিলেন। প্রতিক্ষেত্রেই দেখা যায় যে সব সময়ই তিনি আক্রমণ প্রতিহত করেছেন। আক্রমণকারী হিসাবে কখনই যুদ্ধে অবতীর্ণ হননি। রাজা গণেশের যে সৈন্যদল সুন্দরবনের আদি অঞ্চলে পলায়ন করেছিল তারাও পরে শক্তি সঞ্চয় করে যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছিল। এমনি সংঘাতময় সময়ের এক পর্য্যায়, হোসেন শাহের মৃত্যুর পর তাঁর ভ্রাতা নাছিরউদ্দিন মাহমুদ শাহ দক্ষিণবঙ্গ অভিযানে বহির্গত হন ও বিনা বাধায় হাবেলি পরগণায় এসে উপনীত হন। হযরত খান জাহান আলী (রঃ) কোন বাধা প্রদানের পরিবর্তে তাকে সাদর অভ্যর্থনা জানান। এই সময় নাছিরউদ্দিন মাহমুদ শাহ তাঁকে হোসেন শাহের পালিত পুত্র হিসাবে এই পরগণার সুবেদার নিযুক্ত করেন। পরবর্তীকালে তাঁর কামালিয়াতির পরিচয় পেয়ে তিনি নিজেও খানজাহান আলী (রঃ)র হাতে বয়াত হন ও ইসলাম প্রচারার্থে তাকে সর্বপ্রকার সহযোগিতা প্রদান করেন। পরবর্তী এক প্রবন্ধে এর বিশদ আলোচনা করা গেল।

—

www.pathagar.com

।। হযরত খানজাহান আলী (রঃ)র নাম ও তাঁর কর্ম্ম-জীবন ।।

আজ এই কথায় সকলেই একমত যে হযরত পীর খানজাহান আলী (রঃ) এর প্রকৃত নাম খানজাহান আলী নয়, এটি তাঁর উপাধি বিশেষ। তাহলে তাঁর বাল্যনাম কি ছিল তা জানার জন্য অনেকে অনেক প্রচেষ্টা চালিয়েও বিশেষ কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারেননি। আমি পুরাতন গল্প প্রবাদ ও পুঁথি সূত্রে যে নাম পেয়েছি ইতিপূর্ব্বে আমি তার উল্লেখ করেছি। সে নাম হোল কেশর খান। তবে তাঁর রওজা মোবারকের শিলালিপিতে যে নাম খোদিত পাওয়া যায় তা হোল "খানিল আজম খানজাহান আলাইহের রহমাত।" এই নামটি লেখা রয়েছে তাঁর মাজারের উপর অর্ধ গোলাকৃতির সে পাথরখানা বসানো রয়েছে তার উপর। দক্ষিণ দিকের দরজা দিয়ে ঢুকতেই মাজারের এই অংশটা চোখে পড়ার কথা। কিন্তু বর্তমানে সুন্দর কাপড়ের গেলাপে আবৃত রয়েছে। সেখানে লেখা আছে—

هذه روجة لمباركته من رياض الجنة لخان الاعظم خان جهان عليه الرحمة

الرضوان التحريرا في ستو عشوين من ذي الحجة و ثلث ستن ثمانيه ٥

বাংলা উচ্চারণ :—হাজিহি রাওজাতুল মোবারাকাতে মিন রিয়াজিল জান্নাতে লি খানিল আজম খানজাহান আলাইহের রাহমাতির রিজওয়ানিত তাহরির ফি ছিতুনা ইশরুন মিন জিল হিজ্জাতে ওয়া ছালাহা ছিত্তিনা ছামানিয়াতে।

অর্থ :—এই পবিত্র রওজা মোবারক বেহেস্তের রওজা বা বাগিচা সমূহের অনুরূপ। ইহা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অলি ও সাধক খানজাহান এর মাজার তাহার উপর আল্লার রহমাত ও শান্তি বর্ষিত হোক। ইহা লিপিবদ্ধ করা হয় ৮৬৩ হিজরীর ২৬শে জিলহজ তারিখে।

www.pathagar.com

এখানে তাঁর মাজার শরীফকে পবিত্র বেহেস্তের রওজা মোবারক বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে এবং তাঁকে সাধক শ্রেষ্ঠ অলি বলা হয়েছে। কাজেই তিনি যে সাধারণ একজন সাধক বা বাদশা ছিলেন না এ কথা পরিস্কারভাবেই বোঝা যায়। কবরগাত্রে আরও অনেক লেখা রয়েছে যা তথ্যপূর্ণ ও অর্থবহুল। তাঁর বাল্যকালের সকল ঘটনা ও বাল্যনাম খুঁজে না পাওয়া গেলেও তিনি যে একজন সাধারণ লোক ছিলেন না এবং আল্লার অলির পর্য্যায়ে উন্নীত হ'তে পেরেছিলেন তা তাঁর মাজার গাত্রের গভীর অর্থবহুল বিভিন্ন লেখা দেখে সহজেই অনুমান করা যায়।

এ কথা আমি পূর্ব্বেই বলেছি যে হযরত পীর খানজাহান আলী (রঃ) এই সুদূর বাগেরহাটে ইসলাম নিয়ে হিজরাত করেছিলেন এবং এ হিজরাত ছিল তাঁর আধ্যাত্মিক নির্দেশ মোতাবেক। নবী করিম (দঃ) এর মৃত্যুর পরও দেখা যায় যে অনেক মুসলিম পরিবার বিভিন্ন সময়ে হিজরাত করেছেন; তার মূলে ২টি কারণ বিদ্যমান ছিল। কারো কারো মকছেদ ছিল সুন্নত পালন ও ভাগ্য পরিবর্ত্তন। কিন্তু অলি আল্লাদের হিজরাতের পিছনে ছিল আদেশ ও নির্দেশ, তাকিদ ছিল ইসলাম প্রচার। এতে তাদের ধন ও জনের প্রয়োজন হোত না। অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাঁরা একাই বেরিয়ে পড়তেন আর তাঁদের পদচারণায় সারা জাহান স্পন্দিত হয়ে উঠতো। আর কেউ কেউ সৈনিকের বেশে এসেছেন ও অলি আল্লা হ'য়ে মৃত্যু বরণ করেছেন।

আজকের এই যুগে বিশেষ করে এই উপমহাদেশে দেখা যায় গরীব মানেই মুসলমান আর মুসলমান মানেই গরীব। কিন্তু তখনকার দিনে কোন মুসলমান যে গরীব হ'তে পারে এটা ছিল ধারনার অতীত এবং একমাত্র কারণ তাঁরা ধনের জন্য লালায়িত ছিলেন না। লালায়িত ছিলেন একমাত্র আল্লার অনুগ্রহের জন্য। তাই প্রয়োজনে তাঁদের কিছুরই অভাব হোতনা। ধন সম্পদের দাসত্ব তাঁরা করেন নি, ধন ও সম্পদ তাঁদের দাসত্ব করেছেন। তাই দেখা যেত অসীম ধন ও সম্পদের মালিক হয়েও কেয়ামতের ভয়ে, আল্লার হিসাব চাওয়ার

www.pathagar.com

ভয়ে, গরীব ও ফকিরের মত তাঁরা জীবন যাপন করেছেন। বাদশা সেকেন্দার মৃত্যুর পরে তাঁর খালি হাত দুটো সবাইকে দেখিয়ে দিতে বলেছিলেন। আখেরাত তাদের কাছে ছিল বড় তাই দুনিয়া তাদের হোত পদানত। ঠিক এমনই একজন মুসলমান ছিলেন আমাদের হযরত পীর খানজাহান আলাইহের রহমাত। তাঁর কবরগাত্রে এক জায়গায় লেখা রয়েছে –

مان مات غريبا - فقد مات شهيد o

উচ্চারণ :—মাম মাতা গারিবানঃ ফাকাদ মাতা শাহিদান।

অর্থ :—যে ব্যক্তি গরীব হালাতে মৃত্যুবরণ করল নিশ্চয়ই সে শহীদ হয়ে মৃত্যুবরণ করল।

তাঁর কবরগাত্রে এ কথা লেখার তাৎপর্য্য এই যে নিশ্চয় তিনি দাবী রাখেন যে তিনি গরীব হালাতে মৃত্যুবরণ করেছেন এবং তিনি শহীদ হয়েছেন। এতে বোঝা যায় মৃত্যুর পূর্বে তিনি ইসলামের জন্য তাঁর সমস্ত কিছু বিলিয়ে দিয়ে স্ব-ইচ্ছায় একান্ত গরীব হালাতে মৃত্যুবরণ করেছেন। খলিফাদের জীবনাদর্শ তিনি পুংখানুপুংখ রূপে তাঁর জীবনে প্রতিফলিত করেছেন। যিনি এত বড় বড় দীঘি খনন করেছেন, মসজিদ নির্মাণ করেছেন, যার সংখ্যা শুধু বাগেরহাটেই ৩৬০টি, এত কারুকার্য খচিত কীর্তিসৌধ যার বিদ্যমান রয়েছে তিনি মৃত্যু বরণ করেছেন নিতান্ত গরীব হালাতে। সাধারণ মানুষের কাছে এ কথাটি অযৌক্তিক ও অসম্ভব বলে মনে হয়। আর মনে হয় বলেই সেদিন একজন উচ্চ শিক্ষিত লোক ও মন্তব্য করেছিলেন যে, "আসলে সে যুগের কবরের উপর এমনি লেখার একটা রীতি ছিল। খানজাহান আলী রাজা বাদশা জাতির একজন লোক ছিলেন মাত্র। ওলি-টলি কিছুই নয়। তা হলে তাঁর মাজারের খাম্বায় সিন্দুর দিয়ে হিন্দুদের পূজা দেওয়া সম্ভব হয় নাকি।" কিন্তু আসল কথাটা তিনি না বুঝেই এরূপ মন্তব্য করেছেন। কোন ধর্মের প্রতি তাঁর বিদ্বেষ ছিল এমন নজির আজও পাওয়া যায়নি। বরং জানা যায় যে

www.pathagar.com

হিন্দু ব্রাহ্মণদের জন্য তিনি নিজে পৃথক বাসস্থান নির্বাচন করে দিয়ে গিয়েছেন। কিন্তু তাই বলে তাঁর মাজারের থাম্বায় তেল সিন্দুর দিয়ে পূজা দেওয়ার প্রথা তিনি প্রচলন করে যাননি। আর মৃত্যুর পরেও তিনি এগুলি বন্ধ করার জন্য নিষেধ করতে আসেন না। রাজা বাদশা তিনি যাই থাকুন না কেন গরিবী হালাতে তিনি মৃত্যু বরণ করেছেন এতে কোন সন্দেহ নেই এবং এ কথাই ইসলামের মূল আদর্শ। নবী করিম (দঃ) এর প্রতিষ্ঠিত ইসলামী আদর্শ ও শাসনতন্ত্রের চরম ও পরম উৎকর্ষ সাধনকারী খলিফা হযরত ওমরের জীবনই ছিল এমনি ধারায় প্রবাহিত। তাঁর রাজ্যের নাম ছিল খলিফাতে আবাদ ও তিনি যে খলিফাদের পদাঙ্ক অনুসারী ছিলেন সে কথা এখানে আবার প্রমাণিত হয়েছে।

তাঁর রওজা মোবারকের দক্ষিণ দিকে তাঁর মৃত্যুর পূর্ণ বিবরণ লেখা রয়েছে। মাজারের উপর থেকে একটি বৃত্তের মধ্যে লিখিত রয়েছে তাঁর পূর্ণ পরিচয় ও তাঁর ইন্তেকালের দিন ও তারিখ। আরবী লেখাটি এইরূপ—

انتقل العبد الضيف المحتاج الي الرحمة العلمين المحبب لاولاد سيد
المرسلين و المخلص العلماء الرشدين المبغض للكفار و المشركين المعين للاسلم
او لملمين الغ خان جهان عليه الرحمة الغفران من دار و لدنيا و في دار لبقاء ليلة
الكربا في ستة و عشرين من ذي الحجة و دفن يوم الخمس سبع و عشرين
منه سنة ثلث و ستين و ثمانية ء

বাংলা উচ্চারণ:—ইনতা কালালাল আব্দুজ জয়ীফু আল মোহতাজ ইলার রহমাতিল আলামীন, আল মুহিব্বু-লি আওলাদি সাইয়েদিল মুরছালিন আল মুখলিছ লি উলামাইর রাশেদিন আল মুবগিজু লিল কুফফারি ওয়াল মুশরিকিন। আল মইনু লিল ইসলাম, লাও লেমাল মাইন উলুঘ খানজাহান আলাইহের রহমাত ওয়াল ফুকরানো মিন দারিব দুনিয়া ওয়াফি দারিল বাক্কা লাইলাতাল আরবায়াফি ছিত্তাতুন ওয়া ইশরিনা মিন জিলহিজ্জাতে ওয়াদুফিনা ইয়াওমাল খামছে ছাবয়ুন ওয়াইশরিনা মিনলু ছানাতা ছালাছব ওয়া ছিত্তিনা

www.pathagar.com

ওয়া ছামানিয়াতা।"

অর্থঃ—এইখানে এমন একজন জরিফ বান্দা ইন্তেকাল করিয়াছেন বা শায়িত আছেন যিনি শুধু সকল রহমাতের মালিক এক আল্লার মুখাপেক্ষী, রসুল (দঃ) এর আওলাদ বুনিয়াদের প্রতি একজন বিশেষ মহব্বতকারী ব্যক্তি, সৎপন্থী আলেম ওলামাদের একজন সাহায্যকারী, কাফের ও মোশরেকদের একজন বিদ্বেষ পোষণকারী শত্রু ইসলামের সাহায্যকারী বন্ধু যদিও তিনি পৃথিবীর এক অবহেলিত প্রান্তে পড়ে আছেন তবুও তিনি শীর্ষস্থানীয় একজন মহান বুজর্গ-ইনি সেই খানজাহান-আলাইহের রহমাত (তাঁর প্রতি আল্লার রহমত বর্ষিত হোক) যিনি অস্থায়ী দুনিয়া থেকে কারাগ বা আলাদা হয়ে স্থায়ী দুনিয়ার দিকে রওনা হলেন। ৮৬৩ হিজরীর ২৬শে জিলহজ বুধবার দিবাগত রাত্রে তাঁর মৃত্যু হয় এবং ২৭শে জিলহজ বৃহস্পতিবার তাঁকে দাফন করা হয়।" এই বর্ণনার মধ্যে ব্যবহৃত উলুঘ শব্দের অনেক অর্থ করেছেন সেনাপতি কিন্তু মূল শব্দটি হোল "উলঘুন" এবং এটি তুর্কি শব্দ। উলঘুন থেকেই উলুঘ। এর অর্থ উচ্চস্থানে পৌঁছানো। যেহেতু ব্যক্তিগত জীবনে তিনি সেনাপতি পদে বহাল ছিলেন সেই হিসাবে হয়তো অনেকে সেনাপতি অর্থ করেছেন। কিন্তু এই স্থানে মহান বুজর্গ বা অলি আল্লা হবে। এই মাজারের শিলালিপির লেখাগুলি কোন সময়ের লেখা এবং কে লিখিয়েছেন এ নিয়েও মতান্তর দেখা যায়। অধিকাংশই এই মত পোষণ করেন যে হযরত খানজাহান আলী (রঃ) নিজেই তাঁর কবর গাত্রের সকল লেখা নিজের জীবদ্দশায়ই শিল্পী দিয়ে নিজের পছন্দমত কথাগুলো খোদাই করান। এই মাজার তাঁর শেষ জীবনে নিজের তদারকিতে তিনি নিজেই প্রস্তুত করেন। দোয়া দরুদ আয়াত বয়াত ও নছিহত সবই তাঁর নির্দেশক্রমে লেখা হয়। এতে বোঝা যায় আরবী ও ফার্সি সাহিত্যে তাঁর অগাধ পাণ্ডিত্য ছিল। আবার কেউ বলেন জীবদ্দশায় মৃত্যুর সন তারিখ লিখতে পারেন না। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর ভক্তগণ পাথরে এই সকল কথা খোদাই করে তাঁর কবর প্রস্তুত করেন।

www.pathagar.com

কথাটা একেবারে অযৌক্তিক বলে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। আমার মতে এ দুটি মতের মধ্যেই সত্যতা নিহিত রয়েছে। জানা যায় মাজারের উপর যে সৌধটি নির্মিত হয়েছে এটা তিনি নিজেই নির্মান করেছিলেন এবং এইটিই তাঁর শেষ নির্মাণ। তাই যদি হয় তবে নিশ্চয়ই তাঁর মাজারের সবকিছুই তিনি নির্মান করেছিলেন। মাজারের সমস্ত কিছুই তাঁর ইচ্ছানুযায়ী প্রস্তুত আয়াত, বয়াত, দোয়া ও দরুদ সবই তাঁর হুকুম অনুযায়ী পাথরে খোদাই করা হয়েছে। তবে তাঁর মৃত্যুর পরও পাথরে খোদাই করা হয়েছে। তাঁর মৃত্যুর সন, তারিখ, নাম ও লকবগুলি খোদাই করে এই পাথরটি শুধু এখানে বসিয়ে দেওয়া হয়েছে। জানা যায় কোন কোন পাথরের চারিদিকেই আরবী হরফের লেখা খোদাই করা দেখা গিয়েছিল। এই মাজার প্রস্তুত করার পর তাঁর মৃতদেহ রাখবার জন্য মাজারে একটি সুড়ঙ্গ পথ ছিল। যে সুড়ঙ্গ পথ নিয়ে আজও অনেক কথা শোনা যায়। লোক চক্ষুর অন্তরালে সে সুড়ঙ্গ পথ আজও বিদ্যমান রয়েছে। উপরের পথটির পার্শ্বের একটি পাথর সরালেই গভীর সুড়ঙ্গ পথ নজরে আসবে। গুপ্ত ধনের লোভে কোন দুর্বৃত্তেরা এ কাজ করে একবার নিরাশ এবং ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে।

তাঁর জীবিত অবস্থায় তাঁর নিজের জন্য প্রস্তুত কবরের গভীর আধার পরকালের চিন্তায় তাঁকে ধ্যানগম্ভীর করে তুলেছিল। এই দুনিয়ার রূপ ও প্রকৃতি তিনি যথার্থই উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। এই দুনিয়া কিরূপ এবং মানুষের জীবনে এই দুনিয়ার আবির্ভাব কিভাবে হয় সে সম্পর্কে তিনি তাঁর কবর গাত্রে লিখে রেখে গেছেন। পাথরে লেখা রয়েছে।

الدنيا اولها بكاء

و اوسطها عناء

و اخرها فناء

উচ্চারণ :- আদ্‌দুনিয়া আউয়ালুহা বাকায়ুন।

ওয়া আওছাতুহা আনায়ুন

www.pathagar.com

ওয়া আখেরুহা ফানায়ুন

(দুনিয়ার প্রথম অবস্থা ক্রন্দন, মধ্যম অবস্থা কষ্ট ও শেষ অবস্থা বিনাশ)

অর্থ ঃ—এই দুনিয়া শুরু হোল ক্রন্দনে

কষ্ট মাঝে সাধল বাধা গুজরানে

জেনে রেখ ধ্বংস হবে শেষক্ষণে।

এই দুনিয়া ও এর পরিণতি সম্পর্কে এত অল্প কথার মধ্য দিয়ে এত সুন্দর বর্ণনা ইতিপূর্বে অন্য কোথাও আমার নজরে পড়েনি। এই অংশটুকুর অর্থ সহজে করা গেলেও দুনিয়ার সৃষ্টি সম্পর্কে ভাবতে গেলে চিন্তার সাগরে নিমজ্জিত হতে হয়।

মাজারগাত্রে পাথরে খোদাইকৃত আরও যে লেখা রয়েছে পরবর্তীতে তার বিশদ আলোচনা করতে চেষ্টা করা যাবে। এখন তাঁর নাম সম্পর্কে একটু আলোচনা করা যাক। মাজারে লিখিত খানজাহান আলাইহের রহমাত নামের পূর্বে আরও দুটি শব্দ ব্যাবহার করা হয়েছে দেখা যায়।

لو لملمين লাও লেমাল মাইন ও الغ উলুঘ লাও লেমাল মাইন ও উলুঘ পাশাপাশি এবং এদের মধ্যে অর্থের ও অবিচ্ছেদ্য যোগাযোগ রয়েছে। এই যোগাযোগে অনেকে বুঝতে না পেরে তাঁকে উলুঘ খানজাহান বলেছেন এবং এটাই তাঁর নাম ধারনা করে নিয়েছেন। লাও লেমাল মাইন ও উলুঘ-এর অর্থ ইতিপূর্বে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। তুর্কি ভাষায় "উলুঘ" এই শব্দটি পরাক্রমশালী মহাসম্মানিত ব্যক্তি ও বোজর্গদের নামের পূর্বে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। আবার কেউ বলেন এর অর্থ বোজর্গদের শীর্ষস্থানীয়। তাহলে দেখা যায় "উলুঘ" শব্দটি নামের কোন অংশবিশেষ নয়, এটাও একটি তুর্কি লকব। তাহলে তাঁর আসল যে নাম তিনি ব্যবহার করতেন সেটি হোল "খানে আজম খানজাহান।" লাও লেমাল মাইন উলুঘ এর পূর্ণ অর্থ হোল, "পৃথিবীর এই অবহেলিত প্রান্তে পড়ে আছেন বা শায়িত আছেন এক শীর্ষস্থানীয় খানজাহান।" একথায় বোঝা যায় যে তৎকালীন অনেক খানজাহানদের

www.pathagar.com

মধ্যে তিনি শীর্ষস্থানীয় এক খানজাহান। সে যুগে খানজাহান উপাধি ধারী অনেক ব্যক্তিই ছিলেন।

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের সহ অধ্যক্ষ মোহাম্মদ আবু তালিব সাহেব বলেন, খানজাহান আলী খুব সম্ভব তাঁর নাম নয়, উপাধি বিশেষ।" বাগেরহাটের পাবলিক রিলেশন অফিসার হাসান আবদুল খালেক তাঁর এক প্রবন্ধে বলেন "তাঁর নাম উলুঘ খানজাহান। তিনি খোজা ছিলেন না। তিনি সুখী দাম্পত্য জীবন যাপন করেছেন। তবে তাঁর কোন সন্তানাদি না থাকায় বিরুদ্ধ বাদীরা এই ধরনের ভুল ধারনার বশবর্তী হয়েছেন। মাজারে অর্ধগোলাকৃতি পাথরটার উপর যে নামটি লেখা রয়েছে সেখানে উলুঘ শব্দের ব্যবহার নেই। উলুঘ যদি তাঁর নামই হবে তবে সেখানেও তার ব্যবহার থাকতো। সেখানে লেখা রয়েছে শুধু লেখানেল আজম খানজাহান আলাইহের রহমাত। তবে আলাইহের রহমত তাঁর নাম নয়। তাঁর প্রকৃত নাম আমরা খানেল আজম খানজাহান ধরে নিয়ে সন্তুষ্ট থাকতে পারতাম কিন্তু লেখানেল আজম শব্দটা ব্যবহার হওয়ায় এটা আমরা নিশ্চিত ধরে নিতে পারি যে এর কোনটাই তাঁর আসল নাম নয়, উপাধি বিশেষ।

আমি ইতিপূর্বেই বলেছি যে, বিশেষ সে যুগে খানজাহান আলী একটি বিশেষ পদ মর্যাদায় অধিষ্ঠিত ছিলেন সেই যুগে খানজাহান উপাধিটার বহুল প্রচলন ছিল। এর অর্থ জগতের অধিপতি: কোন কোন রাজা বাদশা বা জায়গীরদারেরা অথবা পরাক্রমশালী বীরগণকে রাজদরবার থেকে এই মহিমাব্যঞ্জক উপাধি দেওয়া হোত। তাই তিনিও খানজাহান উপাধিতে ভূষিত হয়েছিলেন। কিন্তু আলী শব্দটা তাঁর নামের কোথাও পাওয়া যায় না। আমাদের দেশের লোকেরা আঞ্চলিক ভাষায় অনেক কথাই সংক্ষিপ্ত করে ব্যবহার করে থাকে। যার ফলে আলাইহের রহমাত শব্দটা আলী শব্দে রূপান্তরিত হয়ে তাঁর নামের সঙ্গে মিশে গিয়েছে। কিন্তু তাতে তাঁর নামের

www.pathagar.com

সৌন্দর্যের কোন হানি হয়নি বরং শব্দটা ব্যবহার হওয়াতে এটি একটি নাম বলেই মনে হয়। শুধু যে আলাইহের রহমতকে সংক্ষিপ্ত করা হয়েছে তাই নয় খানজাহান আলীকেও সংক্ষিপ্ত করে অনেকে তাঁকে খাঞ্জালী পীর বলে অভিহিত করে থাকেন। তাঁর দীঘির নাম হয়েছে খাঞ্জালি দীঘি। হাবেলি খলিফাতাবাদ হয়েছে—হাওলি। উচ্চারণের সহজ পদ্ধতির জন্যই নামের পরিবর্ত্তন হয়েছে। নামের এই বিকৃতিকরণ আল্লার অলির প্রতি কোন বেয়াদবি না হলেই হয়।

তাঁর মাজার গাত্রের শিলালিপি দেখে এবং তাঁর কীর্তির মহিমায় মুগ্ধ হয়ে কোন কোন লেখক বলেছেন যে "তাঁর নাম যাই হোক না কেন তিনি যে বাদশা ছিলেন তাতে কোন সন্দেহ নেই।" কেউ কেউ বলেছেন, তিনি মক্কা মদিনার বাসিন্দা নাও হতে পারেন, কিন্তু তিনি যে আরবের যে কোন অংশের বাসিন্দা ছিলেন তা সহজেই অনুমান করা যায়। কিন্তু দেখা যায় এঁরা যে কিসের উপর ভিত্তি করে এ অনুমান করেছেন সে সম্পর্কে তাঁরা কিছুই বলেননি। তবে আমরা অনুমান করে নিতে পারি যে তাদের অনুমানের কারণ মনে হয় এইটাই যে, তাই যদি না হবে তবে আরবীতে এত বুৎপত্তি তিনি কেমন করে লাভ করবেন? কিন্তু এ কথা বলার এটাই যথেষ্ট কারণ হতে পারেনা। এ কথা আমি পূর্বেই আলোচনা করেছি যে তাঁর পরিবার ছিল মূলতঃ তুরস্কের। অনেক ঘাত প্রতিঘাত ও পরিবর্ত্তনের মধ্য দিয়ে এই পরিবারটি গৌড় পৌঁছে নবীপুর নামক স্থানে বাসস্থান স্থাপন করেছিলেন। পরিবারগত ভাবে আরবী ভাষা ছিল তাঁদের কৃষ্টিগত ভাষা। তা ছাড়া দেখা যায় আরবী ফারসী পণ্ডিত ও তৎকালে বাংলায় কম ছিলেন না। তাছাড়া নুর-ই কুতুব-উল-আলমের মত জ্ঞানী ও পণ্ডিত ব্যক্তি যদি কারো ওস্তাদ হন তবে আরবী ফারসীতে তাঁর গভীর জ্ঞান অর্জন করা খুবই সম্ভব। সে যুগের শিক্ষা ব্যবস্থার কথা আজকের শিক্ষা ব্যবস্থা দেখে অনুমান করা যাবে না। কেমন করে মারেফাতি বিদ্যা শিক্ষা করা যায় আজকের স্কুলে তা শেখানো হয় না। কাজেই তাঁর মাজারের উপর আরবী শিলালিপি দেখে যে কোন মন্তব্য সহজে করা

www.pathagar.com

যায় না এবং এতে বিস্মিত হবারও কিছু নেই। কারণ তৎকালের শিক্ষা ও সভ্যতার ধারাই ছিল এমনি।

মোঃ দলিলুর রহমান এবং আরও পুঁথি লেখক (ছেঁড়া পাতার জন্য তাঁর নাম জানা সম্ভব হয়নি) দুজনে প্রায় একই সঙ্গে লিখেছেন যে খানজাহান আলীর (রঃ) পিতা গৌড়ের একজন বাসিন্দা ছিলেন। গৌড়ের অন্তর্গত নবীপুর নামক স্থানে তাঁর বাড়ী ছিল। খানজাহান আলীর (রঃ) পিতার নাম ছিল আকবর খান, মাতার নাম ছিল আম্বিনা বিবি এবং তাঁর বাল্যনাম বলা হয়েছে কেশর খান। তাঁর মা বাবা অত্যন্ত ধর্মপ্রাণ ব্যক্তি ছিলেন। পিতা পণ্ডিত ব্যক্তি ছিলেন। রাজপরিবারে তিনি গৃহশিক্ষকের কাজে নিয়োজিত ছিলেন। রাজপরিবারের পুত্রদের যাবতীয় প্রাথমিক শিক্ষার ভার তাঁর উপর ছিল। তিনি যুদ্ধ বিদ্যায় অত্যন্ত পারদর্শী ছিলেন। পুঁথি লেখকদ্বয়ের এই কাহিনী অনেকে কাল্পনিক বলে উড়িয়ে দিয়েছেন। তার কারণ এই যে এর সত্যতা যাচাই করে নেওয়া সম্ভব নয়। ফলে আজও এই কাহিনী অনুসন্ধানের মত কঠিন কাজে লিপ্ত হওয়ার কথা কেউ চিন্তাও করেননি। কিন্তু গৌড়ের অন্তর্গত নবীপুর গ্রাম যদি থেকেও থাকে তবে সেখানে এর নিদর্শন পাওয়া সম্ভবও হ'তে পারে কাজেই এই কাহিনীকে আমি অমূলক বলে বলে মোটেই উড়িয়ে দিতে পারি না। খোদা না করে দেখা পর্য্যন্ত এই মতবাদের বিরোধিতা করার মত কোন অস্ত্র আমার হাতে নেই। তাছাড়া পুঁথি লেখকগণ যা লেখেন তা যে সবই কাল্পনিক ও মিথ্যা এমন ধারনা করার কোন যুক্তিই নেই। বাংলায় যদি সেদিনের মুসলমান শাসনামল আজও শেষ না হয়ে যেত তবে পুঁথির ভাষাই হোত বাঙ্গালীর দর্শন, সাহিত্য ও ইতিহাসের ভাষা। তবে কাহিনীকে সুন্দর করতে পয়ারে তাঁরা অনেক অলঙ্কারের সমাবেশ করে থাকেন এবং অনেক স্থানে রোমাঞ্চ সৃষ্টির মানসে কিছু কল্পনা ও অলৌকিক কাহিনীর সংযোজনা করে থাকেন। কিন্তু মূলতঃ পুঁথির মূল ঘটনার একটি কাহিনী থাকতেই হবে। অনুসন্ধানের একটি সূত্রে এইটুকু জানা যায়

www.pathagar.com

যে গৌড় অঞ্চলে নবীপুর নামক একটি গ্রাম আজও বিদ্যমান রয়েছে। মেহের-পুরের জনৈক নারায়ণ বাবু বলেন যে পূর্বে ঐ স্থানের নাম ছিল কালিনগর।

তবে বাল্যকালে খানজাহান আলী (রঃ) নাম যদি কেশর খান থেকেও থাকে তবে সে নামের আজ আর কোন অস্তিত্ব নেই বা ঐ নাম ঐতিহাসিক সূত্রে আমাদের কোন সাহায্যও করে না। কাজেই মাজারে খোদিত যে নাম পাওয়া যায় "খানে আজম খানজাহান আলাইহের রহমাত" এই নামটিতেই আমাদের সন্তুষ্ট থাকা উচিত। কারণ অনুসন্ধানের কৃতিত্ব প্রকাশ করতে গিয়ে ভুল বশতঃ আমরা হয়তো অন্য কাউকে খানজাহান আলী বলে আখ্যায়িত করতে পারি এবং এই সম্ভাবনাই বেশি।

হযরত খানজাহান আলাইহের রহমত তুরস্ক খারেজমি, বাগদাদ না নবীপুর যে স্থানের বাসিন্দাই হোক না কেন তাঁর সারাজীবন ধরেই তিনি যে খানজাহান নামে পরিচিত ও বিখ্যাত ছিলেন এবং এই নামেই স্থায়ী পরিচিতি লাভ করে দুনিয়া থেকে বিদায় গ্রহণ করেছিলেন এতে বিন্দুমাত্র সন্দেহের অবকাশ নেই। তিনি নুর-ই-কুতুব-উল আলমের নিকট শিক্ষা গ্রহণ করে আরবী ভাষায় বিশেষ বুৎপত্তি লাভ করেছিলেন ও পরবর্তীকালে তাঁর কাছে বয়াত হয়ে আধ্যাত্মিক জ্ঞান ও শক্তি অর্জন করেন। শুধু অধ্যাত্ম বিদ্যাই নয়— রাজ্য চালনায়, জনহিতকর কার্যো যুদ্ধ বিদ্যায়, স্থাপত্য শিল্পে ইসলামের মূলতত্ত্ব বিষয়ে তাঁর জ্ঞানের যতটুকু নিদর্শন রেখে গিয়েছেন ছয়শত বৎসর পরে আজও তা মানুষের বিস্ময় সৃষ্টি করে।

অনুসন্ধান করে জানা যায় তাঁর কর্মজীবন শুরু হয় সর্বপ্রথম জৌনপুরে। তাঁর ওস্তাদের সহায়তায় শর্কী বংশীয় পরাক্রমশালী সুলতান ইব্রাহিম শর্কির অধীনে একজন সাধারণ সৈনিক হিসাবে তাঁর কর্মজীবনের শুরু হয়। কিছুদিনের মধ্যেই স্বীয় প্রতিভাবলে তাঁর অধীনে তিনি প্রধান সেনাপতির পদে উন্নীত হন। পরে রাজা গণেশের মুসলিম নির্যাতনের সময় ঘটনাক্রমে (পূর্বে আলোচিত) তাঁর পীরের আদেশ মোতাবেক ইসলাম প্রচারের

www.pathagar.com

উদ্দেশ্যে ও রাজা গণেশকে চিরতরে স্তব্ধ করার জন্য পীরের দেওয়া এক শিশি পানি হাতে করে তাকে দক্ষিণবঙ্গ পর্যন্ত ইসলামের ঝাণ্ডা নিয়ে আগমন করতে হয় ক্রমে ক্রমে আল্লার মেহেরবাণী ও তাঁর পীরের দোয়ার বরকতে তাঁর কেরামতি ও বিভিন্ন মোজেজা প্রকাশ হয়ে পড়তে থাকে। এই সময় জৌনপুর, গৌড় ও বিভিন্ন স্থানের বহু মুসলমান অমুসলমান তাঁর হাতে বয়াত হয়ে ও ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে, তাঁর মুগ্ধ অনুসারি হয়ে ওঠেন এবং ইসলামের জন্য তাদের প্রাণ উৎসর্গ করার প্রতিশ্রুতিতে সর্বস্ব ত্যাগ করে আখেরাতের সুফলের আশায় তাঁর সঙ্গে পূর্ব ও দক্ষিণ বঙ্গে আগমন করেন

কথিত আছে যে সেই সময় যেই তাঁর কাছে বয়াত হতেন তাঁকে তিনি চিরসঙ্গী হিসাবে ব্যবহার করার জন্য একখানি তরবারি উপহার দিতেন। ইসলামের খাতিরে জেহাদ করার জন্যই এই তরবারি ব্যবহারের অনুমতি ছিল, না হলে তাকে খাপমুক্ত করা চলবে না। জানা যায় হযরত পীর খানজাহান আলী (রঃ) যখন গৌড় অতিক্রম করে বারেন্দ্রভূমির দিকে রওনা হন তখন তার সমস্ত মুরিদগণ ও জৌনপুরের সুলতান প্রদত্ত ৬০ হাজার সৈন্যও তাঁর অনুগামী হয়েছিলেন, তবে সৈন্যদের মধ্যে কেউ কেউ আবার জৌনপুরের দিকে ফিরে গিয়েছিলেন। প্রকৃতপক্ষে এখান থেকেই তাঁর বৃহত্তর কর্মজীবনের শুরু। প্রথমে তিনি কৃষ্ণনগর পাবনা ও রাজশাহীতে ইসলাম প্রচারের পর আরও পূর্বদিকে অগ্রসর হতে থাকেন এবং যশোহরের বারোবাজার নামক স্থানে এসে আস্তানা স্থাপন করেন। এটাই ছিল তাঁর সমতট ভূমির প্রান্ত অঞ্চল। এটা ছিল অন্যান্য অঞ্চলের সীমান্তদেশ ; এখানে আস্তানা স্থাপনের একটি বিশেষ কারণ এই যে তার অনুগামীদের মধ্যে অনেকেই ইচ্ছা প্রকাশ করেন যে বারেন্দ্রভূমিতেই তারা স্থায়ী আস্তানা স্থাপন করেন। অনেকে অনুমান করেন যে বর্তমান চাপাই নবাবগঞ্জ অঞ্চলেই তারা একটি মঞ্জিল অপেক্ষা করেছিলেন। এই স্থানকেই তারা তাদের যাত্রার শেষ

www.pathagar.com

সীমা মনে করেছিলেন। কিন্তু হযরত পীর খানজাহান আলী (রঃ) যখন আরও অগ্রসর হতে থাকেন তখন তাদের মধ্যে রাজা গণেশকে আক্রমণ করার কথা নিয়ে একটি আলোচনা শুরু হয়। এই কারণেই তিনি সবাইকে নিয়ে এই বারোবাজারেই সর্বপ্রথম মোশাহেরা মজলিসে বসেন এবং ভবিষ্যতের জন্য কর্মপন্থা নির্ধারণ করেন

এইখানে তিনি বেশ কিছুদিন অবস্থান করেন। এইখানে অবস্থান শুরু হওয়ার কিছুদিনের মধ্যেই চারিদিকে তাঁর বিভিন্ন কেরামতির কথা ছড়িয়ে পড়ে এবং একজন কামেল দরবেশের আগমন হয়েছে বলে দিকে দিকে সুনাম ছড়িয়ে পড়ে। বিভিন্ন রোগ পীড়া ও কঠিন ব্যধি হ'তে মুক্তিলাভের আশায় দুর দুরান্ত হতে বহু হিন্দু মুসলমান প্রতিদিন তাঁর দরবারে হাজির হতে থাকে। দেখতে দেখতে তাঁর পূর্ব অবস্থার সম্পূর্ণ পরিবর্তন ঘটে। তিনি প্রতিদিন লোককে ওয়াজ নছিহত করতে থাকেন। তাঁর অমৃতময় বাণী শ্রবন করে অল্পদিনের মধ্যেই বহু হিন্দু তাদের ধর্মের ও মূর্তি পূজার অসারতা বুঝতে পারে ও তাঁর নিকট ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে তাঁর হাতে বয়াত হয়। এমন কথাও শোনা যায় যে অনেক উচ্চ মানের হিন্দু ব্যক্তি মুসলমান না হয়েও তাঁর প্রতি অনুরক্ত হয় ও তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করার ইচ্ছা প্রকাশ করে। তিনি তাদের প্রতিদিন তার নিকট আসার অনুমতি প্রদান করেন। এমনি ভাবে বহুদিন অতিবাহিত হবার পরও যখন তিনি তাদের একবারও মুসলমান হবার কথা বলেন না তখন একদিন তারা স্বেচ্ছায় সপরিবারে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে। পরবর্তীকালে তারাও এক একজন দিলদার মুসলমান ও অলির দরজায় উন্নীত হতে পেরেছিলেন। যশোরের বারোবাজার মুরলি ও কালিবাড়ী নামক জায়গায় এমনি কয়েকটি পরিবারের গল্প শোনা যায়। গল্পগুলি এই ধরনের যে, "এই স্থানের একজন ব্রাহ্মণ একদিন হযরত খানজাহান আলী (রঃ) কে দেখতে আসেন। তাকে দেখে ব্রাহ্মণ তাঁর প্রতি অনুরক্ত হ'য়ে পড়েন। সে প্রতি দিন তার মধুর বাণী শ্রবন করার জন্য তাঁর

www.pathagar.com

নিকট যাতায়াত করতে থাকে। এই কারণে তার পূজা আহ্নিকের কাজে অনেক ব্যাঘাত ঘটতে থাকে কোন এক সময় হিন্দু সমাজ তার স্ত্রীকে বলে তার স্বামী যবন দোষে দুষ্ট বলে পূজার কাজ থেকে তাকে বাদ দিয়ে একঘরে করা হল। তার স্ত্রী হায় হায় করে উঠলো এবং তার স্বামী বাড়ীতে এলে তাকে আর যবনের কাছে না যাবার জন্য জিদ ধরে প্রায়শ্চিত্ত করতে অনুরোধ জানালো। ব্রাহ্মণ তার স্ত্রীকে বলল যে, যদি তুমি এই যবনটিকে একবার দেখে আসতে রাজী হও তবে আমি আর তার কাছে যাব না। অনেকদিন বলার পর তার স্ত্রী অতি গোপনে একদিনের জন্য সে রাজী হোল। তার স্ত্রীরও এই যবনটিকে দেখার কিছুক্ষণের মধ্যেই মানসিক পরিবর্তন ঘটলো এবং সেই তার স্বামীকে বলল এসো আমরা মুসলমান হয়ে যাই। এমনিভাবে এই পরিবারটি মুসলমান হ'য়ে গেল।

হযরত খানজাহান আলী (রঃ) ও তাঁর আরও ১১ জন সঙ্গী আওলিয়া এই বারো বাজারেই তাদের সর্বপ্রথম কীর্তি একটি মসজিদ নির্মাণ করেন। এই মসজিদ নির্মাণ করে এইখানে তিনি সর্বপ্রথম ইসলামের স্থায়ী ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেন। ইসলাম প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর বৃহত্তর কর্মজীবনের শুরুতেই তিনি মানব কল্যাণ ও জনহিতকর কাজকে তিনি পরবর্তী জীবনের লক্ষ্য হিসাবে বেছে নেন। যার ফলে তিনি এদেশের সার্বিক উন্নতির জন্য অসংখ্য রাস্তা ঘাট নির্মাণ, মসজিদ ও সেতু নির্মাণ দীঘি খনন ও বন্দর প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এই সমতট ও দক্ষিণ অঞ্চল ছিল লবণাক্ত পানির দেশ। আজও এই দেশের নদী খালের পানি পান করার অযোগ্য এমনকি মুখে পর্যন্ত দেওয়া যায় না। কাজেই এই দেশে সুপেয় পানির জন্য দীঘি খননের কাজকে তিনি একটি প্রধান কাজ হিসাবে বেছে নিয়েছিলেন ও অসংখ্য দীঘি খনন করে এদেশের মানুষের নূতন জীবন দান করে অশেষ ছোয়াবের অধিকারী হয়েছিলেন। দেখা যায় তার রাজ্য সীমায় তিনি অনেক ভেড়ী বাঁধ নির্মাণ করেছিলেন এবং এই ভেড়ী বাঁধের উপর দিয়েই রাস্তা নির্মাণ করেছিলেন।

www.pathagar.com

ঝাটগুম্বজের নীচ দিয়ে এবং বারাকপুরের মধ্য দিয়ে সোনাতলার ভিতর দিয়ে তাঁর যে উচু রাস্তাটির চিহ্ন পাওয়া যায় এটি ভৈরব নদীর কুল পরিবেষ্টিত ছিল। এটিই ছিল তার রাজধানীর ভেড়ি বাঁধ।

বেশি দিনের কথা নয়, যখন খুলনা জেলার সৃষ্টি হয়নি তখন যশোহরই ছিল খুলনার সমস্ত অঞ্চলের জেলা শহর। অবসর সময়ে প্রবীন মুরব্বিদের কাছে বসলে বাগেরহাট থেকে যশোহর পৌঁছানোর দুর্ভোগের গল্প আজও শোনা যায়। পুরানো ইটের একটি পথ ছাড়া আর কোন পথই ছিল না তাও সে পথের কোন সংস্কার হত না। একমাত্র ঘোড়া ছাড়া অন্য কোন যানবাহনই ছিল না। খুব শারিফ খানদান লোক ছাড়া অন্য কারোরই ঘোড়া ছিল না। সবাই পায়ে হেটে যশোর পৌঁছাতো। মামলা মোকর্দ্দমার জন্য চিড়ে মুড়ি বেধে নিয়ে ২/৩ দিন আগেই রওনা হতে হোত। এবং অনেক আগের কথা যখন এই দেশ ছিল জঙ্গলে পরিপুর্ণ, নীচ জাতির বাদ্গি, বৌদ্ধ মগ ও কাপালিকের তখন ছিল আবাসভূমি সহজ চলাচলের জন্য একটি পাকা ইটের রাস্তা নির্মাণ করার অর্থ শুধু ছোয়াব হাসিল করাই নয় একটি সভ্যতার বিকাশ সাধনও বটে। তাঁর অসংখ্য মসজিদ নির্মানের উদ্দেশ্যে শুধু ধর্মের ভিত্তি স্থাপন করাই নয় বরং ধর্মকে মানব জীবনের সঙ্গে দৈনন্দিন কাজের মত ওতোপ্রোতভাবে জড়িয়ে দেওয়া। এই জন্যই এই ৩টি কাজকেই তিনি জীবনের কর্ম হিসাবে বেছে নিয়েছিলেন এবং এর পিছনে প্রয়োজনের তাগিদ ও কম ছিল না। তাঁর কর্মময় জীবনের এই সিদ্ধান্ত নেবার পরও বহুদিন তিনি বারোবাজারে অবস্থান করেন এবং সম্মুখের বিশাল অরণ্য প্রদেশের মধ্যে প্রবেশের প্রস্তুতি নেন। শোনা যায় এই স্থান থেকেই বাহিরের সহিত রাস্তার সংযোগ স্থাপন করে প্রথম তিনি রাস্তা নির্মাণের কাজ শুরু করেন এবং এই রাস্তা নির্মাণ করতে করতে সমতট ভূমির প্রান্তদেশ পর্য্যন্ত পৌঁছে যান।

যেহেতু বারোবাজার হযরত খানজাহান আলী (রঃ)র প্রথম মনজিল

সেইহেতু তৎকালীন বারোবাজারের একটু পরিচয় দেওয়া প্রয়োজন। তৎকালে বারোবাজার শামছ নদীর তীরে অবস্থিত একটি বন্দর ছিল। পূর্বের থেকেই এই স্থানটি অনেকের নিকট পরিচিত ছিল। হিন্দু এবং বৌদ্ধ আমলে এই স্থানটির বিশেষ উৎকর্ষ সাধিত হয়েছিল। বৌদ্ধ আমলে এটি বিদ্যা শিক্ষার একটি কেন্দ্রভূমিতে পরিণত হয়েছিল। সেই সময়ের বহু প্রাচীন কীর্তির ধ্বংশাবশেষ এখানে আজও বিদ্যমান। এই স্থানের অনেক জায়গায় পুকুর খনন করতে গিয়ে ব কোন প্রয়োজনে মাটি খুড়তে গিয়ে অনেকে বৌদ্ধ আমলের বহু পুরাতন পাথরের থালা ঘটি বাটি ও মাটির কারুকার্য্য খচিত অনেক বাসনপত্র পেয়েছেন। স্থানীয় অনেকের কাছে এই সব প্রাপ্ত পাথরের থালা ঘটি বাটি আজও রয়েছে। সেগুলি দেখলে সন্দেহাতীত ভাবে বলা যায় যে এগুলি সবই বৌদ্ধ সভ্যতার নিদর্শন। অনেকের কাছে শোনা যায় যে কোন কোন পুকুর খননের সময় অনেকে অনেক তাম্র ও রৌপ্য মুদ্রা পেয়েছেন। এখানকার আবুল কাশেম মিয়া নামক একজন লোকের নিকট এমনি কিছু মুদ্রার সন্ধান পেয়ে তার সঙ্গে দেখা করার চেষ্টা করে এক সময় আমি ব্যর্থ হয়েছি। তবে জানা যায় এই ধরনের অনেক মুদ্রা আজও কলকাতা যাদুঘরে রক্ষিত রয়েছে। সে সকল মুদ্রায় মাহমুদ শাহের নাম খোদিত রয়েছে

কথিত আছে যে এই স্থানটি বিখ্যাত চাঁদ সওদাগর অথবা চাঁদ বনিকেরও একটি বাণিজ্য কেন্দ্র ছিল। এই স্থানের সুবিদপুর নামক গ্রামের নিকট শামছ নদীতে একসময় এই চাঁদ বণিকের একটি বাণিজ্য জাহাজ ডুবে গিয়াছিল। এই নদী আজ মৃত, জলের প্রবাহ আর নেই, তবে নদী আজও বিদ্যমান রয়েছে। এই নদীর মাঝের একটি উঁচু মাটির ঢিবিকে আজও চাঁদ সদাগরের ডুবন্ত জাহাজের চিহ্ন বলে লোকে বিশ্বাস করে থাকে। চাঁদ বণিক ডুবন্ত জাহাজ উদ্ধার করেনি বলে মাটি জমে জমে নদীর মধ্যস্থলে একদিন এই ঢিবিটির সৃষ্টি হয়েছিল।

www.pathagar.com

এই ঘটনা কতদূর সত্য তার প্রমানাদি খাড়া করা আজ সম্ভব না হলেও এ কথা সত্য যে ঝিনাইদহ, শিলাইদহ প্রভৃতি স্থানে তার বাণিজ্য কেন্দ্র স্থাপিত ছিল।

বারোবাজার থেকে সাত আট মাইল পশ্চিমে ধোপাদি নামক স্থানে একটি পীরের দরগাহ আজও বিদ্যমান রয়েছে জানিনা এটি কোন পীরের দরগাহ্। তবে স্থানীয় লোকেরা এটিকে বেলু দেওয়ালের দরগাহ্ বলে অভিহিত করে থাকেন। এই বেলু দেওয়াল সম্পর্কে এই স্থানে অনেক গল্প প্রচলিত রয়েছে। লোকে বলে এই ফকির বা দেওয়ান গায়ে বালু মেখে থাকতেন বলে লোকে তাঁকে বালু দেওয়াল বা বেলু দেওয়াল বলে অভিহিত করেছিল। তাঁর আসল নাম কেউ জানতো না। অনেকের ধারনা প্রায় পাঁচশত বৎসর পূর্বে তিনি এখানে আগমন করেন। এখানকার কিছু প্রবীন লোকের বর্ণনায় জানা যায় যে এই দেওয়ান সাহেব সঙ্গে কিছু অনুগামী শিষ্যসহ প্রথমে এদেশে ইসলাম প্রচার করতে এসেছিলেন। সময়কাল তারা যেমন তাতে মনে হয় তিনি হযরত খানজাহান আলী (রঃ) র সঙ্গে এদেশে আগমন করেছিলেন। কিন্তু অনেকে বলেন তিনি অনেক পীরের লোক ও একজন গৃহ ছাড়া ফকির মাত্র। কিন্তু তিনি প্রকৃত যে কে তা আজ আর নিরূপণ করা সম্ভব নয় কারণ তার ঐতিহাসিক কোন তত্ত্বই আজ আর খুঁজে পাওয়া যায় না। তিনি নাকি অতি সাধারণভাবে ধুলা বালি মেখে গাছতলায় বসে থাকতেন, গরীব দুঃখীকে অকাতরে অর্থ সাহায্য করতেন কিন্তু কোথা থেকে তাঁর অর্থ সমাগম হোত তা কেউই বলতে পারতো না। অধিকাংশের ধারণা বেলু দেওয়াল খানজাহান আলীর (রঃ) সমসাময়িক ছিলেন। তা হলে দেখা যায় বর্তমান যেখানে যশোর শহর তৎকালে সেখানে কিছুই ছিল না। বারোবাজারই ছিল এ অঞ্চলের কেন্দ্রস্থান।

জানা যায় পীর খানজাহান আলীর নির্দেশ মোতাবেক তাঁর কিছু কিছু অনুগামী এই স্থান থেকেই যশোরের উত্তর দিকে বিভিন্ন হিন্দু প্রধান

www.pathagar.com

এলাকায় আস্তানা স্থাপন করে ইসলাম প্রচারে মনোনিবেশ করেন। যশোরের ঝিনাইদহ মহকুমার মজিদবাড়ী ও বাজিতপুর নামক স্থানেও তাদের কেউ কেউ আস্তানা স্থাপন করেছিলেন। এই স্থানের বিজয়পুর নামক স্থানে ছিল রাজা প্রতাপাদিত্য ও রাজা মুকুট রায়ের রাজধানী। বর্তমানে মজিদ বাড়ী গ্রামে মাটি খুড়বার সময় মাটির তলদেশ থেকে একটি মসজিদ আবিষ্কৃত হয়েছে। মসজিদটি এক গুম্বজ বিশিষ্ট ছিল এবং নির্মাণ কৌশল হযরত পীর খানজাহান আলী (রঃ) র মসজিদের নির্মাণ কৌশলের অনুরূপ।

তৎকালে বাজিতপুর ও পার্শ্ববর্তী বিজয়পুর গ্রাম ছিল সম্পূর্ণ হিন্দু এলাকা। শোনা যায় এই বাজিতপুরে মদিনাবাসী দুই মুসলমান ভ্রাতা ইসলাম প্রচারের উদ্দেশ্যে আগমন করেছিলেন। পীর খানজাহান আলীর অনুগামীদের সহিত তাদের সাক্ষাৎ লাভ হয় ও তারাও তাদের সহযোগী হয়ে যান ও তারাও নাকি পীর সাহেবের অনুমোদন লাভ করে বাজিতপুরে স্থাপিত রাজা মুকুট রায়ের বর্তমান ভগ্নপ্রায় রাজমন্দিরের ২/৩ শত গজ দূরে আস্তানা স্থাপন করেন। তাদের দুই ভাইয়ের নাম জানা যায় আহম্মদ সালেহ ও মোহম্মদ সালেহ। কিছুদিনের মধ্যে স্থানীয় হিন্দুগণ তাদের অলৌকিক ক্রিয়া কলাপে ও বিনম্র ব্যবহারে মুগ্ধ হয় ও দেখতে দেখতে ঐ খানের পূজারী ব্রাহ্মণ ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করলে সমস্ত হিন্দুগণই ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে। এখানে তারা কয়েকটি মসজিদ নির্মাণ করেন। কিছুদিন পরে তার এক ভাই পূর্ব দিকে রওনা হন এবং আলুকদিয়া নামক স্থানে বসতি স্থাপন করেন। তবে এই দুই ভাইয়ের আগমনকাল সম্পর্কে সঠিক কোন মন্তব্য করা যায় না। কারণ রাজা মুকুট রায়ের সময় কালের সঙ্গে এদের আগমনকাল যুক্ত হ'য়ে পড়ায় অনেকে এদের পরবর্তীকালের লোক বলে বিবেচনা করে থাকেন। শোনা যায় এই দুই ভ্রাতা রাজা মুকুট রায়ের সঙ্গে অনেক দ্বন্দ্ব সংঘাতে লিপ্ত হয়ে বিজয়লাভ করেছিলেন।

www.pathagar.com

পরবর্তীকালে এই এলাকা বাদশা আকবরের আমলে পর্যায়ক্রমে, আইন-ই আকবরীতে উল্লিখিত রাজা মুকুট রায় ও প্রতাপাদিত্য বেগারা নামক দুই সামন্ত রাজার এলাকাভুক্ত হ'য়ে পড়ে। রাজা প্রতাপাদিত্য বেগারা পরবর্তীকালে ভীষণ মুসলমান-বিদ্বেষী হ'য়ে ওঠেন এবং সমস্ত মসজিদ গুলিকে ভেঙ্গে তিনি মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দেন ও বিজয়পুরে তার রাজধানী স্থাপন করেন। তিনি এই এলাকায় বহু হিন্দু মন্দির নির্মাণ করেন। এই সংবাদ বাদশা আকবরের কর্ণগোচর হলে তিনি তাঁকে তাঁর কাছে ডেকে পাঠান ও তাঁকে প্রাণদণ্ড দেন ও তাঁর বৃদ্ধ সেনাপতি খানজাহানকে ঐ সামন্ত রাজার পদে নিয়োজিত করেন। অনেকে এই খানজাহানকে বাগেরহাটের পীর খানজাহান আলী বলে ভ্রান্ত ধারনা পোষণ করে থাকেন।

বারোবাজার অবস্থানকালে হযরত পীর খানজাহান আলী (রঃ) এখানে একগুম্বজ বিশিষ্ট এক মসজিদ নির্মাণ করেন। তাঁর নির্মিত এই প্রথম মসজিদটি আজও বিদ্যমান রয়েছে। এই মসজিদটি ধ্বংশের পথে গিয়েছিল কিন্তু বর্তমানে এটিকে মেরামত করে এখানে নিয়মিত নামাজ আদায় করা হয়। অনেকে এই নিয়ে দ্বিমত পোষণ করে বলেন যে এটি খানজাহান আলী (রঃ) কীর্তি না হয়ে বৌদ্ধ কীর্তি হ'তে পারে। কিন্তু এমত গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। বঙ্কিমচন্দ্র যেমন বলেছেন যে "মন্দিরে চূড়া ভেঙ্গে খানজাহান আলী রাতারাতি গুম্বজ সৃষ্টি করে মন্দিরগুলিকে মসজিদে রূপান্তরিত করেন।" এ কথাটি তেমনি একটি কথা মাত্র, বৌদ্ধ মঠের নির্মাণ প্রণালী ও মসজিদের নির্মাণ প্রণালী এক নয়। তাঁরা হয়তো দেখেননি যে এই মসজিদের অনুরূপ হুবহু আরও একটি মসজিদ তিনি নির্মাণ করেছেন। তাঁর মাজারের উত্তর দিকে এক মাইলের মধ্যে রণবিজয়পুর গ্রামের ফকির ...বাড়ীর সম্মুখে এই দুটি মসজিদ দেখলে কেউ আর দ্বিমত পোষণ করবেন ...মার মনে হয় না।

খানজাহান আলী (রঃ) এখানে বেশ কিছুদিন অবস্থান করে ইসলামকে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে সমর্থ হন। তবুও এই

www.pathagar.com

অঞ্চলে ইসলাম জেন্দা রাখার জন্য পুরা ইসলাম হুকমত কায়েমের জন্য তিনি তার কিছু অনুগত মুরিদ ও ১১ জন আউলিয়ার মধ্যে দুই জনকে গরীবশাহ ও রেবাস শাহকে এই এলাকার সমস্ত দায়িত্বভার অর্পণ করে এক মর্মান্তিক সভায় সকলের কাছ থেকে বিদায় গ্রহণ করে ভৈরব নদীর উপকূল ধরে মুরলী নামক স্থানে আগমন করেন। যদিও বারোবাজার থেকে মুরলী খুব বেশী দূরে নয় তবুও এটি তার দ্বিতীয় মনজিল। ইতিপূর্বেই এই পর্যন্ত একটি সুপ্রশস্ত রাস্তা নির্ম্মিত হয়েছিল। তার যাত্রার শুরুতেই দেখা যায় যে তার রাস্তা নির্ম্মানের এক এক পর্য্যায়ে তিনি এক এক বার মনজিল পরিবর্তন করেছেন। যেখানে তিনি এই মনজিল নির্ব্বাচন করেছেন, সেখানে তিনি বেশ কিছুদিন অবস্থান করেছেন, ইসলাম প্রচার করেছেন এবং মসজিদ ও দিঘী খনন করেছেন ও পার্শ্ববর্ত্তী এলাকাকে তিনি মুসলমানদের আবাস ভূমিতে পরিণত করেছেন। যারা ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করে তার হাতে হাত রেখে মুসলমান হয়েছেন তাদেরও তিনি সেখানে বসবাস করবার নির্দ্দেশ দিয়েছেন ও তার খাস মুরিদদের মধ্যে থেকে দু'একজনকে ঐ স্থানের ইসলাম কায়েমের দায়িত্বভার অর্পণ করেছেন। বারো বাজারেও এই ভাবে বহু মুসলমান পরিবার বসতি স্থাপন করেছিলেন যার ফলে ঐ এলাকার বহু স্থানের মুসলমানি নাম করণ হয়েছে। বারো-বাজারের পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামগুলির নাম আজও এ কথার সত্যতা বহন করছে। দৌলতপুর, রহমতপুর এনায়েতপুর, সাদিকপুর ও হাসিলবাগ এগুলি সবই মুসলমাম নাম এতে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। রেবাস শাহ জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত এই বারো বাজারেই অবস্থান করেছেন ও এই এলাকার প্রত্যন্ত অঞ্চলে ইসলাম প্রচার করেছেন। তিনি এখানেই মৃত্যু বরণ করেন। কিন্তু তার নামের কোন মাজার পাওয়া যায় না অন্য কোনও তার মাজার আছে কিনা তারও সন্ধান পাওয়া যায় না। আমার মনে হয় আউলিয়া রেবাস শাহের ঐ দরগাহই বেলু দেওয়ানের নামে চলে আসছে। যে কার্য্য করণের ফলে বা যে কোন কারণে তার আত্মগোপন করার ফলে লোকে হয়তো তাকে এই নামেই আখ্যায়িত করেছিল।

www.pathagar.com

বারোবাজার থেকে যে রাজ সড়ক নির্ম্মানের কাজ শুরু হয়েছিল, হযরত খানজাহান আলী (রঃ) মুরালীতে অবস্থান কালেও ঐ রাস্তা নির্ম্মান কাজ পুরাদমেই চলছিল। পরবর্ত্তী মনঞ্জিল পর্যন্ত রাস্তা নির্ম্মান কাজ শেষ না হওয়া পর্যন্ত তিনি মুরলীতেই অবস্থান করেছিলেন। বৌদ্ধ আমল থেকেই মুরলী বেশ উন্নত স্থান বলে পরিচিতি ছিল। এটিও ছিল বৌদ্ধদের একটি শিক্ষা কেন্দ্র। বৌদ্ধ ভিক্ষুকদের বসবাসের নিমিত্ত এখানে তাদের একটি কেল্লা নির্ম্মিত হয়েছিল। এই কেল্লা যেমন ছিল তাদের বাসস্থান তেমনি এখানেই ছিল তাদের ধর্ম শিক্ষা কেন্দ্র। এই বৌদ্ধ আমলের অনেক গল্প এখানে আজও শোনা যায়। কোন একদল রাজ সৈন্যের আক্রমণে তারা সবকিছু ফেলে একদিন পালিয়ে গিয়েছিল, শুধু তাদের বাসস্থানের স্বাক্ষি হিসাবে পড়ে ছিল তাদের কেল্লা বাড়ী। লোকে এখনও এই স্থানকে কেল্লা বাড়ী বলে অবিহিত করে থকে। এই স্থানের মুরলী নাম, বৌদ্ধ আমলেরই দেওয়া নাম। দেখা যায় মুসলিম আমলেও এই নামের কোন পরির্তন ঘটেনি।

হযরত খানজাহান আলী (রঃ) এখানে অবস্থান কালে এই সকল স্থানের পরিস্থিতি বিবেচনা করে এখানেও ইসলাম প্রচার কার্য্যে জোর দেওয়ার বিশেষ প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেন। তিনি এখানে বেশ কিছুদিন অবস্থান করার ফলে পর্য্যায়ক্রমে এখানে একটি শহর গড়ে ওঠে। এই শহরের নাম রাখেন তিনি মুরলী কশবা। এই মুরলী এলাকায় হযরত খানজাহান আলী (রঃ)-র আগমনের পুর্বের অনেক কালী মন্দির, শিব মন্দির ও বৌদ্ধ মঠের ধ্বংশাবশেষ আজও এখানে বিদ্যমান রয়েছে। হযরত খানজাহান আলী(রঃ) এ গুলি ধ্বংশ করার নির্দ্দেশ দিয়ে কোন সময়েই কোন সম্প্রদায়ের লোকের মনে কোনরূপ আঘাত সৃষ্টি করেননি। তিনি যদি কোন মন্দির ধ্বংশ করতেন তাহলে এগুলির অস্তিত্ব আজও বর্ত্তমান থাকা সম্ভব হোতো না। এখানে অবস্থান কালে মুরলি কশবা ও তার আশে পাশে তিনি বেশ কয়েকটি মসজিদ নির্মাণ করেন ও মধ্যম আকৃতির কয়েকটি দিঘী খনন

www.pathagar.com

করেন। এই দীঘি গুলির প্রায় সবগুলিই মসজিদ সংলগ্ন ছিল। দুইটি দীঘির পাশে এই মসজিদের ভগ্নপ্রায় চিহ্ন আজও বিদ্যমান রয়েছে। ১টি খুব বড় দীঘি খনন না করার কারণ ছিল যে এই অঞ্চলের পানি খুব বেশী লবনাক্ত ছিল না। সেই দুইটি পুরাতন মসজিদের চিহ্ন ছাড়া অন্যান্য সব মসজিদের চিহ্ন আজ কালের গর্ভে বিলীন হয়ে গিয়েছে।

এইখানে অবস্থান কালে তিনি অদুরে আরও একটা বড় গঞ্জ স্থাপন করেন। এই শহরের নাম দিলেন "ছানি কশবা"। পরবর্তী কালে এই স্থানটি পুরাতন কশবা বলে পরিচিত হয়। এই পুরাতন কশবাই বর্তমানে যশোরের প্রধান শহর এলাকায় পরিণত হয়েছে। যশোর একটি আরবী শব্দ— যার অর্থ সাঁকো। মূল শব্দ জুন্দর। এই স্থানে সাঁকো বেঁধে বা পুল নির্মাণ করে তিনি পার হয়েছিলেন বলে এই স্থানের নাম হয় সদর বা যশোর। এই মুরলি কশবা হযরত গরিব শাহের প্রচেষ্টায় তৎকালে একটি ইসলামিক শিক্ষা কেন্দ্রে পরিণত হয়েছিল। এই এলাকা পরিত্যাগ করার পূর্বে এই এলাকার ইসলামী হুকুমত কায়েমের সকল দায়িত্ব ভার তিনি বোরহান শাহ্ ও গরিব শাহ্ নামক তাঁর দুই প্রধান ব্যক্তির উপর অর্পণ করেন। শোনা যায় তাঁর সঙ্গে আগমনকারী ১১ জন আউলিয়ার মধ্যে তাঁরা ছিলেন অন্যতম। গরিব শাহ্ ও বোরহান শাহ্ বিশেষ পণ্ডিত ব্যক্তি ছিলেন। তাঁদের গুণ গরিমার কথা আজও গল্প হ'য়ে এদেশে ছড়িয়ে আছে। তাঁরা ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে সকল মানুষকে ভালবাসতেন এবং সকল লোকদিগকে সহজ সরল ভাষায় এমনি ভাবে ইসলামের আদর্শ প্রচার করিতেন যে লোকে মন্ত্রমুগ্ধের মত তাঁদের বাণী শ্রবণ করত। ফলে তাঁদের যে কোন সভায় চারিদিক হ'তে অসংখ্য লোক সমাগম হ'তে থাকে এবং প্রতিদিন তাদের দরবারে বহু লোকের আগমণ ঘটতে থাকে। মুরলী এলাকায় এক পূজারী ব্রাহ্মণের ইসলাম ধর্ম গ্রহণের একটা সুন্দর গল্প প্রচলিত আছে। যশোরে অবস্থান কালে কালীবাড়ী গ্রামের ছোবহান খলিফা নামক এক প্রধান ব্যক্তির মুখে এই গল্পটি শুনেছিলাম।

www.pathagar.com

গল্পটি এইরূপ যে গরিব শাহের বাণী শ্রবণ করে, তাঁর ব্যবহারে মুগ্ধ হয়ে ও তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে এ দেশের হাজার হাজার হিন্দু নর-নারী যখন ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করতে থাকে তখন এক পূজারী ব্রাহ্মণের তাঁর উপর জাতি ক্রোধের সৃষ্টি হয়। সে তাঁর ব্রহ্মতেজের দ্বারা ও মন্ত্রের দ্বারা তাঁকে ভষ্মীভূত করার সংকল্প গ্রহণ করে। সে তাঁর উপর মন্ত্র চালনা করে কয়েকবার ব্যর্থ হয়ে তাঁকে বশীভুত করার প্রচেষ্টা চালায়। এইরূপ উদ্দেশ্য নিয়ে একদিন প্রাতে সে তার ধর্ম্মীয় সভায় আগমণ করে। কিন্তু গরিব শাহ্ তাঁর কুমতলব টের পান এবং তাকে ডেকে বলেন "তুমি ভুল করেছ ঠাকুর, আমার অনুমতি নিয়ে আসলে তোমারই মঙ্গল হোত।" এই কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে ঠাকুর ভয়ে কাঁপতে থাকে এবং জবেহ্ করা মুরগীর মত ভূতলে পতিত হয়ে ছট্ফট্ করতে থাকে। অতিকষ্টে সে গরিব শাহে্র নিকট ক্ষমা ভিক্ষা করে। এই সময় এক ব্যক্তি তাঁর কুমতলবের কথা জানতে পেরে রাগন্বিত হয় ও তাঁর প্রতি গরিব শাহের ওজুর পানির বদনা নিক্ষেপ করে। ঐ বদনার পানি তার গায়ে ছিটে পড়ে ও সে আস্তে আস্তে সুস্থ হয়ে ওঠে। তখন গরিব শাহ্ হেসে বলেন আল্লার ইচ্ছায় তুমি এবারের মত রক্ষা পেলে কিন্তু এইরূপ কাজ থেকে চিরদিনের জন্য তুমি তওবা কর! তাঁর হাতে ঐ সময়েই এই পূজারী ঠাকুর তওবা করে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে মুসলমান হয়ে যায়। কিন্তু তার স্ত্রী ও অন্যান্য সবাই তাকে পরিত্যাগ করে ও তারা হিন্দুই থেকে যায়। তিনিও আর ঘরে ফিরে যান্‌নি। কিন্তু তিনি তাদের প্রতি বিদ্রোহী হয়ে ওঠেন ও তাঁর পুজা মন্দির হতে পুজার সবকিছু নদী গর্ভে নিক্ষেপ করেন। শোনা যায় এই মন্দির ভেঙ্গে তিনি মসজিদের ন্যায় পশ্চিম দিকে একটি মেহরাব তৈরী করেছিলেন! এবং এইখানে সারা জীবন নামাজ রোজায় লিপ্ত থেকে একজন অলি হয়ে মৃত্যু বরণ করেন। এই মন্দিরটির চিহ্ন আজও বিদ্যমান রয়েছে তবে তার চূড়াটি ভেঙ্গে এই মন্দিরের মধ্যেই পড়ে রয়েছে।

যশোর শহরের পশ্চিম দিকে অবস্থিত কারবালা নামক স্থানে বাহ্‌রাম খাঁ ওরফে বোরহান উদ্দিন শাহের মাজার আজও বিদ্যমান রয়েছে। এই

www.pathagar.com

স্থানটি দীর্ঘকাল যাবৎ জঙ্গলাকীর্ণ ছিল কিন্তু কিছু দিন পূর্বে কোন একজন খাদেম এই জঙ্গল পরিস্কার করে মাজারটিকে উদ্ধার করেছেন এবং জনসাধাণের সহযোগীতায় ধ্বংশ প্রাপ্ত মসজিদটির স্থানেই একটি মসজিদ নির্মাণ করেছেন। পূর্ব্বের মসজিদটির চিহ্ন এখানে আজও বিদ্যমান রয়েছে। বর্তমানে জেয়ারতের উদ্দেশ্যে এই মাজারে বহু লোক সমাগম হয়ে থাকে। কোন কোন কারণে কারো কারো বিশ্বাস জন্মেছে যে নিঃসন্দেহে তিনি একজন আউলিয়া ছিলেন। এই মাজারে বর্তমানে বহু সিন্নি সালাত হাজত ও মান্নাতের বস্তু আসা শুরু করেছে। এই স্থানটির নাম কখন যে কারবালা হয়েছে তা ঠিক বলা যায় না তবে মনে হয় পাকিস্তান আমলে কিছু সংখ্যক শিয়া বিহারী মুসলমানগণ এই স্থানের এইরূপ নাম করণ করেছেন। বর্তমানে এই কারবালা একটি সরকারী গোরস্থানে পরিনত হয়েছে।

পুরাতন কশবা অর্থাৎ যশোর শহরের মধ্যবর্ত্তি স্থানে, দেওয়ানি আদালতের সম্মুখে, ভৈরব নদীর তীরে অতি সুন্দর সুন্দর গোলাপে আবৃত্ত সে মাজারটি চোখে পড়বে এইটাই গরিব শাহের মাজার বলে পরিচিত। বহুকাল ধরে ভৈরব নদীর ভাঙ্গনের কূলে মাজারটি স্থির হয়ে দাড়িয়ে রয়েছে। অনেক কিছু গ্রাস করলেও ভৈরব নদী তার এই মাজারটিকে গ্রাস করতে সক্ষম হয়নি। মাজারের কাছে এসে সেও স্তব্ধ হয়ে গিয়েছে। হাজার হাজার মানুষের মত সেও আল্লার অলির তাজিম করেছে। তিনি যে কতবড় একজন আল্লার অলি ছিলেন সে কথা বলার আর অপেক্ষা রাখেনা। মালি মকর্দ্দমা ও বিভিন্ন প্রকার মুশকিল আহছানের জন্য বহু লোক তার দরজায় বিভিন্ন রকম মান্নত করে থাকেন। তার মাজারটি বর্তমানে সুন্দর ভাবে সাজানো গোছানো রয়েছে ও সর্বদা পরিস্কার পরিচ্ছন্ন রাখা হয়। প্রত্যহ বহু লোক এই মাজার জেয়ারত করে অশেষ নেকী হাসিল করে থাকেন।

যশোর জেলার মাগুরা মহকুমার শ্রীপুর থানার অন্তর্গত নওহাটী গ্রামেও এক মর্ম্মান্তিক সভায় সকলের কাছ থেকে বিদায় গ্রহণ করে গরিব-শাহের মাজার বলে পরিচিত। এই স্থানের প্রায় লোকেরই ধারনা

www.pathagar.com

এই মাজারটিও একই গরিব শাহের মাজার। তাদের ধারনা যে গরিব শাহ একবার মৃত্যু বরণ করে অন্য এক জায়গায় গিয়ে জেন্দা হয়েছেন এমনি করে সাত স্থানে তার মাজার রয়েছে। তিনি যে একজন মস্তবড় অলি ছিলেন তারই সপক্ষে এ কাহিনী গল্প হয়ে বিভিন্ন স্থানে দাড়িয়ে আছে। কিন্তু একই গরিব শাহ যে বার বার মৃত্যু বরণ করেছেন ও বার বার জেন্দা হয়েছেন এ ধারণার পিছনে কোন সঙ্গত কারণ খুজে পাওয়া যায় না। তাদের এ ধারণা ভুল বলেই আমার মনে হয় কারণ এটি অলিদের স্বভাবের বহিঃভূত কাজ। কোন আল্লার অলির জীবনে এরূপ ঘটনা আছে বলে আমার জানা নেই। তবে বহু স্থানেই বহু অলি আল্লাহ গরিবী হালাতে জীবন অতিবাহিত করেছেন বলে তারা অনেকেই গরিব শাহ সাহেব বলে আখ্যায়িত হয়েছিলেন। আউলিয়াদের কাহিনীর মধ্যে গরিব শাহ উপাধি গ্রহণ করে অনেক লোকের সন্ধান পাওয়া যায়।

নওহাটায় এই গরিব শাহের মাজার আমি জিয়ারত করেছি। এই মাজারটি সাধারণ মাজারের মতই একটি মাটির তৈরী মাজার। তার উপরে টিন দিয়ে একটি ছোট ঘর তৈরী করা হয়েছে। কিছুদিন পূর্বে স্থানীয় এক-জন ধনী ব্যক্তি এর সম্মুখে একটি গেট তৈরী করে দিয়েছেন। পুরাতন কোন পাকা কবরের চিহ্নও এখানে পাওয়া যায় না আসে পাশের লোকদের নিকট জিজ্ঞাসাবাদ করে এবং খোজাখুজি করেও এইরূপ মাজারের কোন হদিস এখানে পাওয়া যায় না। এই মাজার সংলগ্ন বাড়ীর লোকেরা খোন্দকার বংশীয় এবং তারা তার বংশধর বলে দাবি করেন। লোক মুখে জানা যায় যে এবং অলি হয়েই জন্ম গ্রহণ করেছিলেন। বাল্য অবস্থায় তিনি অনেক কেরামতি দেখাতে শুরু করেন। কিশোর বয়সে তিনি স্থানীয় একটি মাদ্রাসায় লেখা-পড়া করতেন। একদিন সকালে পড়াশুনা করার সময়ে মক্তবে এসে তার ওস্তাদ দেখেন যে সে হাতুনদীর ওপারে গিয়ে খেলা করছে। তিনি এর জন্য বেশী রাগান্বিত হয়ে তাকে জল্দি পার হয়ে চলে আসতে বললেন ও অন্য

www.pathagar.com

একটি ছাত্রের নিকট ওজুর পানি চান। কিন্তু ওজুর পিড়িতে বসেই দেখেন যে সে শিশু গরিব শাহ্‌ই তাঁর জন্য ওজুর পানি নিয়ে এসেছে। এই ঘটনা দেখে ওস্তাদ তাজ্জব হয়ে যান। এই ঘটনা জানাজানি হয়ে গেলে তিনি আর মাদ্রাসায় আসেননি। তাঁকে জীবিত দেখেছেন এমন লোক আজও জীবিত আছেন। কাজেই এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে যশোরের গরিব শাহ্‌ ও নওহাটীর এই গরিব শাহ্‌ এক ও অভিন্ন ব্যক্তি নন।

তারপর হযরত পীর খানজাহান আলী (রঃ) এই মুরলি কশবাতে অবস্থান কালেই ইসলাম প্রচারের জন্য তাঁর প্রিয় শিষ্য বুড়ো খাঁকে (আসল নাম বোরহান খাঁ) দক্ষিণাঞ্চলে সুন্দরবনের দিকে প্রেরণ করেন ও হুজুরের নির্দেশ মোতাবেক কিছু সংখ্যক অনুগামী সহ তিনিও রাস্তা নির্মাণ করতে দক্ষিণাভিমুখে অগ্রসর হতে থাকেন। এই একই সময় তিনি নিজে অন্য সকল মুরিদগণ ও অনুগামীসহ দক্ষিণ-পূর্ব দিকে অগ্রসর হতে থাকেন। তারপর বিদ্যানন্দকাটি পর্যন্ত রাজপথ নির্মিত হবার পর তিনি এখানে চলে আসেন ও কিছুদিন অবস্থান করেন। এটি তাঁর তৃতীয় মঞ্জিল বলে জানা যায়। এখানেও তিনি কয়েকটি মসজিদ ও তৎসংলগ্ন কয়েকটি দীঘি খনন করেন। পীর খানজাহান আলী সম্পর্কে এমনি একটি প্রবাদ আছে যে তাঁর এই যাত্রার পথে যেখানে নামাজের ওয়াক্ত হয়েছে সেখানেই তিনি একটি দিঘী খনন করেছেন ও একটি মসজিদ নির্মান করেছেন। তিনি তার সঙ্গী অনুগামীদের দুইভাগে ভাগ করে দুই কাজে নিয়োজিত করতেন এবং নিজেই বিসমিল্লাহ্‌ বলে কাজ দুটি আরম্ভ করে দিতেন দেখা যেত নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কাজ দুটি সমাপ্ত হয়ে গিয়েছে। এই ঠিক ছিল তাঁর বিশেষ কেরামতি। তাঁর চলার পথের এই মসজিদগুলি প্রায় সবই একগুম্বজ বিশিষ্ট এবং আকারে ছোট। তাঁর অনুগামীদের মধ্যে সেরা সেরা ভাস্কর ও শিল্পী ছিলেন। তাঁরা একদিকে যেমন ছিলেন সৈনিক ও যোদ্ধা অন্যদিকে দিকে ছিলেন কর্মঠ দেশ সেবক ও পরহিতৈষী। তাঁর এই অসংখ্য অনুগামী আমাদের

www.pathagar.com

পীর সাহেবদের অনুগামীদের মত শুধু লম্বা জামা পরে, শুধু হুজুরের সেবায় নিয়োজিত থেকে, তাঁর চারিপাশে ভীড় জমায় বসে বসে খেয়ে তাঁর অন্ন ধ্বংশ করতেন না বা শুধু আল্লার জেকের করেই সকল সময় অতিবাহিত করে দিতেন না। তাঁর অনুগামীরাই নিজ হাতে জঙ্গল পরিস্কার করতেন, ইট তৈরী করতেন, রাস্তা তৈরী করতেন, মসজিদ নির্মাণ করতেন, দীঘি খনন করতেন এবং এই সকল কাজের মাঝেই আল্লার জেকের করতেন।

কথিত আছে তারা যখন কোদাল দিয়ে দীঘির মাটি কাটতেন তখন একটা গুঞ্জন ধ্বনি শোনা যেত। অল্প সময়ের মধ্যে দীঘিটি খনন করা হ'য়ে যেত বলে লোকে এটাকে একটি ভৌতিক কাণ্ড বলে মনে করতো। এই গুঞ্জন ধ্বনি অন্য কিছু নয় এটি ছিল কর্মের মাঝে আল্লার জেকেরের ধ্বনি দীঘির মাটি কাটবার সময় কোদালের কোপ দেওয়ার সময় তারা বলতেন "লা ইলাহা" মাটি ঝুড়িতে রাখবার সময় বলতো "ইল্লাল্লাহু"। যারা ঝুড়ি বইতেন তারাও ঝুড়ি ধরতে বলতেন "লা ইলাহা' এবং মাথায় তুলে বলতেন ইল্লাল্লাহ। চলতে চলতে ডান কদমে লা ইলাহা বাম কদমে ইল্লাল্লাহ জেকেরের মধ্যে তাঁরা পথ চলতেন। তাঁদের কাজের একাগ্রতা ও অগ্রগতি ছিল অসাধারণ। গল্প শোনা যায় এইভাবে কয়েক ঘন্টার মধ্যে তাঁরা এক একটা দীঘি খনন করে ফেলতেন। সমস্ত কাজই তাঁরা এই পদ্ধতিতে সমাধা করতেন

এদিকে বোরহান খাঁ ওরফে বুড়ো খাঁ পথ মাঝে মনজিল নির্বাচন করে করে ইসলাম প্রচার করতে করতে তাঁর অনুগামীদের সংখ্যা বৃদ্ধি করে ফেলেন এবং তাঁর সমস্ত অনুগামীসহ কপতক্ষ নদীর তীর ধরে রাস্তা নির্মাণ করতে করতে দক্ষিণে বেতকাশি পর্যন্ত অগ্রসর হন ও সেখানেই তিনি তাঁর শেষ আস্তানা স্থাপন করেন। বেতকাশিতে তাঁর বহু কীর্তিরাজী আজও বিদ্যমান রয়েছে।

হযরত পীর খানজাহান আলী (রঃ) বিদ্যানন্দকাটিতে কিছুদিন অবস্থানের

www.pathagar.com

পর তিনি আবার দক্ষিণ দিকে অগ্রসর হ'তে থাকেন। বিদ্যানন্দকাটিতে অবস্থানকালে তিনি এখানে একটি মসজিদ ও একটি বৃহৎ দীঘি খনন করেন। মসজিদ কালের গর্ভে বিলীন হয়ে গিয়েছে কিন্তু দীঘিটি আজও বিদ্যমান রয়েছে। এই দীঘিটীর দৈর্ঘ্য ২৪০০ ফিট ও প্রস্থ ১০০০ ফিট। এই দীঘির পাড়ে প্রতি বৎসর খানজাহান আলীর (রঃ) নামে আজও মেলা বসে থাকে।

এই স্থান থেকে যাত্রা করে দীর্ঘ পথের মাঝে দেখা যায় তিনি কয়েকটী পান্থশালাও নির্মাণ করেছেন। এখান থেকে দীর্ঘ পথের মধ্যে আর কোন মনজিলের নিদর্শন পাওয়া যায় না। কথিত আছে যারাই হযরত খানজাহান আলী (রঃ) মুরিদ হতেন তারাই সৈনিক হিসাবে অস্ত্র ধারণ করতেন এবং মুরিদ হবার সময় তারা ইসলামের আদর্শ ও জনসেবায় আত্মনিয়োগের মন্ত্রে দীক্ষিত হতেন। কিন্তু কিছু সংখ্যক মুরিদ তাঁর অনুগামী না হতে চাওয়ায় তাদের তিনি এখানেই বসবাস করার নির্দেশ দেন। এই স্থান পরিত্যাগ করার সময় তিনি জুগনু খাঁ অথবা জাহাঙ্গীর খাঁ নামক এক বিশিষ্ট ব্যক্তির উপর এই স্থানের দায়িত্বভার অর্পণ করে যান এবং তিনি এদের প্রতি তাঁকে বিশেষ নজর রাখার নির্দেশ দেন। জানা যায় যে পথিমধ্যে যারা ক্লান্ত হ'য়ে পড়তো তাদের তিনি সেখানেই বসবাসের নির্দেশ দিতেন এবং তিনি নিজে সমস্ত কাজে সকলের সহিত সক্রিয় অংশ গ্রহণ করতেন।

এইবার এখান থেকে তিনি তাঁর ছাউনি তুলে পূর্ব দিকে রওনা হন এবং পয়গ্রাম নামক স্থানে এসে তাঁর পরবর্তী মনজিল স্থাপন করেন। এখানে তিনি তাঁর যাত্রাপথের সবচেয়ে দীর্ঘ সময় অবস্থান করেন, ফলে এখানে একটী শহর গড়ে ওঠে। এই শহরকে তিনি পয়গ্রাম কসবা নামে অভিহিত করেন। আজও এই স্থানের নাম পয়গ্রাম কসবা বলে পরিচিত রয়েছে। বিদ্যানন্দকাটী ও পয়গ্রাম কসবা ছাড়াও সরফরাজপুরেও শোনা যায় তিনি একটী আস্তানা স্থাপন করেছিলেন এবং সেখানে দায়িত্বভার তিনি সরফরাজ খাঁ ও জাফর খাঁর উপর অর্পণ করে যান। তাঁরা মির্জাপুরে ও গোপালপুরে

www.pathagar.com

বেশ কয়েকটি মসজিদ নির্মাণ করেছিলেন হযরত খানজাহান আলীর (রঃ) নির্দেশ মোতাবেক এই মসজিদগুলি তৈরী করা হয়। এই মসজিদগুলির ধ্বংশাবশেষ আজও বিদ্যমান রয়েছে। এই মসজিদগুলি বাগেরহাটে তাঁর নির্মিত মসজিদেরই অনুরূপ।

হযরত পীর খানজাহান আলীর (র) আর একজন অনুগামী পথি মধ্যে পরিত্যক্ত হওয়ার দুঃখে, গোপালপুর হ'তে বেশ কিছু দূরে একটী লোকালয় শূন্য স্থানে এসে আস্তানা স্থাপন করেন। ক্রমে ক্রমে তিনি ইসলাম প্রচার করতে শুরু করেন এবং স্থানীয় লোকজন তার মুরিদ হ'য়ে পড়ে। বহু হিন্দু সম্প্রদায় তাঁর ভক্ত হয়ে পড়ে এবং পরবর্তীকালে তারা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করার ফলে কোন অনিবার্য কারণ বশতঃ তিনি তাদের তাঁর আস্তানার চতুঃপার্শে বসতি স্থাপন করার অনুমতি দেন। ইনি পীর মেহেরউদ্দিন খান ওরফে মেহের খাঁ বলে পরিচিত ছিলেন। তিনি একজন কামেল লোক হিসাবে এখানে বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। পরবর্তীকালে তাঁর নাম অনুসারে এই স্থানের নাম হয় মেহেরপুর। এই গ্রামে এখনও পীর মেহের উদ্দিনের মাজার বিদ্যমান রয়েছে।

অন্য দিকে তাঁর আর একদল উৎসাহী মুরিদ খানপুর ও বিদ্যানন্দকাটী হতে একটি পাকা রাস্তা নির্মাণ করতে করতে দক্ষিণ দিকে অগ্রসর হয়ে মজিদকুড ও আমাদি হয়ে রাস্তাটিকে বেদকাশি পর্যন্ত নিয়ে যান। এই রাস্তাটির নির্মাণ কৌশল দেখে রাস্তাটি তৈরী সম্পর্কে দ্বিমত পোষণ করে বলা হয় যে তিনি গৌড়ের সুলতানদের প্রতিনিধি নির্বাচিত হওয়ার পর রাজসনদ প্রাপ্ত হয়ে যখন এই অঞ্চলের শাসনভার গ্রহণ করেন তখন তিনি এই রাস্তাটি নির্মাণ করিয়েছিলেন। উপরোক্ত নির্মিত পথের পাশে অবস্থিত তালা থানার অন্তর্গত ভাঙ্গনতলা গ্রামে হযরত খানজাহান আলী (রঃ)র কয়েকজন মুরিদ বসতবাটি নির্মাণ করে তথায় বসবাস করতে থাকেন এবং পার্শ্ববর্তী অঞ্চল সমূহে ইসলামের আদর্শ প্রচার করতে থাকেন। পীর খানজাহান আলী (রঃ)

www.pathagar.com

নির্দেশেই তাঁরা এখানে বসতি স্থাপন করেছিলেন। এরই অনতিদূরে আটরই গ্রামে তাঁরা তিন গুম্বজ বিশিষ্ট একটি মসজিদ নির্মাণ করেন ও একটি প্রকাণ্ড দীঘি খনন করেন। এই দীঘিটি ... -হাজীদীঘি নামে পরিচিত। দক্ষিণ বেদকাশিতে বড় বাড়ী নামক স্থানেও তাঁদের কীর্তি ধ্বংশাবশেষ আজও বিদ্যমান রয়েছে।

এই আটরই গ্রামে একটি প্রকাণ্ড মাটির ঢিবি ও কতকগুলি অপেক্ষাকৃত ছোট ছোট মাটির ঢিবি রয়েছে। এগুলি সমান্য খুড়লেই মাটির নীচ থেকে অসংখ্য ইট বেরিয়ে আসে। স্থানীয় লোকের কাছ থেকে জানা যায় যে এগুলি হযরত খানজাহান আলীর মুরিদগণের বশতঃ বাটির ধ্বংশাবশেষ বলে তাঁরা বহু কাল ধরে শুনে আসছেন। তালা থানার অন্তর্গত ভায়রা গ্রামে আর একটি প্রকাণ্ড দীঘি আছে। এখানেও প্রবাদ আছে যে পীর খানজাহান আলী (রঃ) জীনদের দ্বারা এক রাত্রে এই দীঘি খনন করিয়েছিলেন। এইরূপ প্রবাদ প্রায় তাঁর প্রতিটি দীঘি সম্পর্কে রয়েছে। কিন্তু এ কথা সত্য নয়। তাদের সবার সম্মিলিত প্রচেষ্টার ফলেই প্রতিটি দীঘি খনন করা হয়েছে। এখানে বারোহাটি ও সোলায়মানপুর গ্রামে একটি দীঘি ও একটি মসজিদের ধ্বংশাবশেষ বিদ্যমান রয়েছে। কথিত আছে খানজাহান আলীর সুযোগ্য মুরিদ বোরহান খাঁ ও তাঁর সুযোগ্য পুত্র ফতে খাঁ এই দীঘি ও মসজিদ নির্মাণ করেছিলেন।

বোরহান খাঁ ওরফে বুড় খাঁ ও তৎপুত্র ফতে খাঁ আমাদি নামক স্থানকে তাঁদের কর্মস্থানের উপযুক্ত জায়গা বিবেচনা করে তথায় বাসস্থান নির্মাণ করেন। বোরহান খাঁর পুত্র ফতে খাঁও পিতার আদর্শে আদর্শবান হয়ে ওঠেন ও পিতা পুত্র মিলে আশে পাশের বিভিন্ন অঞ্চল সমূহে ইসলাম প্রচার করতে থাকেন। পরবর্তীকালে কোন কারণ বশতঃ হযরত খানজাহান আলী (রঃ) আরও অনেক মুরিদ এদের সঙ্গে যোগ দেন। বোরহান খাঁ ও ফতে খাঁ দীর্ঘদিন ধরেই এই দক্ষিণাঞ্চলে ইসলাম প্রচার করেন।

www.pathagar.com

এদিকে হযরত খানজাহান আলী ততদিনে পয়গ্রাম কসবার বিখ্যাত ঠাকুর পরিবারের বৃহৎ অংশকে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করিয়ে ও পথিমধ্যে ইসলাম প্রচার করতে করতে বাগেরহাটে পৌঁছে গিয়েছেন ও খলিফাতাবাদ রাজ্যের পত্তন করেছেন। তাঁর পরবর্তী মঞ্জিলের মধ্যে সেনের বাজার ও তালিমপুরের মত এত বড় মঞ্জিল ও আস্তানা অন্য কোথাও ছিল বলে জানা যায় না। পয়গ্রাম কশবা থেকে খুলনার সেনের বাজার, তালিমপুর, সামন্তসেনা, রাংদিয়া, পিলজঙ্গ হয়ে ষাটগুম্বজ ও বাগেরহাট পৌঁছাতে তাঁকে অনেক বাধা বিপত্তির সম্মুখীন হ'তে হয়েছিল। সে কাহিনী পরে বর্ণনা করছি।

দক্ষিণ খুলনায় ইসলাম প্রচারের ঘটনাবলীতে দেখা যায় যে বুড়া খাঁ ও তৎপুত্র ফতে খাঁ ঐ সময় ইসলাম প্রচার করতে গিয়ে এক মারাত্মক বাধার সম্মুখীন হন। বসিরহাটের প্রতাপশালী হিন্দু জমিদার বা রাজবংশ এই বাধার সৃষ্টি করেন। বিষয় গুরুতর ও জটিল আকার ধারণ করলে পিতা পুত্র উভয়েই খলিফাতাবাদ শহরে হযরত খানজাহান আলীর (রঃ) সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে আসেন। শোনা যায় যে তাঁরা খানজাহান আলীর (রঃ) নিকট থেকে শক্তি সঞ্চয় করে আবার দক্ষিণাঞ্চলে ফিরে যান ও রাজশক্তিকে পরাজিত করে তাঁরা দক্ষিণাঞ্চলের শাসনভার গ্রহণ করেন। তাঁরা একাধারে ছিলেন শাসক ধর্মপ্রচারক ও পীর। হযরত খানজাহান আলীর (রঃ) নির্দেশ মোতাবেক তাঁরা দক্ষিণাঞ্চল শাসন করতেন। এই আমাদিতে ফাতেখাঁর খোদিত কয়েকটি দীঘি আজও বিদ্যমান রয়েছে। এই বেদকাশিতে বোরহান খাঁ একটি বাৎসরিক ইছালে ছওয়াবও করতেন। এই ইছালে ছাওয়াবের দিনে হযরত খানজাহান আলী (রঃ) সেখানে উপস্থিত থাকতেন বলে শোনা যায়। চাল ধোয়া এবং ডাল ধোয়া নামে দুটি দীঘি আজও এই স্মৃতি বহন করে রয়েছে। এই ইছালে ছওয়াবে যত লোক উপস্থিত হোত সবাইকেই খাবার পরিবেশন করা হোত। এই উপলক্ষে এত ডাল ও চাল ধোয়ার প্রয়োজন

www.pathagar.com

হোত যে তাঁর জন্য পৃথক পৃথক দুটি দীঘি খনন করতে হয়েছিল। এই দীঘির পানি আজও সুপেয় পানি হিসাবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

বোরহান খাঁ ও ফতে খাঁ আমাদি গ্রামে নয় গুম্বজ বিশিষ্ট একটি বিরাট মসজিদ নির্মাণ করেন। তাঁদের মৃত্যুর পর যে কোন কারণে স্থানটি প্রায় জনবসতি শূন্য হয়ে পড়ে। ফলে এই স্থানটি এক সময় জঙ্গলাকীর্ণ হয়ে পড়ে এবং মসজিদটি প্রায় মাটির নীচে চাপা পড়ে যায়। বর্তমানে জনসাধারণ ও পরে সরকারী প্রচেষ্টায় মসজিদটি মাটির তলদেশ থেকে উদ্ধার করা হয়েছে এবং সরকারীভাবে এটি রক্ষণাবেক্ষণ করা হয়। বর্তমানে এখানে নিয়মিত নামাজ আদায় করা হয়। এই মসজিদটির অনেক কিছু ধ্বংসপ্রাপ্ত হলেও এটি যে অন্যান্য মসজিদের মত কারুকার্য খচিত ছিল তার বহু নিদর্শন আজও বিদ্যমান রয়েছে। এর চার কোণে চারটি মিনার ও পশ্চিম দিকে মেহরাব রয়েছে। এই মসজিদের কোন স্থানে আরবী শিলালিপি রয়েছে তার সবই কোরআনের বিভিন্ন আয়াত ছাড়া অন্য কিছুই নয়।

তাঁরা পিতা পুত্র দুজনেই ছিলেন খোদা প্রেমিক। তাঁরা এই অঞ্চলে একদিকে যেমন ইসলামের উৎকর্ষ সাধন করেছিলেন অন্যদিকে জাতিধর্ম নির্বিশেষে এই অঞ্চলের জনসাধারণ তাদের দ্বারা বিশেষভাবে উপকৃত হয়েছিল। কেউ কেউ বলেন বুড়ো খাঁ এখানেই মৃত্যুমুখে পতিত হন কিন্তু তাঁর মাজার এখানে দেখা যায় না। এই বেদকাশি অঞ্চলে আর একটি দীঘি দেখা যায় যার নাম খালেদ খাঁর দীঘি। কিন্তু এই খালেদ খাঁ কে ছিলেন তার সম্পর্কে কিছুই জানা যায় না। অনেকে বলেন তিনি বুড়ো খাঁরই পুত্র ছিলেন। তিনি অকালে মৃত্যুবরণ করেছিলেন বলে তাঁর নামে বুড়ো খাঁ এই দীঘি খনন করিয়ে তাঁর স্মৃতিটিকে অমর করে রেখেছিলেন। আবার কেউ কেউ বলেন ইনি পীর খানজাহান আলী (রঃ) র একজন সুযোগ্য মুরিদ ছিলেন। কিন্তু প্রথম তথ্যটি বিশেষ গ্রহণযোগ্য বলে মনে হয়। এইরূপে হযরত পীর খানজাহান আলীর (র) মুরিদগণ সুন্দরবনের শেষ সীমান্ত পর্যন্ত

www.pathagar.com

ইসলাম প্রচারে ছড়িয়ে পড়েছিলেন।

হযরত পীর খানজাহান আলী (রঃ) পায়গ্রাম কসবায় বেশ কিছুদিন অবস্থান করার ফলে এই শহর বা কসবা বেশ সমৃদ্ধশালী হয়ে ওঠে। তার এই শহরে অবস্থান কালেই ইতিহাস বিখ্যাত পীরালি ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ের উৎপত্তি হয়। কথিত আছে এইখানে নাগরনাথ ও দক্ষিণানাথ নামে দুই প্রবল পরাক্রমশালী হিন্দু সামন্ত ছিলেন। নাগরনাথ ছিলেন নিঃসন্তান। দক্ষিণানাথের ছিল চার পুত্র কামদেব, জয়দেব, রতিদেব ও শুকদেব। এদের মধ্যে কামদেব ও জয়দেব কোন এক মুহূর্তে হযরত খানজাহান আলী (রঃ) হাতে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে মুসলমান হয়ে যান। তারা যেহেতু কুলিন শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ ছিলেন সেই হেতু আর গৃহে প্রত্যাবর্তন না করে তার সহচর্যে থেকে যান ও প্রচার করেন যে তারা খানজাহান আলী (রঃ) র অধীনে চাকুরী গ্রহণ করেছেন। কামদেব ও জয়দেবের মুসলমান নাম রাখা হয় কামালুদ্দিন জামালুদ্দিন। এছাড়াও গোবিন্দলাল রায় নামক তৎকালীন হিন্দু সমাজের শীর্ষস্থানীয় আরও একজন বিচক্ষণ ও পাণ্ডিত কায়স্থ, ব্রাহ্মণ তার কাছে ইসলামধর্ম গ্রহণ করেন। লোকের কাছে তিনি গোবিন্দ পণ্ডিত বা গোবিন্দ ঠাকুর বলে পরিচিত ছিলেন। ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করার পর তার নাম রাখা হয় মোহাম্মদ আবু তাহের। এই মোহাম্মদ আবু তাহেরই পরবর্তীকালে স্বীয় প্রতিভাবলে হযরত পীর খানজাহান আলী (রঃ)র প্রধান মন্ত্রীপদে নিয়োজিত হয়েছিলেন। ইতিহাসে দেখা যায় এই গোবিন্দ ঠাকুরের প্রভাবেই তৎকালে কয়েকটি বৌদ্ধ ও হিন্দু সম্প্রদায় একই সময় ইসলামধর্ম গ্রহণ করেছিল যার ফলে নবদ্বীপের ব্রাহ্মণগণ তার উপর ক্রোধে ফেটে পড়েছিল। দেখা যায় জয়দেব কামদেব ও গোবিন্দ ঠাকুরের প্রভাবে আরও যে সমস্ত ব্রাহ্মণগণ ইসলামধর্ম গ্রহণ করেছিলেন তৎকালীন হিন্দু সম্প্রদায় তাদের পীর আলি মুসলমান নামে অভিহিত করেছিল। এবং এই সকল ব্রাহ্মণদের যে অংশ ইসলামধর্ম গ্রহণ না করে হিন্দুই থেকে যায় তারাও যবন দোষে দুষ্ট বলে হিন্দুগণ তাদের পীর

www.pathagar.com

আলি ব্রাহ্মণ নামে অভিহিত করে তাদের সমাজ বহির্ভূত করে রেখেছিল। এদের পীর আলি কায়স্থও বলা হোত। এই ভাবে হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রদায়ের ভিতর পীর আলী সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হয়। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পূর্ব পুরুষগণ গোবিন্দ ঠাকুরের সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন বলে তারাও পীরালী ব্রাহ্মণ গোত্র বলে আখ্যায়িত ছিলেন।

কথিত আছে যে হযরত পীর খানজাহান আলী (রঃ) ও তার মুখমন্ত্রী মোহাম্মদ আবু তাহের ৬ মাসের বা সামান্য কিছু দিনের ব্যবধানে একই বছরে মৃত্যু বরণ করেন। পীর খানজাহান আলী (রঃ) কে দাফন করেন মোহাম্মদ আবু তাহের এবং মোহাম্মদ আবু তাহেরকে দাফন করেন তার আপন ভ্রাতা মোহাম্মদ আবু মোতাহের মোহাম্মদ তাহেরের ইসলামধর্ম গ্রহণ করার পর যখন ব্রাহ্মণদের সঙ্গে তিনি সাক্ষাৎ দ্বন্দ্ব সংঘাতে লিপ্ত হন তখন তার ভ্রাতা অরবিন্দু ঠাকুর ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে ভাইয়ের পক্ষ সমর্থন করেন ও মোহাম্মদ মোতাহের নাম ধারণ করেন। আবার তার ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করার ব্যাপারে একটি সুন্দর গল্পও প্রচলিত রয়েছে। গল্পটি এইরূপ যে মোহাম্মদ তাহেরের ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করার পূর্বে দুই ভাইয়ের মধ্যে বেশ মিল মহব্বত ছিল। মোহাম্মদ তাহেরের ইসলাম গ্রহণ করার পর তাদের মিল মহব্বত ও পূর্বের ন্যায় বিদ্যমান ছিল। এই নিয়ে তাদের সমাজে অনেক আলোচনার সৃষ্টি হয়। তখন অরবিন্দ ঠাকুর বলেন যে দেখ তোমরা, ভাইকে আমি নিশ্চয়ই ফিরিয়ে নিয়ে আসব, দাদা আমাকে খুব ভালবাসে। এর পর একদিন রমজানের সময়ে মোঃ তাহের বিকালে একটি ফুলের বাগানে ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন। এই সময় তার ছোট ভাই সেখানে উপস্থিত হয়ে তাকে বললেন, "দাদা তোমার রোজা তো নষ্ট হ'য়ে গিয়েছে।" তিনি জিজ্ঞাসা করলেন কেন? সে উত্তর করল, তুমিই তো বলতে ঘ্রাণ অর্ধভোজন আর তুমি ফুলের ঘ্রাণ নিয়েছ। কাজেই তোমার অর্ধভোজন হ'য়ে গিয়েছে। তোমার রোজা নষ্ট হয়েছে, তুমি ঘরে চলে আস। এই কথায় তিনি একটু হেসে তাকে অন্য একদিন

www.pathagar.com

অাসতে বললেন। তার ভ্রাতা কিছুদিন পরে আবার তার দাদার কাছে এসে হাজির হলেন সেইদিন তার আস্তানায় গরুর গোস্ত পাক হচ্ছিল। তার ভাই গোষ পাকের গন্ধ পেয়ে সঙ্গে সঙ্গে নাক ধরে জিজ্ঞাসা করলেন কিসের মাংস পাক হচ্ছে দাদা? দাদা উত্তর করলেন গোষ পাকের গন্ধ যখন পেয়েই গিয়েছ তখন নাক ধরে আর লাভ নেই কারণ ওটা গরুর মাংসই পাক হচ্ছে। গরুর মাংস যখন তোমার অর্ধেক ভোজন হয়েই গিয়েছে তখন প্রায়শ্চিত্য করে আর লাভ নেই, তুমি আর সমাজে উঠতে পারবে না। তার থেকে তুমি আমার সঙ্গে মুসলমান হ'য়ে যাও। তখন তার ভাই উপান্তর না দেখে অনেক চিন্তার পর দাদার কথায় রাজী হয়ে যান এবং তখনই হযরত খানজান আলী (রঃ) হাতে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন এবং তিনি তার নাম রাখেন মোহাম্মদ আবু মোতাহের।

এই প্রখ্যাত মোঃ আবু তাহের ও মোঃ মোতাহের যে স্থানে জন্মগ্রহণ করেছিলেন সেই স্থান আজও পীরালী বা রূপান্তরে পোড়ালি নাম ধারণ করে আজও তার স্মৃতি বহন করছে। যেহেতু তিনি পীরের কাছে মুরিদ হয়েছিলেন, তাই হিন্দুরা তাকে পীরালী উপাধিতে ভূষিত করেছিল। তারা ঘৃণার সহিত তাকে এই উপাধি দিয়ে বুঝাতে চেয়েছিল এবং লোককে জানাতে চেয়েছিল যে সে আসল মুসলমান নয়। কিন্তু ইসলাম গ্রহণ করার পর পীরের সহচর্যে থেকে আল্লার এবাদতে তিনি প্রায়ই মশগুল থাকতেন। ফলে তিনি এতখানি উদার ভাবাপন্ন হয়ে ওঠেন যে তাদের দেওয়া এই ঘৃণ্য উপাধিটিকে অচিরেই গর্বের সঙ্গে তার নামের সঙ্গে যুক্ত করে ব্যবহার করতে থাকেন এবং সকলের নিকট পীরালী মোহাম্মদ তাহের বলে পরিচিত হন। তিনি মুসলমান হওয়ার পরও হিন্দু সমাজে তার বিশেষ প্রতিপত্তি ছিল বলে শোনা যায়। তৎকালে তিনি ছিলেন হিন্দু শাস্ত্র ও বিধান সমূহের বিখ্যাত পণ্ডিত ও জ্যোতিষি। তাই সে সময়ও হিন্দুরা তার কাছে আসতেন ও তার পরামর্শ দেওয়া বিধান মোতাবেক সমাজের সকল কাজ পরিচালনা করতেন।

www.pathagar.com

সমাজে কোনরূপ বিঘ্ন ঘটলে বা কোন কঠিন সমস্যার উদ্ভব হ'লে তারা এই পীরালীর কাছেই ছুটে আসতেন। কিন্তু সে সব হিন্দু পুরোহিতগণ তার কাছে প্রকাশ্যে বা গোপনে আসতেন, তৎকালীন গোড়া হিন্দু সমাজ, যবন দোষে দুষ্ট বলে তাদেরও সমাজচ্যুত করতে দ্বিধা করে না। তারা পুরোহিত হলেও মূর্খ হিন্দুদের তাদের প্রতি এইরূপ আচরণকে তারা গ্রাহ্যই করেন না এবং মজার ব্যাপার এই যে এই জানি পুরোহিতগণও যখন পীরালি ব্রাহ্মণ নামে আখ্যায়িত হলেন, তখন তারা গোড়া ব্রাহ্মণ সমাজের এই ব্যবস্থাকে অগ্রাহ্য করে, গোবর খেয়ে প্রায়শ্চিত্ত না করে, তাদের বুড়ো আঙুল দেখিয়ে "পীরালী থাক" নামে একটা আলাদা সমাজ খাড়া করেন ও তাদের সমাজে কঠোরভাবে মোকাবেলা করতে থাকেন। এই পীর আলী থাক সমাজের মধ্যে তৎকালী সমস্ত হিন্দু পণ্ডিত ও পুরোহিত ব্যক্তিরাই যুক্ত হয়ে পড়েছিলেন।

ঐসব সাধারণ শিক্ষিত ও গোড়া হিন্দুদের রুচিত গ্রাম্য গানে প্রবাদের মত তা আজও ছড়িয়ে রয়েছে পীরালী ব্রাহ্মণদের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বীতার যখন তারা পরাজিত হতে থাকে তখন তারা তাদের ব্যঙ্গ করার জন্য গান রচনা করে—

'মুসলমানের গোস্ত ভাতে
দিন গেল তোর পথে পথে
ওরে ও—ও পীরালী বামুন।"

এই সমাজের এই সময়ের ইতিহাস ও ছোট ছোট ঘটনাবলী বড় কৌতুহলজনক কিন্তু সমসাময়িক মুসলিম ইতিহাস এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ উদাস। তারও কারণ এই যে সব ঘৃণ্য দ্বন্দ্ব কলহ রাজকীয় ঘটনাবলীর পর্য্যায়ে পড়েনা বলেই তাদের লিখিত ইতিহাসের মধ্যে এর কোন উল্লেখ নেই। কিন্তু মধ্য যুগের ইতিহাস পর্য্যালোচনাকালে বৈষ্ণব আন্দোলনের ইতিহাসে দেখা যায় যে বৈষ্ণবগণ ভীষণ আক্রমণের সহিত এই পীরালী মুসলমানদের সঙ্গে দ্বন্দ্ব সংঘাতে

www.pathagar.com

লিপ্ত হয়েছিলেন। বৈষ্ণব ধর্মে দীক্ষিত না হয়ে তারা কেন যবনের ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করল, এই আক্রশেই তারা তাদের আক্রমণ করে হত্যা করতে চেয়ে ছিলেন অথচ পীরালী হিন্দুদের তারা কিছুই বলেন না। এর একমাত্র কারণ এই যে পীরালী মুসলমানগণ পীরাল্যা গ্রামে থেকে এত ব্রাহ্মণ ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করেছিল যে নবদ্বীপের ব্রাহ্মণ সমাজই ধ্বংশ হবার পথে উঠেছিল। এ ব্যাপারে বৈষ্ণব ভগবতকার অভিযোগ করে বলেন যে,—

পীরাল্যা গ্রামেতে বৈসে যতেক যবন
উচ্ছেদ করিল নবদ্বীপের ব্রাহ্মণ।

ভগবতকারের মতে এই বিষম পীরাল্যা গ্রাম নবদ্বীপের আড়ে অবস্থিত।

"যে গ্রামেতে নবদ্বীপের হোল সর্বনাশ" কিন্তু বলাবাহুল্য পীরালী মুসলমানদের সঙ্গে বৈষ্ণবদের এই দ্বন্দ্ব সংঘাত খানজাহান আলীর (রঃ) জীবদ্দশায় ঘটে নাই। ইতিহাসে এমন কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না বা প্রচলিত প্রবাদের মধ্যেও আজও এমন কোন ঘটনা শোনা যায় নাই। পীরালী মুসলমানদের সঙ্গে বৈষ্ণবদের এই সংঘাত ঘটেছিল তার মৃত্যুর পর তার অনুগামীদের সঙ্গে জানা যায় যে সেই সময় তখনকার সমাজচ্যুত পীরালী ব্রাহ্মণগণ সুযোগ বুঝে ধর্মান্তর গ্রহণ না করেই মুসলমানদের সঙ্গে এক হ'য়ে গোড়া ব্রাহ্মণদের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ গ্রহণে ব্রতী হল। যে কারণে নবদ্বীপের ব্রাহ্মণগণ ভীষণভাবে পর্যুদস্ত হয়। এই সকল শক্তিশালী পীরালী ব্রাহ্মণদের সমর্থনে পরবর্তীকালে রাজা রামমোহণ রায় ব্রাহ্মণ ধর্মের প্রবর্তন করেন যার মূল ছিল ইসলামী আদর্শ ভিত্তিক, একেশ্বরবাদ। হিন্দুধর্ম শাস্ত্র দিয়েই তারা এই কথাই প্রমাণ করেন যে হিন্দু ধর্মের মূল মন্ত্র এই একেশ্বরবাদ কিন্তু এই ধর্ম আজ কুসংস্কারে আচ্ছন্ন। জোড়াশাকো ঠাকুর বাড়ীও এই পীরালী সম্প্রদায়ভুক্ত ছিল বলে তারা ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করে ব্রাহ্ম সমাজের শীর্ষস্থানীয় ছিলেন। বলাবাহুল্য রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরও এই ব্রাহ্ম ধর্মাবলম্বী ছিলেন।

মোহাম্মদ তাহেরের কারনে ইসলামের অগ্রগতি ও পীরালী সম্প্রদায়

www.pathagar.com

সম্পর্কে বলতে গিয়ে মূল কাহিনী থেকে একটু দূরে এসে পড়েছি। হযরত খানজাহান আলীর (রঃ) গমণ পথেরও কীর্ত্তিরাজীর চিহ্ন ধরে দেখা যায় কোন এক সময় হয়তো তিনি ভৈরব নদী পার হয়ে উত্তর দিকে কিছু দূর অগ্রসর হন। এই সময় তিনি ভৈরব নদীর উপর একটি শাকো নির্মাণ করেন। যে কারণে ভৈরবের ঐ কূলবর্তী স্থানের নাম হয় সদর বা যশোর। এই শাকো পার হয়ে উত্তর দিকে কিছুদূর অগ্রসর হবার পর যে কোন অনিবার্য কারণ বশতঃ তিনি তার গতিপথ পরিবর্ত্তন করেন। জনাব আবদুল রহিম সাহেবের ভাষায়, "কোন এক অজ্ঞাত কারণ বশতঃ তিনি তার গতিপথ পরিবর্ত্তন করেন।" কিন্তু এই অজ্ঞাত কারণ সম্পর্কে অনুসন্ধান করে এবং এক দীর্ঘ আলোচনার মাধ্যমে এই মতামত গ্রহণ করা হয় যে নিশ্চিয় তিনি রাজা গণেশের পলাতক সৈন্যবাহিনীর হটাত আক্রমণের সংবাদ পেয়েই তার গতিপথ পরিবর্ত্তন করেছিলেন। দূরদর্শিতার দ্বারা তিনি এ কথা উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন যে এই কাফের বাহিনী একদিন তাকে আক্রমণ করবেই। তাই তাদের মোকাবেলা করে চিরতরে খতম করতে না পারলে এদেশে মুসলম নগণ আবার অত্যাচারিত হবে এবং একদিন ইসলাম বিপন্ন হয়ে পড়বে। তাই যখন তিনি জানতে পাড়লেন যে এই কালো বাহিনী সুন্দরবনের "খাদি" অঞ্চলেরও ভাটিতে মগরাজের আশ্রয় থেকে আরও শক্তি সঞ্চয় করছে তখন তিনি তার গতিপথ পরিবর্ত্তন করে বাগেরহাট অভিমুখে রওনা হলেন। জানা যায় যে বাগেরহাট অতিক্রম করে তিনি আর অগ্রসর হননি এবং এটিই ছিল তার শেষ মনজিল। তবে তিনি এবং তার সৈন্য সামন্তসহ নৌকার সাহায্যে জলদী দাড় টেনে বাগেরহাট নদী পার হয়ে নদীর ওপারে একটি যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছিলেন এবং জয়লাভ করেছিলেন। আমার মনে হয় এই কারণেই বাগেরহাটের নদীটার নাম দাড়টানা বা দড়াটানা নদী হয়েছে।

হযরত পীর খানজাহান আলী (রঃ) তার গতিপথ পরিবর্ত্তন করে বাগেরহাট পর্যন্ত খুব সহজ ভাবে পৌছাতে পারেননি। রাজা গণেশের এই

www.pathagar.com

পশ্চাতের সুশিক্ষিত সৈন্যবাহিনী সম্পর্কে তিনি সর্বদা সজাগ ছিলেন বলে তিনি কোন সময়ই তার পিছন দিকে অরক্ষিত রেখে অগ্রসর হননি। সুদূর বেদকাশি পর্যন্ত ইসলাম প্রচারের জন্য লোক প্রেরণের এও একটি উদ্দেশ্য ছিল যে এরা যেন কোন পথেই পার হয়ে গিয়েছিলেন পিছন দিক থেকে তাকে হটাত আক্রমণ করতে না পারে। তাই তিনি এই সুদীর্ঘ ব্যূহ রচনা করেছিলেন।

পরিশেষে তিনি জানতে পারেন যে সেন রাজাদের প্রতিষ্ঠিত খাদি অঞ্চল সমতট ভূমির এই বাগেরহাট অঞ্চলেই অবস্থিত এবং এখানেই ঘাটি স্থাপন করে তারা যুদ্ধের প্রস্তুতি নিচ্ছে। এই সংবাদ অবগত হবার পর তিনি পায়গ্রাম কশবা থেকে তার ছাউনি তুলে পূর্বদিকে রওনা হলেন। জানা যায় কোন এক ভীষণ গোলযোগের কারণে বিশেষ প্রয়োজন বশতঃ অনিচ্ছা সত্ত্বেও পায়গ্রাম কশবার সকল দায়িত্বভার তিনি মোঃ তাহেরের উপর ন্যাস্ত করে আসেন। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যে পীরের দর্শনের জন্য তার মন ভীষণ ব্যস্ত হয়ে পড়ে এবং তিনি আসার জন্য অনুমতি প্রার্থনা করেন। ততদিনে মোঃ তাহের নিজ অধ্যবশায় ও হুজুরের রুহানী ফয়েজের বরকতে আল্লার অলিতে পরিণত হয়েছেন। কিন্তু তবুও তিনি অনুমতি না পেয়ে পরবর্তীকালে নির্দেশ পেলে আসার অপেক্ষায় থাকার নির্দেশ পান।

এই যাত্রায় তিনি বেস কিছুদূর অগ্রসর অগ্র হ'তে পারেন না কারণ বিশাল জনতা ও সৈন্যবাহিনী তার সঙ্গে ছিল। তিনি পায়গ্রাম কশবা হতে রওনা হবে বাসুড়ি নামক গ্রামে উপস্থিত হ'য়ে সেখানে তার আস্তান স্থাপন করেন। শোনা যায় যে এত বড় বাহিনী তার সঙ্গে ছিল যে যখন তিনি বাসুড়ি পৌছান তখন তার কাফেলার শেষ অংশ পায়গ্রাম কশবা থেকে রওনা হয় নাই। এই সময় বহু পীরালী ব্রাহ্মণ জীবনের নিরাপত্তার ভয়ে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেই তার সঙ্গে চলে এসেছিলেন। শোনা যায় ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করার জন্য হযরত খানজাহান আলী (রঃ) কোন সময়ই তাদের কোন প্রস্তাবও দেননি।

www.pathagar.com

এবং কোন এক সময় ব্রাহ্মণ রাখদিয়া নামক স্থানে তাদের পৃথক আবাসভূমির ব্যবস্থা করে দেন।

এই মঞ্জিলে তিনি বেশ কিছুদিন অবস্থান করে এখানে একটি সৈন্য শিক্ষা শিবির স্থাপন করেন। এই স্থানটি আজমগড় নামে পরিচিত। এখানে অবস্থান কালেই তিনি রাস্তা নির্মাণ করতে তার লক্ষ্য স্থল নির্ণয় করতে চেষ্টা করেন। বর্তমানের বাগেরহাট ছিল তখনকার দিনে সুন্দরবনের মধ্য প্রদেশে অবস্থিত এক মগ, তান্ত্রিক, মূর্তিপূজক ও জলদস্যুদের ছিল এটি আবাসভূমি। হযরত খানজাহান আলীর (রঃ) সঙ্গে যুদ্ধ করবার জন্য এই পলাতক বাহিনী এদের দ্বারাও অনেক শক্তি ও সাহায্য প্রাপ্ত হয়েছিল কথিত আছে যে এই অঞ্চলের মগরাজা মুসলমানদের সঙ্গে যুদ্ধ করবার জন্য এমন কি এদের তার হস্তি বাহিনী দিয়েও সাহায্য করেছিল। এর পরবর্তী মঞ্জিলগুলি সম দূরত্বে অবস্থিত দেখা যায়। এই ঘন ঘন মঞ্জিল করার পিছনে তার কয়েকটি উদ্দেশ্য নিহিত ছিল। প্রথম কারণ ছিল ইসলাম প্রচার করে এর ভিত্তিকে সুদৃঢ় করা হয়—মুসলমান বসতি স্থাপন করে পিছনের এলাকা সম্পূর্ণ শত্রুমুক্ত করা ৩য় কার্য করণের মাধ্যমে জনসাধারণের মন জয় করাও ৪র্থ মুরিদদের মধ্য হতে সুশিক্ষিত সৈন্য গঠন এবং জেহাদের জন্য মানসীকভাবে প্রস্তুত করা।

তিনি সেখানেই যখন অবস্থান করেছেন হুবহু রাজনিতিবীদের মত সে স্থানের মানুষের মন তিনি জয় করতে সমর্থ হয়েছেন। অমুসলমানগণও তার কাছে এমন ব্যবহার পেয়েছেন যে যারা একবার তার সান্নিধ্যে এসেছেন তারা আর কখনও তার শত্রু থাকতে পারেননি। এই বাসুড়ি গ্রামে জনসাধারণের জলকষ্ট দূর করার জন্য তিনি ৭০ বিঘা জমির উপর গভীর দীঘি খনন করেন এবং তার চারিদিকেই ঘাট বেধে দেওয়া হয়। এই দীঘির সুউচ্চ পাড় আজও অক্ষুন্ন রয়েছে কিন্তু বাধানো ঘাটগুলি প্রায় ভেঙ্গে গিয়াছে। এই দীঘির পানি আজও স্বচ্ছ রয়েছে। এই দীঘির পাড়ে অনেক ফলের গাছ

www.pathagar.com

লাগানো হয়েছে। প্রতি বৎসর চৈত্র মাসের পূর্ণিমা তিথিতে একই সময় উরুশ উপলক্ষে এখানে খাঞ্জালির মেলা বসে থাকে।

এখানে কিছুদিন অবস্থান করার পর তিনি তার এখানকার ছাউনি তুলে ফেলেন এবং ভৈরব নদীর তীর ধরে দক্ষিণ দিকে অগ্রসর হয়ে সুভরা গ্রামে উপস্থিত হন। এখানে তিনি সামান্য কিছুদিন অবস্থান করতে সক্ষম হয়েছিলেন। এখানে তিনি এক গুম্বজ বিশিষ্ট একটি মসজিদ নির্মাণ করেন। এই মসজিদটি এক প্রকার মাটি দিয়ে গাথা হয়েছিল। এর চার কোনায় ৪টি মিনার নির্মিত হয়েছিল। এই মসজিদটি এখন ভগ্নপ্রায়। মসজিদ বর্তমানে ব্যবহারের অযোগ্য ও জঙ্গলাকীর্ণ অবস্থায় পড়ে আছে। এই অঞ্চলের লোকের মুখে মুখে হযরত খানজাহান আলীর (রঃ) সম্পর্কে অনেক গল্প প্রবাদের আকারে ছড়িয়ে আছে। শোনা যায় তিনি চাঁদ সওদাগরের স্মৃতি বিজড়িত চাঁদের বিলের মধ্য দিয়ে এই গ্রামে এসে উপস্থিত হয়েছিলেন তিনি যখন এই চাঁদের বিল পাড়ি দেন তখন এই বিলে ছিল অথৈ পানি। তিনি আছরের নামাজের ওয়াক্তে তার লোকজনসহ মাত্র হাটু পানির মধ্য দিয়ে হেটে এসে এপাড় আছরের নামাজ পড়েছিলেন। আশ্চর্যের বিষয় কোন লোকেরই কাপড় ভিজা ছিল না। কোন কোন লোকে বলেন তারা পানির উপর দিয়ে চলে এসেছিলেন। জানিনা এই কাহিনীর কোনটা কতদূর সত্য কিন্তু তিনি যে আল্লার ওলি ছিলেন এই স্থানের লোকের কাছেও স্বীকৃতি তিনি সেই দিনেও পেয়েছিলেন তিনি যে অনেক দীর্ঘকায় লোক ছিলেন তাতে কোন সন্দেহ নেই কাজের প্রথম প্রবাদটির প্রতিই আমার সমর্থন বেশী।

কিছুদিন শুভরা গ্রামে অবস্থানের পর তিনি বানাগাতি বা ব্রাহ্মগাতি নামক স্থানে এসে উপস্থিত হন। এখানেও তিনি সামান্য কিছুদিন অবস্থান করেন। এই সামান্য সময়ের মধ্যেই এখানে তিনি একটি মসজিদ নির্মাণ ও একটি দীঘি খনন করেন। সুদীর্ঘকালের অযত্নের ফলে মসজিদটি আজ কালের

গর্ভে বিলীন হ'য়ে গিয়েছে কিন্তু বানাগাতি স্কুলের সম্মুখে তার খনিত দীঘিটি আজও বিদ্যমান রয়েছে।

তারপর শুভরা থেকে রওনা হয়ে নাউলি ও সিদ্ধিপাশা গ্রামের মধ্য দিয়ে বারাকপুর নামক স্থানে এসে তিনি তার ছাউনি ফেলেন। এই বারাকপুরেও তিনি একটি সৈনিকদের শিক্ষাকেন্দ্র স্থাপন করেছিলেন বলে এই স্থানের নাম আজও বারাকপুর রয়েছে। সুভদ্রা হ'তে বারাকপুর পর্যন্ত তার নির্মিত পাকা রাস্তার নিদর্শন আজও বিদ্যমান রয়েছে। তারপর তিনি দিঘলিয়া হয়ে বর্তমান দৌলতপুরের ওপার দিয়ে খুলগ্রাম ও সেনহাটির মধ্য দিয়ে সেনের বাজার নামক স্থানে এসে উপস্থিত হন। সেনের বাজার সর্বত্র তার নির্মিত পাকা রাস্তাটির চিহ্ন আজও অনেক স্থানে বিদ্যমান রয়েছে। যেহেতু এই সেনের বাজার ছিল তৎকালে প্রসিদ্ধ হিন্দু বহুল এলাকা সেই হেতু তিনি এখানে বেশ কিছুদিন অবস্থান করেন। এখানে অচিরেই তিনি ধর্ম প্রচারের কাজ আরম্ভ করেন এবং হিন্দু সম্প্রদায় তার কাছে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন। ইতিপূর্বেই তার আগমনের কথা ও তার কীর্তি কাহিনীর গল্প চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছিল।

এই সেনের বাজার খুলনা শহরের নিকটবর্তী নদীর উত্তর পাড়ে অবস্থিত এখানে তার কীর্তিরাজীর বহুবিধ ধ্বংশাবশেষ আজও বিদ্যমান রয়েছে। কথিত আছে যে এখানে অবস্থানকালে তিনি কর্ণওয়ালি নামক এক মগ রাজার দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত হয়েছিলেন। কর্ণওয়ালী বা অনুরূপ নামের কোন মগরাজ তার আক্রমণের সংবাদ পেয়ে হজরত খানজাহান আলী (রঃ) তার অনুগামী সৈন্যদের জেহাদের জন্য প্রস্তুত হবার আদেশ দেন। এই সময় ছোট একটি শাখা নদী পার হ'য়ে তিনি নদীর অপর পাড়ে যান এবং সৈন্যদের নিয়মিত শিক্ষা দিবার জন্য তিনি একটি শিবির স্থাপন করেন। এখানে তিনি নিজে কিছুদিন ধরে সৈন্যদের নিয়মিত তালিম দেন, তাই আজও এই স্থান তালিমপুর নাম ধারণ করে এই ঘটনাকে চিরস্মরণীয় করে রেখেছে।

www.pathagar.com

অনেকদিন এখানে অপেক্ষা করার পর রাজা কর্ণওয়ালী যখন তাকে আক্রমণ করলেন না তখন এখানে তিনি তার যাত্রা স্থগিত না রেখে আরও অগ্রসর হয়ে রাজা কর্ণওয়ালির রাজ্য সীমায় গিয়ে উপস্থিত হন এবং জেহাদের জন্য প্রস্তুত সুশিক্ষিত অনুগামীগণসহ ইসলাম প্রচার করতে শুরু করেন। প্রথমে তিনি তালিমপুর পার হয়ে শ্রীরামপুরের মধ্য দিয়ে নৈহাটীতে পৌছালে রাজা কর্ণওয়ালির সৈন্যগণ তাকে বাধা প্রদান করে। কিন্তু মুসলমানগণ তাদের ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করার জন্য আমন্ত্রণ জানালে তারা তাদের আক্রমণ করে। ফলে এখানে একটি খণ্ড যুদ্ধ সংঘটিত হয়। কিন্তু জেহাদে উৎসর্গ প্রাণ মুসলান সৈন্যদের হাতে রাজা কর্ণওয়ালির সৈন্যগণ নিদারুণভাবে পরাজিত হয় ও জঙ্গলের পথে পালায়ন করে তাদের জীবন রক্ষা করে। এই যুদ্ধ জয়ের পর 'সামন্তসেনা" নামক স্থানে তিনি বেশ কিছুদিন অবস্থান করেন। এই যুদ্ধে রাজা কর্ণওয়ালির বহু সৈন্য নিহত হয় ফলে রাজা ব্যতিব্যস্ত হয়ে ওঠেন। এই যুদ্ধ কিছু মুলমান সৈন্যও শহীদ হয়েছিলেন। এই স্থানের বিভিন্ন স্থানে এই সব শহীদদের পাকা মাজার রয়েছে রাজা কর্ণওয়ালির স্মৃতি বহন করে আজও কর্ণপুর নামক একটী রেলওয়ে ষ্টেশন দাড়িয়ে রয়েছে এবং খানজাহান আলীর (রঃ) স্মৃতি বহন করে রেখেছে সামন্তসেনা নামক স্থানও রেল ষ্টেশন। পরবর্তীকালে এই জায়গার নামানুসারে এই রেল ষ্টেশনি দুটির এরূপ নামকরণ করা হয়েছে তারপর তিনি সমন্তসেনা হতে রাগুদিয়া নামক স্থানে এসে উপস্থিত হন। এবং এখানে তিনি পুনরায় ছাউনি ফেলেন। রাজা কর্ণওয়ালি ভেবেছিলেন বাধাপ্রাপ্ত হলে তিনি ওখান থেকেই ফিরে যাবেন কিন্তু যখন তিনি আরও অগ্রসর হলেন তখন তিনি ভীত ও সন্ত্রস্থ হয়ে পড়েন এবং পুনরায় আক্রমণের জন্য প্রস্তুত হতে থাকেন। এই সংবাদে হযরত খানজাহান আলী (রঃ) আর একটু অগ্রসর হয়ে তাদের মোকাবেলার সুবিধার জন্য পার্শ্ববর্তী গ্রাম মধুদিয়ার শেষ সীমান্তে তার ছাউনি স্থানান্তরিত করেন এখানে এসেই

www.pathagar.com

তিনি জানতে পারেন যে বিধর্মীদের এক সুসংগঠিত শক্তিশালী সৈন্যবাহিনী তাদের আক্রমণের জন্য প্রস্তুত হইয়েছে এবং এক বিশাল হস্তিবাহিনী নিয়ে তারা অগ্রসর হচ্ছে। এই সংবাদে অনেক মুসলমান মোজাহিদগণ ভীত হয়ে যখন হুজুরের কাছে যায় তখন তিনি উচ্চারণ করেছিলেন, "ইয়া এলাহিল আলমিন, ইহা খায়রুন নাছিরিন, নাছরুম মিনাল্লাহে ওয়া ফাতহুন করিব, অবানাশিরিল মুমিনিন।" এই বাণীটি তার মাজারের উপরেও লিখিত রয়েছে। তিনি সবাইকে এই কথাই বলেছিলেন যে যেন আল্লাই সর্বজ্ঞ এবং মোমেনদের জন্য আল্লাই ভাল সাহায্যকারী। ভয়ের কিছুই নেই ইমান মজবুত থাকলে আল্লার সাহায্য ও বিজয় অতি নিকটবর্ত্তী। তার এইরূপ বাণীতে ইমানের পরীক্ষা দেওয়ার জন্য সবাই স্থির ও দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হ'য়ে যান। এই সময় তিনি তার প্রিয় শিষ্য মোঃ আবু তাহেরকে খবর পাঠান। সংবাদ পাওয়া মাত্র তিনি তার সমস্ত শক্তিসহ ছুটে এসে তার সাথে যোগ দেন মোহাম্মদ তাহেরের প্রতি এটি ছিল তার একটি পরীক্ষা মাত্র। জানা যায় মোঃ তাহেরের আগমনের সময়ও ঐ স্থানের বহু ব্রাহ্মণ হযরত পীর খানজাহান আলী (রঃ) কে সাহায্য করার জন্য তার সঙ্গে হিজরত করে এসেছিলেন।

তিনি আসার পর হজরত খানজাহান আলী (রঃ) তার সাথে সমস্ত বিষয় আলোচনা করে যুদ্ধের সমস্ত পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। এই যুদ্ধের পরিচালনার ভার তিনি ইখতিয়ার উদ্দিন খাঁ ও বখতিয়ার উদ্দিন খাঁ নামে দুই ভ্রাতা ও অসীম যোদ্ধার হাতে অর্পণ করেন। তারা এই দায়িত্বভার অবনত মস্তকে নিজেদের সৌভাগ্যবান মনে করে গ্রহণ করেন। দুই ভাইয়ের মধ্যে বড় ভাই ইখতিয়ার উদ্দিন খাঁ প্রধান সেনাপতির পদ গ্রহণ করেন। কথিত আছে কিছুদিনের মধ্যে কোন এক শনিবার অমাবশ্যার রাতে মহা ধুমধামের সাথে মহাকালির পূজা সমাপনান্তে রবিবার দিনে প্রভাতে এক বিশাল হস্তি বাহিনীসহ তার হযরত পীর খানজাহান আলীর (রঃ) সৈন্যদের উপর অতর্কিতে ঝাপিয়ে

www.pathagar.com

পড়ে। কিন্তু ওরা ভাবিতে পারেনি যে মুসলিম বাহিনী জেহাদ ও মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হয়েইছিল। তারা ভাবতে পারেনি যে হস্তিবাহিনী কেন, মহাকালি কেন, কোন শক্তিই আল্লার শক্তির অধিকারী হযরত খানজাহান আলী (রাঃ) কে পরাজিত করতে পারবে না। প্রথম দিকে মুসলিম সৈন্য হঠাৎ আক্রমণে একটু বিভ্রান্ত হয়ে পড়লেও সেনাপতির নির্দেশে অল্প সময়ের মধ্যেই তারা তা কাটিয়ে উঠতে সক্ষম হন এবং যুদ্ধের মোড় ঘুরিয়ে ফেলেন। এই যুদ্ধে ছোট ভাই বখতিয়ার উদ্দিনের বিক্রমের ঘটনার বর্ণনা পুথির মধ্যে এইরূপ রয়েছে যে -

"তরবারির আঘাতে তার কাটে সাত মাথা
মাথার উপর মাথা পড়ে কাটে আরও মাথা"

এতাঞ্চলে এই যোদ্ধদ্বয়ের অমর বীরত্বের কাহিনী পুথির আকারে ছড়িয়ে রয়েছে। অনেক প্রাচীন মুখে এই পুথির কিছু কিছু শ্লোক আজ ও শোনা যায় হজরত খানজাহান আলী (রঃ) তার এই অভিযানে যত যুদ্ধ করেছেন এই ছিল তার মধ্যে সবচেয়ে বড় যুদ্ধ। এই যুদ্ধে এক হস্তির শুড় তরবারির আঘাতে দ্বিখণ্ডিত করতে গিয়ে সেনাপতি ইখতিয়ার খাঁ গুরুতরভাবে আহত হন ও ছোট ভাই মৃত্যুমুখে পতিত হন। কিন্তু হস্তি শুড় দ্বিখণ্ডিত হওয়ায় তাদের হস্তিবাহিনী সমর ক্ষেত্র থেকে পিছন ফিরে পলায়ন করে। প্রবাদ এইরূপ যে এই হস্তি সকল বহু কাফেরের সৈন্য পদতলে নিষ্পেষিত করে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পলায়ন করেছিল। হস্তিকুলের এই ঘটনার ফলে শত্রু সৈন্য ছিন্ন ভিন্ন হয়ে পড়েন বহু মৃত্যু প্রায় সৈনিক যুদ্ধক্ষেত্রে ফেলে রেখে তারা পলায়ন করতে বাধ্য হয়। এই যুদ্ধে বহু মুসলিম সৈন্যও শহীদ হন। তাদের অনেক বাধানো কবর আজও এতদঞ্চলে ছড়ানো রয়েছে। এই কবর-গুলি মধ্যে শহীদ বখতিয়ার উদ্দিনের মাজার যে কোনটা তা আজ তার খুঁজে বের করা সম্ভব নয়। এই যুদ্ধের সমর স্মৃতি বহন করে এই স্থান পিলজঙ্গ নাম ধারণ করে আজও দাঁড়িয়ে রয়েছে। পিল অর্থ হাতী, জঙ্গ অর্থ যুদ্ধ।

www.pathagar.com

হস্তির যুদ্ধের স্থান। এই স্থানের হস্তির যুদ্ধকে চিরস্মরণীয় করে রাখার জন্যই হযরত খানজাহান আলী (রঃ) এই স্থানের নাম দেন পীলজঙ্গ। শোনা যায় এই যুদ্ধে ১১ জন ব্রাহ্মণও মৃত্যুমুখে পতিত হলে তিনি নিজ হাতে এদের দাফন করেছিলেন ইনশাআল্লাহ এরাও হাসরের দিন মুসলমান সহীদদের সঙ্গে আল্লার সামনে হাজির হবে। এদের জন্য আল্লার কাছে আমার এই সুপারিশ রইল।

এই যুদ্ধ জয়ের পর হযরত খানজাহান আলী (রঃ) এখানে বেশ কিছুদিন অবস্থান করেন ও আহত সৈনিকদের সেবা ও সুস্থতার জন্য অপেক্ষা করতে থাকেন। এখানেও পার্শ্ববর্তী স্থানেও তিনি কয়েকটি মসজিদ নির্মাণ করেন। এর কিছু দূরে সুগন্ধি গ্রামের শেখ বাড়ীর নিকটে একটি মাজার ও একটী মসজিদের ধ্বংসাবশেষ আজও বিদ্যমান রয়েছে। এটী যে কার মাজার তা আজ সকলের কাছে অজ্ঞাত। এখানে হয়তো তিনি তার অনুগামীদের মধ্যে বিশিষ্ট কাউকে রেখে যান এবং এটী তারই মাজার।

কথিত আছে যে পীলজঙ্গের এই যুদ্ধে পীরালী ব্রাহ্মণগণ হযরত খানজাহান আলী (রঃ) এক বিস্ময়কর সাহায্য প্রদান করেছিলেন। তাই হযরত পীর খানজাহান আলী তাদের উপর সন্তুষ্ট হয়ে এবং যুদ্ধের খেছারত স্বরূপ তাদের বসতি স্থাপনের জন্য এই স্থানের একটী বিশাল এলাকা প্রদান করেন। তিনি ব্রাহ্মণদের এই আবাসভূমির নামকরণ করেন 'ব্রাহ্মণ রাখদিয়া' এই নাম অনুসারে এই স্থানের রেলওয়ে ষ্টেশনটীর নাম ছিল ব্রাহ্মণ রাখদিয়া। কিন্তু বাংলাদেশ হবার কিছু পূর্বে অতি বুদ্ধিমান পাকিস্তান সেনাবাহিনীর তৎপরতায় ও রাজাকারদের বুদ্ধিমত্তার সংমিশ্রণে এর নাম পরিবর্ত্তন হয়ে "খানজাহানপুর" হয়েছে। হযরত পীর খানজাহান আলীর রঃ) এমন ঘটনার স্মৃতি বহন করে তার দেওয়া একটী নামের পরিবর্ত্তন করা কোন মতেই সমুচীন হয়েছে বলে আমার মনে হয় না।

এই যুদ্ধ জয়ের বেশ কিছুদিন পর তিনি এই স্থান হতে ছাউনি তুলে

www.pathagar.com

আবার পূর্বের ন্যায় রাস্তা নির্মাণ করতে করতে দক্ষিণ পূর্ব দিকে অগ্রসর হতে থাকেন। এবং রণভূম মীরেরডাঙ্গা ও সাঁরড়া মধু দিয়া গ্রামের মধ্য দিয়া ষাটগুম্বজের বারাকপুরের সন্নিকটে এসে ছাউনি ফেলেন। মতান্তরে বাদোখালী বিল পার হয়ে সুন্দরঘোনা গ্রামে এসে উপস্থিত হন। বারাকপুর স্থানটিও এই সুন্দর ঘোনা গ্রামের শেষ প্রান্তেই অবস্থিত। শোনা যায় রণভূমিও তাকে একটি খণ্ড যুদ্ধে অবতীর্ণ হতে হয়েছিল। এত বাধা বিপত্তি অতিক্রম করে অবশেষে নবীকূলের এই বারাকপুর স্থানটী তার নিকট অতি মানায়ম মনে হয়। এখানেও তিনি তার সৈন্যদের জন্য একটি শিবির স্থাপন করেন এবং বারাকপুর নামটি আজও সেই স্মৃতি বহন করে রেখেছে। এখানে একটি পাকা রাস্তার চিহ্ন আজও বিদ্যমান রয়েছে। এখানে তিনি একটি বৃহৎ দীঘি খনন করার পরিকল্পনা গ্রহণ করেন; এই দীঘিটাই সকলের নিকট ঘোড়া দীঘি নামে পরিচিত। এই ঘোড়া দীঘির পাড়েই তার বিখ্যাত ষাটগুম্বজ মসজিদ অবস্থিত।

এখান থেকে তিনি আবার তার শিবির স্থানান্তরিত করে স মাস্ত দূরে ভৈরব নদীর এক মনরম তীরে আস্তানা স্থাপন করেন। এই স্থানে পরবর্তীকালে তিনি তার বসতবাটি নির্মাণ করেছিলেন। অল্পদিনের মধ্যেই এই স্থানকে কেন্দ্র করে একটি শহর গড়ে ওঠে এবং ক্রমে ক্রমে বাগেরহাট হতে ষাটগুম্বজ পর্যন্ত এই শহর বিস্তারলাভ করে ও রাজধানী শহরে পরিণত হয়।

দেখা যায় ইসলাম প্রচারে বেরিয়ে হযরত খানজাহান আলী রঃ) অল্প সময়ের মধ্যে যশোর থেকে খুলনা ও বরিশালের বিরদাংশ নিয়ে একটী বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে একটী মুসলিম রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করে ফেলেন। স্বাভাবিক নিয়মেই তাকে এই রাষ্ট্রের দায়ীত্বভার গ্রহণ করতে হয়। তার রাষ্ট্রের নাম রাখেন তিনি খলিফাতাবাদ এবং তিনি একটী পরগণা প্রতিষ্ঠা করে তার নাম দেন হাবেলী খলিফাতাবাদ পরগণা। এই সময় মোহাম্মদ তাবু তাহেরকে তিনি

www.pathagar.com

সর্বসমর্থনে তার প্রধান মন্ত্রীপদে নিয়োজিত করেন এই রাজ্যের মূল রাজধানী ও তার দরবার গৃহ ছিল বাটগুম্বজ।

এখানে এসেও তাকে আরও ২টি প্রধান যুদ্ধে অবতীর্ণ হতে হয়। এ যুদ্ধ দুইটিও কম গুরুত্বপূর্ণ ছিল না। পরাজিত ও পলাতক মোশারেক ও কাফের বাহিনী অন্য কোন উপায়ান্তর না দেখে গুপ্ত অবস্থায় থেকে তার জীবন নাশের চেষ্টা করতে থাকে। কিন্তু তাদের সকল প্রচেষ্টা ব্যর্থ হলে তারা আবার হঠাৎ প্রাক্রমণের প্রস্তুতি নিতে থাকে। এক সময় তারা রণবিজয়পুর নামক স্থানে মুসলিম মোজাহিদের উপর হঠাৎ ঝাপিয়ে পড়ে এবং এখানে মুসলমানদের সঙ্গে মগ রাজা নিজেই যুদ্ধে অবতীর্ণ হন। এই সংবাদ পেয়ে সমস্ত মুসলমান বাহিনী শত্রু সৈন্যের উপরে ঝাপিয়ে পড়ে ও তাদের নিশ্চিহ্ন করিতে সমর্থ হয় বর্তমানে তার মাজার সংলগ্ন গ্রামটি রণবিজয়পুর নাম ধারণ করে অতীতের এই ঘটনা সাক্ষী হিসাবে দাড়িয়ে রয়েছে। এই যুদ্ধে বহু মুসলমান সৈন্য শহীদ হন কারণ প্রথমতঃ এই আক্রমণ ছিল অতর্কিত আক্রমণ। এখানের সমস্ত শহীদদের তিনি এখানেই দাফন করেন এবং তাদের স্মৃতি অমর করে রাখার জন্য তিনি তাদের মাজার সুন্দরভাবে বাধিয়ে দেন। সারিবদ্ধ মাজার এই অঞ্চলে বিদ্যমান থেকে এ কথার সত্যতা প্রমাণ করছে। হজরত খানজাহান আলী (রঃ) মাজারের নিকটেই এরূপ শহীদানের মাজার রয়েছে। জানা যায় না এগুলি কাদের মাজার তবে এই মাজারের পার্শ্বে বর্তমানে একটি হাফেজি মাদ্রাসা চালু হয়েছে।

এই যুদ্ধে অল্প কিছুদিনের মধ্যেই তিনি এই শত্রুবাহিনীর সহিত বাগেরহাটের নদীর অপর পাড়ের ফতেপুর নামক স্থানে যুদ্ধে অবতীর্ণ হন এবং তাদের চূড়ান্তভাবে পরাজিত করে সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন করতে সক্ষম হন। এই সময় বাগেরহাটে যে নদী তিনি নৌকাযোগে দাড় টেনে বা দড়ি টেনে পার হয়েছিলেন বলে জানা যায় সেই নদীর নাম হয়েছে দড়াটানা নদী এবং এই নদীর অপর পাড়ে যে স্থানে চূড়ান্তভাবে যুদ্ধে পরাজিত করেছিলেন সেই

www.pathagar.com

স্থানের নাম দিয়েছিলেন তিনি ফতেপুর। এখানে আজও ফতেপুর নামক গ্রামটি এই ঘটনার স্মৃতি বিজড়িত হয়ে এই ঘটনার সত্যতা প্রমাণ করছে। ফতেহ অর্থ বিজয় এবং পুর অর্থ স্থান। তাই ফতেপুরই হোল তার শেষ বিজয়ের স্থান।

এই বাগেরহাট অঞ্চলে এমনি কোথাও শোনা যায় যে মগরাজার কাষ্ঠ নির্মিত রাজপ্রাসাদ ও তার কাষ্ঠ নির্মিত সিংহাসন এই বাগেরহাটের যে কোন স্থানেই অবস্থিত ছিল কেহ কেহ বলেন যে এ স্থানে ভৈরব নদীর কূল মগরাজের প্রাসাদ অবস্থিত ছিল হযরত খানজাহান আলী (রঃ) তারই সন্নিকটে তার প্রাসাদ নির্মাণ করেছিলেন। মগরাজের রাজপ্রাসাদ ছিল বলে এই স্থানের নাম মগরা হয়েছে বলে অনেকে মনে করেন। মগ অর্থ মগ এবং রা অর্থ জাতি আবার অনেকে বলেন মগ রাজের এলাকা ছিল আরও ভাটিতে। এটি মগরা। নদী বা গাং মরে গিয়ে এখানে গ্রাম গড়ে উঠেছিল বলে একে মগরা বলা হয়ে থাকে। যাই হোক না কেন মগরাজের কোন স্মৃতি চিহ্নই আজ আর এখানে নেই।

এমনি করে প্রথম জীবনে অবিশ্রান্ত পরিশ্রম, সাধনা, দ্বন্দ্ব সংঘাত ও যুদ্ধ বিগ্রহের মধ্য দিয়ে হযরত পীর খানজাহান আলী (রঃ) এদেশে ইসলাম প্রচার করেছিলেন। ইসলাম প্রচার করার জন্য এত কঠিনতম পথ অবলম্বণ করতে আর কোন ওলি আল্লার জীবনে দেখা যায় না। শোনা যায় হস্তি যুদ্ধে আহত শত্রু সৈন্যদেরও সেবা শুশ্রূষা করে তিনি সুস্থ করে তোলেন। পরবর্তীকালে তারাও মুসলমান হয়েছিলেন। এমনি করে যুদ্ধে পরাজিত করে তুলনাহীন ও অনন্ত মানবতা ও মহত্ত্ব প্রদর্শন করে হযরত খানজাহান আলী (র) এদেশের মানুষের মন জয় শুধু নয়, ইসলামকেও এদেশে নিষ্কণ্টক করেছিলেন ও একটি শান্তির রাজ্য বা কল্যাণ রাজ্য প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়েছিল।

www.pathagar.com

।। বাগেরহাটের সর্বপ্রথম কীর্তি ।।

সমস্ত যুদ্ধ বিগ্রহ পরিশেষে মগরাজার এদেশ থেকে নৌকাযোগে চিরতরে পালায়নের পর যখন দেশে অবারিত শান্তি ফিরে আসে তখন হযরত খানজাহান আলী (রঃ) দেশ গঠন ও জনহিতকর কার্যে মনোনিবেশ করেন। হযরত খানজাহান আলী (রঃ) গঠনমূলক কাজে হাত দিয়ে সর্বপ্রথম যে কাজটি করেন সেটি হল ষাটগুম্বজ মসজিদের সন্নিকটে ঘোড়া দীঘি খনন। এই দীঘিটি আকারে বিশাল এবং দেখতে মোটামুটি একটা ছোটখাটো হ্রদের মত। প্রস্থের চাইতে এর দৈর্ঘ অনেক বেশী। পড়সহ এর দৈর্ঘ্য প্রায় তিন হাজার ফুট ও প্রস্থ আঠারো শত ফুট। ছয়শত বৎসর অতিবাহিত হবার পরেও আজও এই দীঘির পানি স্বচ্ছ ও সুপেয় রয়েছে। আজ এই ছয়শত বৎসর ধরেই এই দীঘির সুপেয় পানি, মানুষ খাবার পানি হিসাবে ব্যবহার করে আসছে। চৈত্র বৈশাখ মাসে যখন চারিদিকের পানি শুকিয়ে যায় তখনও এই দীঘিতে ২০/২৫ হাত পানি থাকে। বর্তমান বাংলাদেশ সরকার পাইপের সাহায্যে এই দীঘি থেকে পানি নিয়ে বাগেরহাট শহরে এই পানি সরবরাহ করেছেন। ফলে বাগেরহাট শহরের খাবার পানি ভাল নয় বলে এতদিন যে বদনাম চলে আসছিল আজ বাগেরহাট শহর সে বদনাম হতে সম্পূর্ণ মুক্ত। এই শহরের আশে পাশে গভীর নলকূপের সাহায্যে ভাল পানি তোলার জন্য সরকারী পর্যায়ে অনেক প্রচেষ্টা চালিয়েও এই দীঘির মত এত সুন্দর পানি তোলা সম্ভব হয়নি অবশেষে নিরুপায় হ'য়ে শহর থেকে প্রায় ৫ মাইল দূর থেকে পাইপের সাহায্যে এই দীঘি থেকে পানি এনে সরবরাহ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। অল্প কিছুদিন হল এই পরিকল্পনা বাস্তবে রূপায়িত হয়েছে। আধুনিক বিজ্ঞান সেখানে ব্যর্থ হয়েছে। হযরত খানজাহান আলীর (রঃ) খনিত দীঘি সেখানে সার্থক হয়েছে। তাই এই অতি আধুনিক বিজ্ঞানের অগ্রগতির যুগেও হযরত খানজাহান আলীর (রঃ) অমর কীর্তির আর একবার বিজয় ঘোষিত হল। বাগেরহাট এইটা তার সর্ব্বপ্রথম কীর্তি।

www.pathagar.com

এই দীঘির নাম কেন ঘোড়া দীঘি হয়েছে এ নিয়ে বেশ কয়েকটা প্রবাদ প্রচলিত রয়েছে। কথিত আছে যে, শুধু মাত্র খাবার পানির জন্যেই নয় ষাটগুম্বজ মসজিদ নির্মানের জন্য এই স্থানকে উঁচু করার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেওয়ায় এই দীঘি খনন বাস্তবায়নের জন্য কতটুকু জায়গা নিয়ে দীঘি খনন করা হবে এই প্রশ্নের সমাধানকল্পে তিনি এক নূতন পদ্ধতি গ্রহণ করেন। দুইটী বলিষ্ঠ ঘোড়াকে তিনি তার নির্ধারিত স্থানে দৌড় মুখি করে ছেড়ে দেন। এক দৌড়ে ঘোড়া দুটি যেখানে গিয়ে থেমেছিল, সেখান থেকে তাদের ফিরিয়ে আসতে বলায় যতটা জায়গা পরিক্রম করে তারা ঘুরে এসেছিল ততটুকু স্থান নিয়ে এই দীঘি খনন করা হয়েছিল বলে, এই দীঘির নাম হয় ঘোড়া দীঘি। আবার কেউ কেউ বলেন, এই দীঘি খননের কাজ পরিদর্শন করার জন্য হযরত খানজাহান আলী (রঃ) ঘোড়ায় চড়ে চারিদিকে ঘুরে ঘুরে দেখতে বলে এর নাম ঘোড়া দীঘি হয়েছে। কিন্তু প্রথম গল্পটিই বহুল প্রচলিত এবং এটি একটি বুনিয়াদী গল্প কাজেই এইটিই সমর্থনযোগ্য।

আমাদের বাল্যকালে আমরা এই দীঘিতে দুটি কুমীর দেখেছি কিন্তু বর্ত্তমানে এই দীঘিতে কোন কুমীর নেই। এই কুমীর দুটী যে কখন ছাড়া হয়েছিল সে সম্পূর্কে এমন কোন গল্পও শোনা যায় না। তবে শোনা যায় খাঞ্জালি দীঘি বা ঠাকুর দীঘি হতে কোন কোন কুমীর মাঝে ঐ দীঘিতে চলে যেত। কিন্তু পরবর্ত্তীকালে দীঘির চারিদিকে লোকবসতি হওয়ায় এবং কুমীরের বসবাসের উপযুক্ত পরিবেশ নষ্ট হওয়ার ফলে একদিন তারা এই দীঘি থেকে চিরদিনের জন্য চলে যেতে বাধ্য হয়। আমার বাল্যকালের একটা ঘটনা একবার এই দীঘি থেকে এক টী কুমীর মাজারের কাছের খাঞ্জালী দীঘিতে চলে যাচ্ছিল। তার যাবার পথে অনেকে তাকে বাধা দিতে চেষ্টা করে কিন্তু সে খাল, বিল ও চাষ করা মাঠের মধ্য দিয়ে দৌড়ে পালাচ্ছিল। চাষ করা মাঠের মধ্য দিয়ে দৌড়াবার সময় তার পিছন থেকে এত জোরে ঢিল আসছিল যে লোকে পালিয়ে আসতে বাধ্য হয়েছিল এবং প্রবাদ রটেছি

www.pathagar.com

টিল ছুড়ে সবাইকে তাড়িয়ে দিয়েছে। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে এত মাঠ ঘাট নদী খাল পার হয়ে সে সবার চোখের সম্মুখে খাঞ্জালি দীঘিতে এসে নেমেছিল কিন্তু নদী খালের পথে সে যায়নি। তাই জাতিতে কুমীর হলেও এই খানজাহান আলীর (রঃ) দীঘিই এদের বাসস্থান।

বর্ত্তমানে এই দীঘির উত্তর পাড় দিয়ে একটি পাকা রাস্তা পশ্চিম দিকে সায়ড়া মধুদিয়ার দিকে চলে গিয়েছে। পুর্ব পাড়ে একটি ছোট বাধানো ঘাট রয়েছে। মুল বাধানো ঘাটটী নষ্ট হওয়ার পর পরবর্তীকালে আমাদের চোখের সম্মুখে এই ঘাটটি বাধানো হয়েছে। এই ঘাটের উত্তর পাশেই বর্তমান বাগেরহাট থেকে পানির পাইপ এসে দীঘিতে নেমেছে। এই জন্য এখানে তাদের একটী দালান তৈরী করা হয়েছে। এই পুর্ব পাড়েই ষাটগুম্বজ মসজিদ অবস্থিত। অন্য দুই পাড়ে স্থানীয় লোকদের বসতবাটী ছাড়া আর কিছুই নেই। এর দক্ষিণ পাড় থেকে একটি রাস্তা বারাকপুর গ্রামের দিকে নেমে গিয়েছে।

এই দীঘির কুমীর সম্পর্কে কোন এক লেখক মতামত প্রকাশ করেছেন যে হযরত খানজাহান আলী (রঃ) সর্ব প্রথম তার কুমীর এই দীঘিতেই ছেড়ে দেন এবং তাদের নাম রাখেন ধলা পাহাড় এবং কালা পাহাড়। কিন্তু পরবর্তীকালে এই কুমীর খাঞ্জালী দীঘিতে নিয়ে যাওয়া হয়। যদিও আজ নিশ্চিত করে বলা যাবে না এ কথার কোনটি সত্য কিন্তু এ কথা সত্য যা মানুষ শুধু নয় পশু পাখী এমনকি প্রতিটি প্রাণী চিরদিন তার মুল গন্তব্য স্থানেই ফিরে যেতে চায়। এই নিয়মের প্রতি লক্ষ্য করে এ কথা সহজেই অনুমান করে বলা যায় যে, খাঞ্জালি দীঘিই মনে হয় তাদের আদি বাসস্থান। এবং সেখানে চারি পাড়ে লোক বসতি হওয়া সত্ত্বেও আজও তারা বসবাস করছে। দেখা যায় দু একটা কুমীরের বাচ্চা তার মায়ের কবল থেকে পালিয়ে গিয়ে বাইর থেকে বড় হয়ে আবার এই দীঘিতে ফিরে আসে।

খানজাহান আলীর (রঃ) প্রথম কীর্তি হিসাবেই শুধু নয়, এর বিশালতায়

www.pathagar.com

ও মানব কল্যাণের প্রয়োজনীয়তায় তার হাজার হাজার কীর্তিরাজীর মধ্যে এটি একটি বিশেষ স্থান অধিকার করে আছে। ছয়শত বৎসরেও এর গরিমা একটুও ম্লান হয়নি এবং আরও কত শত শত বৎসর যে স্থায়ী হবে তা বলা মুশকিল। বাল্যকাল থেকে আমরা শুনে আসছি যে এই দীঘিতে মাছ ধরার জন্য জাল ফেলা পীর সাহেবের নিষেধ ছিল এবং এ আদেশ শত শত বৎসর ধরেই পালিত হ'য়ে আসছে। আমার মনে হয় তার নির্দেশ পালিত হলে কেয়ামত পর্যন্ত এ দেশের মানুষ এই নেয়ামতের ফল ভোগ করতে সক্ষম হবে।

॥ হযরত খানজাহান আলীর (রঃ) সর্ব বৃহৎ কীর্তি ॥

হযরত পীর খানজাহান আলীর (রঃ) কালজয়ী ও অমর কীর্তীরাজীর মধ্যে ষাটগুম্বজ মসজিদকেই তার সর্ববৃহৎ কীর্তি বলে আখ্যায়িত করা হ'য়ে থাকে এত বড় বিশাল মসজিদ তৎকালীন বাংলায় আর একটিও ছিল না এবং আজও নেই। তিনি এই অঞ্চলেই স্থায়ীভাবে অবস্থানের সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন বলেই এক জামাতে নামাজ আদায় করার জন্যই এত বড় মসজিদ নির্মানের প্রয়োজন হয়েছিল। এই ষাটগুম্বজ মসজিদ তৎকালীন স্থাপত্য-শিল্পের অগ্রগতির ঐতিহ্যবাহী একটি শ্রেষ্ঠতম নিদর্শন। অপূর্ব ও বিস্ময়কর কারুকার্য্য খচিত এই মসজিদটী। অতি সুনিপুন হাতে ইট ও পাথর কেটে বিভিন্ন ধরনের নিখুত লতা ফুল পাতা তৈরী করে এই মসজিদের সাথে বসান হয়েছে। এগুলি শুধু আমাদের নয় যে কোন দেশের মানুষের বিস্ময় সৃষ্টি করতে সক্ষম। সর্বপরি এর ভিত্তি ও গঠণ প্রণালী দেখলে, তৎকালে স্থাপত্য শিল্প যে কতখানি অগ্রগতি লাভ করেছিল তা সহজেই অনুমান করা যায়। অধিকাংশের মতামত এইরূপ যে এটিই তার কীর্তির মধ্যে সর্বশ্রেষ্ট। কিন্তু আমার মনে হয়—তার রওজা মোবারক পাশের

ও সম্মুখের দীঘি মিলে যে পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে সেইটিই অসাধারণ ও অনবদ্য এই কারণেই এটাই তার সর্বশ্রেষ্ঠ কীর্তি বলে আমার মনে হয়। মাজারের উপরের পাথরের ভিত্তি নির্মিত মসজিদটি আমার কাছে আরও মজবুত ও সুদৃঢ় বলে মনে হয়। কবর গাত্রের আরবী শীলালিপিগুলিও এক অভাবনীয় বিস্ময় সৃষ্টি করে এবং লুপ্ত ইতিহাসের সাক্ষী হয়ে এই মাজার দাড়িয়ে রয়েছে। তবুও ষাটগুম্বজ মসজিদ যে আকারে বৃহৎ ও তার সর্ববৃহৎ কীর্তি তাতে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই।

যে কোন এক সময় ষাটগুম্বজ মসজিদের মেঝের দিকের কিছু অংশ মাটিতে ঢাকা পড়ে গিয়েছিল কিন্তু পরবর্তিকালে এই মাটি কেটে সরিয়ে ফেলা হয় ও মাটি সমান করে পুনরায় মেঝে মেরামত করা হয়। ফলে পুরানো মেঝের কোন অস্তিত্ব এখন নেই। তবে জানা যায় পূর্বের মেঝে আট কোনা বিশিষ্ট ইটের নির্মিত ছিল এবং এই ইটের উপর এনামেল করে বিভিন্ন রংয়ের একটি সুন্দর ঝকঝকে মেঝে তৈরী করা হয়েছিল। শোনা যায় এই মেঝের মাঝে সূর্যের আলো এমনভাবে প্রতিফলিত হোত যে মসজিদের ভিতরে থেকেই বোঝা যেত যে সূর্য্য এখন আকাশের কোন্ স্থানে অবস্থান করছে। এই মসজিদ একাধারে যেমন ছিল নামাজের স্থান তেমনি ছিল পীর ছাহেবের দরবারগৃহ। এই মসজিদে বসেই খলিফাদের মত তিনি বিচার ও রাজকার্য্য চালনা করতেন। এইটি ছিল তার কাছে মদিনার মসজিদের নবমীর মত/মসজিদে নবমীতে যেমন ধর্মীয় ও রাষ্ট্রীয় সব কাজই চলেছে, তিনিও এখানে তেমনিই করতেন। রসুল করিম (দঃ) এর মৃত্যুর পরও খোলাফায়ে রাশেদীনগণ সেভাবে এই মসজিদকে নামাজ ও রাষ্ট্রের কাজে ব্যবহার করেছেন, হযরত খানজাহান আলী (রঃ) একই উদ্দেশ্য নিয়ে এই মসজিদ নির্মাণ করেছিলেন।

এই মসজিদে বসেই প্রত্যহ নামাজান্তে তিনি সবাইকে নছিহত করতেন এবং জেকের আজগারের পর রাজকার্যে মননিবেশ করতেন। আজকের দিনে যেমন অনেকে নামাজ পড়ে না অথচ তারা মুসলমান। এমনি হাজার হাজার

www.pathagar.com

মুসলমান হয়েছে। কিন্তু সেদিনে নামাজ পড়ে না, এমন যে কোন মুসলমান থাকতে পারে, এ কথা তারা চিন্তাও করতে পারতেন না। তাই তার সঙ্গে আগমনকারী বিশাল জনতার জন্ম এবং জুম্মার নামাজ আদায়ের জন্য এইরূপ একটী মসজিদের বিশেষ প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছিল। শোনা যায় এই মসজিদ আবার এক সময়ে মাদ্রাসারূপেও ব্যবহৃত হোত। এখানে বসে অগণিত ছাত্র আরবী, ফার্সি, কোরান ও হাদিস শিক্ষা করত।

এ কথায় সন্দেহের কোন অবকাশ নেই যে এত বড় মসজিদের পরিকল্পনা যার মাথায় এসেছে, এবং এর বিজ্ঞান সম্মত খসড়া যিনি তৈরী করেছেন তিনি একজন অসাধারণ কৌশলী মানুষ। অসাধারণ মানুষের সৃষ্টি, এই অসাধারণ মসজিদের দৈর্ঘ্য ১৭০ ফুট ও প্রস্থ ১০৫ ফুট। ভিত্তি ৮ ফুট ও ছাদের উচ্চতা ২২ ফুট। এই মসজিদের ছাদ বহু গুম্বজ বিশিষ্ট। পুর্ব পশ্চিমে সাতটি ও উত্তর দক্ষিণে এগারটী মোট সাতাত্তরটী গুম্বজ রয়েছে। এগুলি আবার ইটের প্রাচীর বেষ্টিত ষাটটি খাম্বার উপর প্রতিষ্ঠিত। অনেক খাম্বার ইটের প্রাচীর আজ আর নেই। সুন্দর ও সুনিপুন শিল্পিগণ বড় বড় পাথরকে আট কোণা করে কেটে এবং এই পাথরের মধ্য দিয়ে ছিদ্র করে একটি শক্ত লোহার ছিক ঢুকিয়ে এই খাম্বার পথরগুলি কোন এক প্রকার মশলা দিয়ে এটে বসিয়ে দিয়েছেন। ক্রেন ছাড়া এই পাথরগুলি একটার পর একটা কেমন করে বসানো হয়েছে এটিও একটি বিস্ময়ের ব্যাপার। এই মসজিদের পশ্চিম দিকে প্রধান মেহরাবের গা ঘেষে একটি মাত্র ছোট দরজা রয়েছে। সম্ভবত হযরত খানজাহান আলী (রঃ) নিজেই নামাজের ইমামতি করতেন এবং ঠিক সময় এই দরজা দিয়েই তিনি মসজিদে প্রবেশ করতেন। এই বিশাল মসজিদটির চার কোণে চারটি বৃহৎ মিনার রয়েছে। পূর্ব দিকের দুইটি মিনারের মধ্যে মসজিদের ছাদে ওঠার জন্য ঘুরানো সিড়ি রয়েছে। নামাজের সময় হলে যে মোয়াজ্জিন এই সিড়ি দিয়ে মিনারের উপর উঠে আজান দিতেন তা বুঝতে একটুও কষ্ট হয় না। পশ্চিম দিকের মিনার দুইটির সিড়ি নাই কিন্তু উপরের দিকে দুইটি কোঠা রয়েছে কোঠা

www.pathagar.com

দুইটি এমনই যে এখানে অনায়াসে একজন লোক থাকা যায়। যুগ যুগ ধরে এই কোঠা দুইটির নাম আধার কোঠা ও রওশন কোঠা বলেই লোকে জানে। শোনা যায় খানজাহান আলীর (রঃ) গুপ্ত পাহারাদারগণ এই মিনারের উপর থেকেই বহিঃ শত্রু কোনরূপ আক্রমণ হয় কিনা সেদিকে লক্ষ রাখতেন। পূর্ব সমুদ্রগামী জাহাজগুলি এই মিনার থেকে স্পষ্ট দেখা যেত বলে শোনা যায়। জানা যায় এই মসজিদটি বেষ্টন করে ৯/১০ ফুট উচু একটি দেওয়াল ছিল। এই দেওয়ালের পূর্ব প্রান্তে মসজিদে প্রবেশের জন্য একটি গেট আজও বিদ্যমান থেকে এই দেওয়ালের অস্তিত্ব প্রমাণ করছে।

এই মসজিদের নাম কেন এবং কখন যে ষাটগুম্বজ হোল বহুকাল ধরেই এটি একটি বিতর্কের বিষয়। গুম্বজ হিসাবে যদি ধরা যায় তবে দেখা যায় যে ৬০টা নয় এর উপরে ৭৭টি গুম্বজ রয়েছে। গুম্বজ হিসাবে নাম হলে এর সাতাত্তর গুম্বজ নাম হওয়া উচিৎ ছিল। অবশ্য পাচশত বৎসরের ব্যবধানে তার অনেক কীর্তির মত সাতাত্তর কথাটার কিছু অংশ ধ্বংশ গিয়ে প্রথমে সাত ও পরে ষাট হওয়া বিচিত্র নয়। তা ছাড়া পূর্ব পশ্চিম দিক হ'তে এই গুম্বজের সারি গণনা করলে ৭টা গুম্বজই দেখা যাবে। তা হলে এর নাম সাত গুম্বজ হওয়া উচিত ছিল। অবশ্য এই মসজিদের ৭৭টি গুম্বজ ৬০টি পাথরের খাম্বার উপর স্থাপন করা রয়েছে। এ কারণেও এর নাম ষাটগুম্বজ হতে পারে। কেউ কেউ বলেন মূলতঃ এটাকে ষাটগুম্বজ বলা হোত কিন্তু কালক্রমে জনসাধারণের আরবী শব্দ উচ্চারণের অনভ্যাসের ফলে খাম্বুজ শব্দটী গুম্বজ হয়ে গিয়েছে। কেউ কেউ বলেন এই মসজিদের ছাদ গুম্বজ বিশিষ্ট বলে একে "ছাদ গুম্বজ" মসজিদ বলা হোত। কিন্তু পর্যায়ক্রমে উচ্চারণ দোষে ছাদ কথাটী ষাট হয়ে গিয়েছে। কিন্তু আমার মতে এর নাম যে ষাট খাম্বুজ ছিল এইটাই বেশী সমর্থনযোগ্য তবে যে নামই এর হোক না কেন "ষাট গুম্বজ" ছাড়া অন্য কোন নামই আমাদের কাছে আজ গ্রহণযোগ্য নয়।

এই মসজিদের পশ্চিম দিকে মাঝামাঝি স্থানে বৃহৎ একটী সুন্দর মেহরাব

www.pathagar.com

হয়েছে। কোন এক সময় গুপ্ত ধনের লোভে অজ্ঞাত কোন দুবৃত্তরা এই মোহরাবটির নীচে খুড়ে ফেলেছিল। পরে এই ভগ্ন স্থানটি প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের তত্ত্বাবধানে মেরামত করা হয়েছে। এই মসজিদের পূর্ব দিকে একটি সদর তোরণ দ্বার এখনও বিদ্যমান রয়েছে। এই তোরণ দ্বার থেকে এই স্থানটি দেওয়াল পরিবেষ্টিত ছিল। ধ্বংশপ্রায় এই তোরণদ্বারটিও পুনরায় মেরামত করা হয়েছে। এই তোরণদ্বারের সন্নিকটে অনেক গৃহের ধ্বংশাবশেষ আজও পরিলক্ষিত হয়। এগুলি যে গৃহ ছিল তা এর গঠন পদ্ধতি দেখে কিছুদিন পূর্বেও অনুমান করা যেত। মসজিদের দক্ষিণ দিকেও এইরূপ অনেক গৃহের ধ্বংশাবশেষ বিদ্যমান রয়েছে। এই ধ্বংশপ্রাপ্ত গৃহগুলি এই কথাই মনে করিয়ে দেয় যে, এইখানেই এই পরগণার বা সুবা'র সদর দপ্তর অবস্থিত ছিল এবং এর বিভিন্ন কুঠুরি ছিল এর বিভিন্ন দপ্তর গৃহ। বর্তমানে সরকারী তরফ থেকে এখানে একটি ডাক বাংলো তৈয়ার করা হয়েছে। দেশ বিদেশের বহু সম্ভ্রান্ত লোক ভ্রমণের উদ্দেশ্যে এখানে এসে রাত যাপন করে থাকেন। বর্তমানে এই মসজিদের রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব পুরাতত্ব বিভাগের হাতে অর্পিত হয়েছে।

বাগেরহাট থেকে ৪ মাইল দূরে একটি রেলওয়ে ষ্টেশনের নাম বহুকাল আগে থেকেই ষাটগুম্বুজ রাখা হয়েছে যদিও এই ষ্টেশনটি ষাটগুম্বজ মসজিদ থেকে তিন মাইলেরও কিছু বেশী দূরে অবস্থিত তবুও এদেশের লোক এই ষ্টেশনটির নাম ষাটগুম্বজ রেখে হযরত খানজাহান আলীর মহান কীর্তির প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেছেন।

প্রতি বৎসর চৈত্র মাসের পূর্ণিমাতে যখন খানজান আলী দরগায় মেলা বসে তখন একই দিনে ষাটগুম্বজ মসজিদের পাশেও মেলা বসে। সেই সময় এখানেও অসংখ্য লোক সমাগম হয়ে থাকে। পূণ্য লাভও বিখ্যাত এই কীর্তি দর্শনের আশায় দেশ বিদেশ থেকে বহুলোক এখানে উপস্থিত হন। এই মেলাটির রেওয়াজ এখানে কবে এবং কখন থেকে হয়েছে সে কথা সঠিক করে বলা যায় না। তবে শোনা যেত যে বছরের কোন এক সময় এখানে ওরজ হত।

www.pathagar.com

ছোয়াব রেছানির জন্য এই দিনে এখানে দোয়া দরুদ ও কোরান তেলাওয়াত করা হোত। কিন্তু কখন থেকে যে অনুষ্ঠানের মূল বস্তুটি লোপ পেয়ে দোকান পাটগুলি সেই স্থান অধিকার করছে তার সঠিক সাল নির্বাচন করা সম্ভব নয়। তবে এটুকু অনুমান করাযায় যে পরবর্তীকালে হিন্দু জমিদার আমলে যখন মুসলমানদের ঐতিহ্যে ভাঙ্গন ধরেছিল এবং যে যুগে পীর সাহেবের দীঘি ঠাকুর দীঘিতে পরিণত হয়েছিল এই মেলাটি সেই যুগেরই অবদান। আজ কয়েক বছর ধরে দেখা যায় এই দিনে কয়েকজন মাদ্রাসার ছাত্র মসজিদে বসে কোরান তেলাওয়াত করে আসছে কিন্তু এই মেলার উপর এর প্রতিক্রিয়া যে কত কম তা সহজেই অনুমান করা যায়। তবুও এটি যে একটা মহৎ প্রচেষ্টা তাতে বিন্দু মাত্র সন্দেহ নেই।

ষাটগুম্বজ মসজিদ হযরত পীর খানজাহান আলীর (রঃ) দরবারগৃহ হয়ে শুধু তৎকালীন মুসলিম ঐতিহ্যের একটা ভূমিকা পালন করছেনা, বর্তমান যুগেও মুসলিম জনজীবনে এটি একটি বিশেষ ভূমিকা পালন করছে। হযরত খানজাহান আলাইহের রহমাত যে একজন উদার বৃহৎ দৃষ্টিভঙ্গি সম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন এবং তার অর্থ সমর্থ ও যে কম ছিল না তা তার এই সব কীর্তিরাজী দেখলে অতি সহজেই অনুমান করা যায়। তাই সর্বদিক দিয়ে আজও একথা বলা যায় যে পৃথিবীর বিশিষ্ট কীর্তিগুলির মধ্যে ষাটগুম্বজও একটি অন্যতম কীর্তি। আমাদের মনে হয় ষাটগুম্বজ মসজিদ ইস্রাফিলের সিঙ্গার ধ্বনি শুনতে সক্ষম হবে।

———

www.pathagar.com

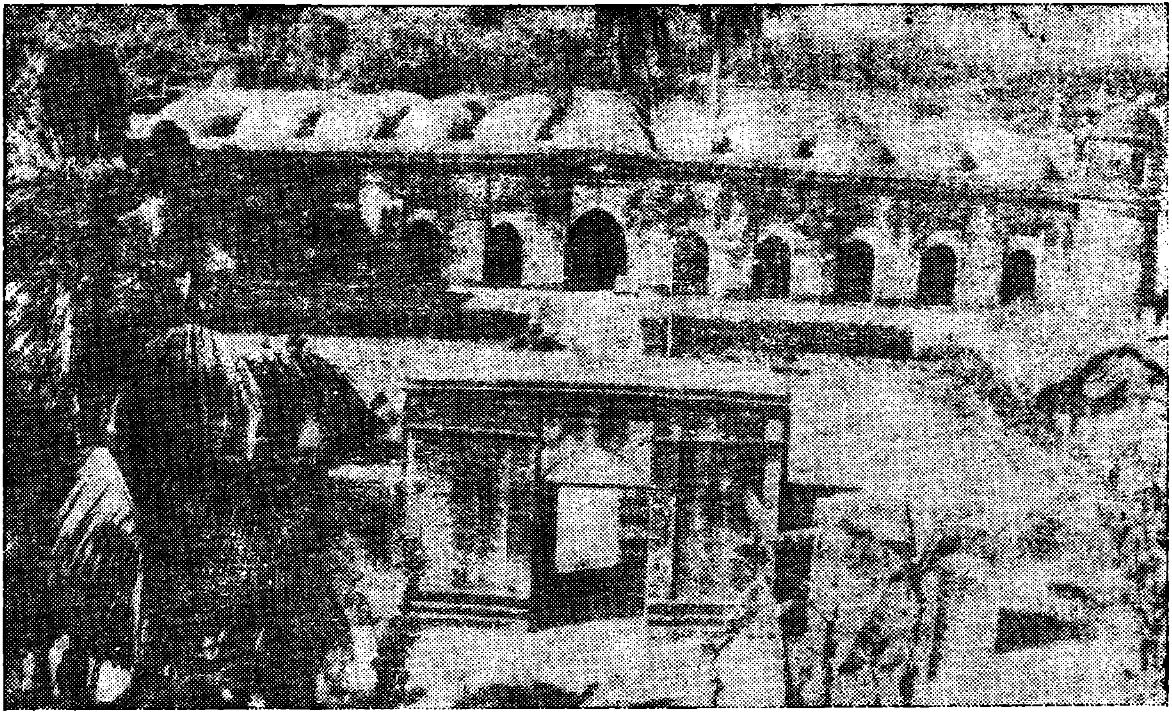

ষাট গম্বুজ মাস্‌জিদ

www.pathagar.com

॥ খলিফাতাবাদ, বাগেরহাট ও কিছু মন্তব্য ॥

খলিফাতাবাদ বা খলিফাতে আবাদ একটি বিশেষ ঐতিহাসিক নাম। হযরত পীর খানজাহান আলাইহের রহমত কর্তৃক দক্ষিণ ও পূর্ব বাংলার সমতট ভূমিতে যে ইসলাম রাষ্ট্রটী প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তারই নাম ছিল খলিতাবাদ ব খলিফাতে আবাদ। ইতিহাসের পাতায় অনেকেই এই রাষ্ট্রটির সন্ধান করে উঠতে পারেননি। কিন্তু পৃথিবীর মানচিত্রে এই বিশেষ রাষ্ট্রটির এই নামটা হযরত খানজাহান আলী (রঃ) যোগ করে দিয়েছিলেন। পূর্বে মগ ও বৌদ্ধ আমলে এর অন্য নাম ছিল কিন্তু সেই নাম বদল করে হযরত খানজাহান আলী (রঃ) এর এই নাম দিয়েছিলেন। কোন কোন ইতিহাসের পাতায় এবং মানচিত্রে এর একটি বিশেষ স্থান থাকলেও অতীব দুঃখের বিষয় এই যে এর কোন ধারাবাহিক ইতিহাস পাওয়া যায় না বা এইরূপ ইতিহাস আজও কারো হস্তগত হয়নি পর্তুগীজ মানচিত্রে এর একটি বিশিষ্ট স্থান রয়েছে। তাদের মানচিত্রে তারা একে কুইপিটাভাজ বলে আখ্যায়িত করেছেন। কুইপিট= খলিফাত, আভাজ = আবাদ। পর্তুগীজ ভাষায় খলিফাতাবাদকেই কুইপিটাভাজ বলা হয়েছে। এই রাজ্য সুদূর যশোর থেকে বাগেরহাট পর্যন্ত তিনটি অথবা চারটি পরগণায় বিভক্ত ছিল। যশোর, বেদকাশি ও বাগেরহাট। তার মধ্যে দুইটি পরগণার নাম সঠিক জানা যায় না তবে তার রাজধানী অবস্থিত ছিল বাগেরহাট হাবেলী পরগণায়। এই পরগণার কেন্দ্রস্থলে শহর গড়ে ওঠায় এই স্থানকে হাবেলী কসবাও বলা হোত। এই পরগণার মধ্যবর্তি স্থান ছিল বাগেরহাট এবং এই কারণেই ষাটগুম্বজ ও তার আশে পাশের স্থান সমূহ জুড়ে রাজধানী শহর গড়ে উঠেছিল। পরবর্তি এক সময়ে তিনি জনগণের সুবিধার জন্য তিনি চার মাইল দূরে ভৈরব নদীর মোহনায় নদীকূলে একটি ছোট শহর বা বাজার স্থাপন করেন। সেই বাজারই বর্তমান বাগেরহাটের প্রধান শহরে পরিণত হয়েছে।

www.pathagar.com

কেন এই স্থানের নাম বাগেরহাট হোল এ কথা নিয়ে বহু প্রতিবাদই এতদাঞ্চলে ছড়িয়ে রয়েছে বর্তমানে কেউ কেউ ইতিহাসের দোহাই দিয়ে এই কথা আলোচনা করেছেন যে, ইতিহাসে দেখা যায় বাংলার নিম্নাঞ্চল অর্থাৎ সমতটভূমি এক সময় ছিল বৌদ্ধদের আবাসভূমি। বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী বিখ্যাত সুবর্ণ বণিকের দেশ ছিল এই নিম্ন বাংলা কিন্তু রাজা শশাঙ্ক বৌদ্ধ ধর্মের বিনাশ সাধন করেন বলে তারা মনে করেন যে সুন্দরবনের ব্যাঘ্র বা বাঘের প্রাদুর্ভাবের জন্য এটি তাদেরই দেওয়া একটি নাম। সেন রাজাদের আমলেও নাকি এই স্থানও এমনি একটি নামে পরিচিত ছিল। কিন্তু এমনি একটা কি নাম সে কথা তারা সঠিক করে বলতে পারেন না তাই এ কথাকে সঠিক বলে মেনে নেওয়া যায় না। বরং এই মতবাদই নিঃসন্দেহে গ্রহণ করা চলে যে এই নামটি খলিফাতাবাদ নামকরণের সঙ্গে সম্পূর্ণভাবে যুক্ত এবং এটি হযরত খানজাহান আলী (রঃ) স্মৃতি বিজড়িত নাম। বাগেরহাটের ঐতিহাসিক গুরুত্ব আলোচনা করতে গিয়ে বাগেরহাট হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষক জনাব মোজহারুল ইসলাম তার 'A short History of Bagerhat গ্রন্থে খুব সুন্দরভাবে বলেছেন যে, "During the Sen kings of Bengal. the kingdom of Bengal consisted of five provinces of which 'Bagri" was one. Jessore and Khula were within Bagari province.

During the Pathan reign Bagerhat or Khalifatabad became prominent for the first time in recorded history Bagererhat is a recent name in comparison with Khlifatabad or the Cupitavaz as the Portugse called it. We do not know how it was know during deffirent period preceding the Muslim rule."

উপরের বক্তব্যটি খুবই প্রণিধানযোগ্য ও ইতিহাস ভিত্তিক কাজেই এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে খলিফাতাবাদ বা হাবেলী কসবা নামকরণের পর এক

www.pathagar.com

পর্যায়ে এই স্থানের নাম বাগেরহাট রাখা হয়েছিল। ভাটি বা সমতট অঞ্চলের সর্বশেষ সীমায় এই বাগেরহাট শহর স্থাপিত হয়েছিল।

বহু স্থানীয় প্রবীণ লোকের মুখে এমন একটী প্রবাদ জানা যায় যে এক সময় বিশেষ কোন কারণে প্রয়োজন দেখা দেওয়ায় ও জলদস্যুদের গতিবিধি লক্ষ্য করার জন্য ভৈরব নদীর উপকূলবর্তী এলাকায় একটী মনরম ও মুক্ত এলাকায় তিনি একটি বাগানবাড়ী নির্মাণ করেছিলেন। সাময়িক অবসর বিনোদনের জন্যও মাঝে মাঝে তিনি এখানে কয়েকদিন বসবাস করতেন। তাই সব দিকের বিশেষ অসুবিধা দূর করার জন্য বাগানবাড়ীর বাগে তিনি একটি হাট বা বাজার বসিয়েছিলেন। শোনা যায় প্রতিদিন প্রাতে এখানে বাজার বসতো। এই কারণেই এই স্থানের নাম হয়েছিল বাগেরহাট। বাগ=বাগান, হাট=বাজার এটি হযরত পীর খানজাহান আলীর (রঃ) বাগানবাড়ীর হাট বলে এটি বাগেরহাট বলে আখ্যায়িত হয়েছে।

কেউ কেউ বলেন সেই সময় ভৈরব নদীর বাঁকে অর্থাৎ মোহনায় একটি হাট বসেছিল। তাই এই স্থানকে বাকেরহাট বলা হোত কিন্তু কালে কালে স্থানীয় লোকের উচ্চারণের ত্রুটির জন্য বাকেরহাট বাগেরহাটে পরিণত হয়েছে। কেউ কেউ বলেন বাকের শাহ নামক একজন দরবেশ এখানে আস্তানা স্থাপন করেছিলেন। দীর্ঘদিন অবস্থানের পর এইখানে তিনি মৃত্যুবরণ করেন বলে তার নামানুসারে এই স্থানের নাম প্রথমে বাকেরহাট ও পরিবর্তিত হয়ে পরে কোন এক সময় বাগেরহাটে পরিণত হয়েছে।

অতএব প্রবাদের মধ্যে কোনটি যে সত্য সে কথা নিশ্চিত করে বলা দুরূহ তবুও প্রথম প্রবাদটিই সামধিক গ্রহণযোগ্য বলে মনে হয়; কারণ একথা এক রকম নিশ্চিতের মত জানা যায় যে খলিফাতাবাদ পরগণায় নছরত শাহ ও তদ ভ্রাতা মাহমুদ শাহের টাকশালটি হযরত খানজাহান আলীর (রঃ বাগান বাড়ী সন্নিকটেই অবস্থিত ছিল। জানা যায় কোন এক সময় বাগেরহাটে মিঠে পুকুরের পাড়ে নছরত শাহ ও মাহমুদ শাহের নামের কয়েকটা টাকা পাওয়া

www.pathagar.com

গিয়েছিল এবং সেই টাকা আজও কলকাতা যাদুঘরে রক্ষিত হয়েছে। যুগের ইতিহাসের সঙ্গে এই প্রথম প্রবাদটির মিল রয়েছে বলে এই প্রবাদটি বাগেরহাট নামকরণের সত্যের মর্য্যাদা লাভ করতে সক্ষম হয়েছে এবং হযরত পীর খানজাহান আলীর (রঃ) দেহ ধারণ করে এই বাগেরহাটের মাটি ধন্য হয়েছে। সাত শত বৎসরের ইতিহাসের সাক্ষী ধারণ করে বাগেরহাট আজ একটা ঐতিহাসিক নামে পরিণত হয়েছে।

হযরত পীর খানজাহান আলীর (রঃ) জীবনের শেষ দিকে হাবেলী খলিফাতাবাদ একটি বৃহৎ শহরে পরিণত হয়ে ও বন্দর শহররূপে পরিণত হয়ে হাবেলী কসবা নাম ধারণ করেছিল। এই শহর ছিল জনবহুল ও লোক বসতীপূর্ণ। এখানে বহু ইমারত ও ইটের কাঁচা বাড়ী তৈরী ছিল যার ধ্বংসাবশেষ আজও বিদ্যমান রয়েছে। এই শহরে যে পাকারাস্তাগুলি তৈরী হয়েছিল সেগুলির নির্মাণ কৌশলে একটি সাতন্ত্র পরিলক্ষিত হয়। এই রাস্তার ইটগুলি ১" ইঞ্চি থেকে ১½ ইঞ্চি পুরু ও ৮ ইঞ্চি থেকে ১০ ইঞ্চি চওড়া এবং এই ইটগুলি খাড়া ভাবে সাজিয়ে রাস্তা তৈরী করা হয়েছে। শোনা যায় কুড়ি বর্গমাইল বিস্তৃত ছিল এই শহরের সীমানা। আবার শোনা যায় বাগেরহাট থেকে সায়ড়া, কেষ্টনগর মরগা থেকে বাসাবাটি কাড়াপাড়া সোনাতলা, দশানি সুন্দরঘোনা নিয়ে বিস্তৃত ছিল এই শহর।

বহুদিন পূর্বেই এই শহর ধ্বংশ প্রাপ্ত হয়েছে। মনে হয় কোন এক সময় যে কোন প্রাকৃতিক দুর্যোগে সম্ভবত জলচ্ছাসের ফলে এই শহর ধ্বংশের কবলে পতিত হয়েছিল ফলে এই এলাকা একদিন জনশূণ্য হয়ে পড়ে এবং ক্রমে ক্রমে শহরটি ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। ষাটগুম্বজ মসজিদের আশে পাশে গ্রামে এবং সুন্দরঘোনা গ্রামের মধ্যে এইরূপ অনেক ধ্বংশাবশেষ দেখা যায়। স্থানীয় অনেকে পাশে পুকুর ও মধ্যম ধরণের অনেক ইটের স্তুপ দেখে কারো মাজার ভেবে খুড়ে দেখে দেখা গেছে যে মূলতঃ এগুলি বাড়ী ছিল। এই শহরের রাস্তা ঘাট বাড়ী ঘর ও মসজিদগুলি ধ্বংশপ্রাপ্ত হয়েছে সেগুলি

www.pathagar.com

আজও অক্ষুন্ন অবস্থায় থাকতো যদি স্থানীয় কোন কোন লোক বিভিন্নভাবে সেগুলিকে নিজেদের কাজে ব্যাবহার না করতো। এমনও দেখা গেছে যে এইরূপ কোন কীর্ত্তি যদি কোন লোকের জায়গার মধ্যে পড়েছে তা হলে সেটি ভেঙ্গে তার ইট ঠিকাদারের কাছে বিক্রী করেছে। সরকারের উদাসীনতার ফলেই স্থানীয় অজ্ঞ জনগণ ইতিহাসের এতগুলি সাক্ষীকে মুছে ফেলতে সক্ষম হয়েছে। বর্ত্তমানে সরকারের দৃষ্টি এদিকে পড়েছে বলে মনে হয়। সরকারের উচিত বিভিন্ন প্রকার অনুসন্ধান চালিয়ে মুসলিম যুগের একটি গৌরবময় অধ্যায়ের সঠিক ইতিহাস উদ্ধার করার প্রচেষ্টায় লিপ্ত হওয়া।

এই শহরের গুরুত্বপূর্ণ দুইটি প্রধান রাস্তা ছিল যার চিহ্ন আজও বিদ্যমান রয়েছে। রাস্তাটি কতদুর বিস্তৃত ছিল বলা যায় না তবে ঘোড়া দীঘির দক্ষিণ পাড়ের নীচ দিয়ে খানজাহান আলী দরগা পর্য্যন্ত রাস্তাটির চিহ্ন বিদ্যমান রয়েছে এবং আর একটি রাস্তা মরগা গ্রামের নিকটবর্ত্তী জাহাজঘাটা থেকে এসে তার বাসগৃহের সম্মুখ ভাগ দিয়ে এই রাস্তার সঙ্গে মিশেছে। জাহাজ ঘাটা থেকে কিছু দুরে এসেই সোনা বিবির বাড়ী অর্থাৎ তার বাসগৃহ অবস্থিত ছিল। এই প্রাসাদের মধ্যেই ছিল একটি এক গুম্বজ বিশিষ্ট ছোট মসজিদ একে সোনা বিবির মসজিদ বলা হোত। মসজিদটির চিহ্নও বর্ত্তমানে আর নেই। প্রথম কাড়াপাড়ার জমিদারও পরে জনসাধারণ এর নিবাস সাধন করেছেন। এই বাড়ীর ভিতরে যে পুকুরটী রয়েছে আজও সেটি বিচ পুকুর নামে পরিচিত। এই প্রাসাদটী ষাটগুম্বজ মসজিদ ও তার মাজারের মধ্যবর্ত্তী স্থানে, বর্ত্তমান কাঠালতলা নামক স্থানের সন্নিকটে মরা ভৈরবের কুলে অবস্থিত ছিল তার ধ্বংসাবশেষ আজও বিদ্যমান রয়েছে। কিয়দ্দুরে ছিল তার প্রাসাদের তোরণ দ্বার। এই তোরণ দ্বারে ভগ্নাবস্থা ছোটবেলায় আমরা দেখেছি কিন্তু বর্ত্তমানে তোরণ দ্বারের চিহ্নটীও খুজে পাওয়া যায় না। কোন এক সময় তার ইট বিক্রী হয়ে গেছে। এই তোরণ দ্বারের অপর পাড়ে একটী প্রকাণ্ড অট্টালিকার ভগ্নাবশেষ পরিলক্ষিত হোত। এটী সকলের নিকট

www.pathagar.com

কোতয়ালী চৌতারা বলে পরিচিত ছিল। এই কোতয়ালী চৌতারার চিহ্নটিও বর্ত্তমানে আর নেই। একদিন লোকে এই নামটীও ভুলে যাবে। এই কোতয়ালী চৌতারার গঠন প্রণালী ছিল নূতন ধরণের। হাজার বছর পূর্বের সে যুগের মুসলিম সভ্যতার এটা ছিল একটা বিশিষ্ট নিদর্শন। এর ছাদ ছিল গুম্বজ বিশিষ্ট কিন্তু এর চারিদিকের বাজুর মধ্যেই জানালাসহ বড় বড় চারটী কামরা প্রস্তুত করা ছিল। স্থানীয় খোন্দকার বংশের শেষ পীর নানাজী খোন্দকার ইসহাক উদ্দিন সাহেবের কাছ থেকে এই কোতয়ালী চৌতারার বর্ণনা সংগ্রহ করা হয়েছে। তিনি ১১০ বৎসর জীবিত ছিলেন। তিনি বলেন এই দালানটীর ছাদ ৬টি গুম্বজ বিশিষ্ট ছিল। কাড়াপাড়ার তৎকালীন প্রতাপ-শালী জমিদার নিশিকান্ত রায় ও তদীয় ভ্রাতা উমাকান্ত রায় তাদের একটী কাছারী বাড়ী তৈরী করার প্রয়োজনে ইতিহাসের এই চাবি কাঠিটী ভেঙ্গে এই দালানের ইট তাদের কাজে লাগিয়েছিলেন। শোনা যায় এই দালানের এক বাজুর একটী কামরার মধ্যে আরবী ও ফার্সিতে লিখিত অনেক পুস্তক, নথিপত্র ও দলিল দস্তরাদি তারা হস্তগত করেছিলেন। নানাজী বলেছিলেন, আমি আরবী ও ফার্সি জানতাম বলে একবার আমাকে জমিদার বাড়ীতে ডাকা হোল। আমি উপস্থিত হলে কিছু সময় পরে আমাকে একটী কক্ষে নিয়ে গিয়ে ২টী পুস্তকসহ কিছু কাগজপত্র পড়তে দিয়ে প্রণব বাবু বললেন আমি যেন এ কথা কাউকে না বলি, কোন গুপ্ত ধনের সন্ধান এর-মধ্যে লিপিবদ্ধ আছে কিনা? তিনি জানতে চাইলেন? তার মধ্যে ছিল একটী হস্ত লিখিত কোরান, আরবীতে লিখিত তাহতাবি একটী মছলার গ্রন্থ ও ফার্সিতে লিখিত মেটে রংয়ের তৈজসপত্রের কিছু চিঠি। তার মধ্যে মাহমুদ শাহের নিজ হস্তে সহি করা, "হুজুরে খানজাহান" সম্বোধন করে একটী নির্দেশনামাও দেখেছিলাম। তারপর সেগুলি আবার তুলে রাখা হয়। এই কোতয়ালী চৌতারা ছিল এই শহরের প্রধান কেতয়াল বা নগর রক্ষির সদর দপ্তর। কাজেই এই দপ্তরে ইতিহাসের অনেক রেকর্ড থাকাই

সম্ভব ছিল। এই কেতয়ালী চৌতারার নিকটের রাস্তাই ছিল নগরে প্রবেশের প্রধান পথ। এই কেতয়ালী চৌতারার চিহ্নও আজ আর অবশিষ্ট নেই। মাটী খুড়েও এর ইট বের করে নেওয়া হয়েছে। আরও কিছুদিন পরে হয়তো এই কেতয়ালী চৌতারার কথা কারো মনেই থাকবে না।

এই স্থানের অনতি দূরে মরগার হাটের নিকটবর্তী জাহাজ ঘাটায় লম্বা একখণ্ড পাথর আজও পোতা রয়েছে। এই পাথরটিতে একটী মূর্তি অঙ্কিত থাকায় স্থানীয় হিন্দুগণ বহুদিন ধরেই এই পাথরটীতে থালাভর্তি ফুল ও প্রসাদ বোতল ভর্তি তেল ও কৌটা ভর্তি সিন্দুর দিয়ে পূজা করে থাকেন। পূজা শেষে হিন্দু মহিলাগণ নানা হাজত, মানত, আবেদন, নিবেদন, করে থাকেন ও পাথরটীকে প্রত্যহ দুধ পান দিয়ে স্নান করিয়ে দেন। কিন্তু এই পাথরটীতে যে কার মূর্তি খোদাই করা তা সঠিক বোঝা মুশকিল। কেউ বলেন কৃষ্ণ, কেউ বলেন বিষ্ণু। কেউ ভক্তি গদগদ ভাবে বলেন একে যে যাই ভাবে ইনি সেই রূপেই দেখা দেন। মোট কথা এটী যেই খোদাই করে থাকুক না কেন তিনি খুব দক্ষ শিল্পীর পরিচয় দেননি। অনাড়ি হাতে কোন্ ভগবান যে তিনি তৈরী করেছেন তা ভাল করে বোঝা মুশকিল। এই পাথরটীকে নিয়ে কয়েকটি প্রবাদ প্রচলিত রয়েছে। কেউ কেউ বলেন, এই পাথরটি খানজাহান আলীর (রঃ) পাথরের সঙ্গেই এসেছিল কিন্তু পাথরটিতে একটা মূর্তি খোদাই দেখতে পেয়ে পাথরটাকে বাদ দেওয়া হয়। কেউ বলেন এই পাথরটি গেড়ে হযরত খানজাহান আলীর (রঃ) পাথরের জাহাজ বাধা হয়েছিল। স্থানীয় পালেরা ভাল শিল্পী ছিল বলে কোন এক সময় যে কেউ পাথরটিতে এই মূর্তিটী খোদাই করেছে। এই পাথরের আকৃতি দেখে মনে হয় এটি হযরত খানজাহান আলীর (রঃ) যে কোন অট্টালিকার একটি থাম্বার পাথরের অনুরূপ এর মধ্যখানে একটি ছিদ্র আজও বিদ্যমান রয়েছে যার ভিতর দিয়ে একটি লোহার ছিব বসানো হোত। সোনা বিবির বাড়ীর আশে পাশে আজও এমন অনেক পাথর পড়ে রয়েছে। এটি তেমনি একটি পাথর ছাড়া অন্য কিছু

www.pathagar.com

নয়। সম্ভবত কোন এক সময় এই একখণ্ড পাথর সংগ্রহ করে কোন হিন্দু শিল্পী এই মূর্তিটি খোদাই করে এই খানে স্থাপন করেছেন। জানা যায় কাড়াপাড়ার জমিদারের পৃষ্ঠপোষকতায় স্থানীয় পালেরা সর্ব প্রথম এখানে পূজার প্রচলন করে।

এই পাথর সম্পর্কে বলতে গিয়ে স্থানীয় মতিয়ার রহমান নামক একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি বলেন যে পালেদের মিথ্যা প্রচারে বিরাক্ত হয়ে একবার আমরা পাথরটিকে সরিয়ে ফেলেছিলাম কিন্তু মুরব্বীদের নির্দেশে আবার এটিকে তাদের ফেরত দেওয়া হয়। আমার নানাজী বলেন যে এই পাথরের অস্তিত্ব এখানে খুব বেশি দিনের নয়। যৌবন বয়সে মরগার হাটে হাট করতে এসে তিনি পাথরটিকে দেখেছেন বলে মনে করতে পারেন না। মগরা'র পালদের উদ্দেশ্যে তিনি বলেন, "তারা কখন যে এই কাজটি করলো আমরা ঠিক করতেই পারলাম না।" এই পাথর সম্পর্কে প্রতিবাদের অনেকবিছু থাকলেও জমিদারদের জন্য তারা কিছুই করতে পারেননি। ফলে হিন্দুদের সে দেবতাই হোক না কেন হযরত খানজাহান আলীর (রঃ) স্থায়ী আসন গেড়ে বসে রইল।

হাবেলী খলিফাতাবাদ পরগণায় ইতিপূর্বে কোন পাথর ছিল না। হযরত খানজাহান আলীই (র) প্রথম ব্যক্তি যিনি এদেশে সর্বপ্রথম প্রচুর পাথর আমদানী করেছিলেন। তৎকালে হিন্দু সভ্যতার বিকাশ সাধন এদেশে ঘটেছিল বলে জানা যায় না বা তেমন কোন নিদর্শনও দেখা যায় না। একটি বৌদ্ধ মূর্তি আবিষ্কৃত হয়েছিল বলে জানা যায়। সেই মূর্তিটিকে বাগেরহাট থেকে চার মাইল দূরে শিববাড়ী নামক স্থানে স্থাপন করে তাকেই শিব বলে পূজা করা হয়। কাজেই দেখা যায় পাথরের কোন রূপ কোন কার্যকলাপের মধ্যে এদেশের হিন্দুদের কোন অবদান নেই

---

www.pathagar.com

হযরত খানজাহান আলী (রঃ) তার কীর্ত্তিগুলিকে লবনাক্ত জল হাওয়া থেকে রক্ষা করা ও একে দীর্ঘস্থায়ী করার জন্যই সুদূর গৌড় ও রাজস্থান থেকে এ দেশে এই পাথর আমদানি করেছিলেন। কিন্তু এই পাথর আমদানি করা সম্পর্কে ভিন্নরূপ একটি কেরামতির গল্প প্রচলিত আছে। গল্পটি এইরূপ যে, তিনি চিটাগাং থেকে এই পাথর সমুদ্রপথে পানিতে ভাষিয়ে নিয়ে এসেছিলেন। তার হুকুমে চিটাগাং এর পাহাড় থেকে নেমে পানিতে ভেসে এই পাথর এখানে চলে এসেছিল। তার পাথরের প্রয়োজন হওযায় প্রথমে তিনি চিটাগাং এ হযরত বায়েজিদ বোস্তামি (রঃ) নিকট পাথর চেয়ে পাঠান। কিন্তু তিনি তাঁকে পাথর দিতে অস্বিকার করে বলেন যে "দেড় বুড়ির ভারানি তার চাটিগার বরাত।" এই কথাশুনে হযরত খানজাহান আলী (রঃ) নিজেই তাঁর কাছে হাজির হন এবং নম্রতার সঙ্গে তার নিকট পাথর প্রার্থনা করেন। হযরত খানজাহান আলী (রঃ) তার মুরিদ ছিলেন বলে তিনি সদয় হয়ে জিজ্ঞাসা করেন তুমি কেমন করে পাথর নিয়ে যাবে? তিনি বলেন আপনি অনুমতি করলে আমি নিয়ে যেতে পারি। তখন তিনি অনুমতি দেন ও হযরত খানজাহান আলী (রঃ) পাথরকে হুকুম করলে পাথর জলে ভেষে জাহাজ ঘাটায় চলে আসে।" এই গল্প যারা রচনা করেছেন তারা এইরূপ গানও রচনা করেছেন, যে—

তোমার নামে পাথর ভাসে
জলের কুমীর ডাকলে আসে, ইত্যাদি।

কিন্তু এই গল্পের ভীত্তি বা মিল কোথায় তা তারা একবারও ভেবে দেখেননি।

www.pathagar.com

আল্লার অলি বা আউলিয়াদের কেরামতির কথা আমি অস্বীকার করিনা বরং সবারই কিছুনা কিছু কেরামতি থাকাটাই স্বাভাবিক কিন্তু প্রশ্ন হোল এত বড় একটা ঘটনার যে স্থানে এসে পরিসমাপ্তী ঘটলো সে স্থানের নামটা পাথরঘাটা না হয়ে জাহাজঘাটা হওয়াটা কি ঠিক হয়েছে? প্রকৃত কথা পাথর জাহাজে এসেছিল বলে এটি জাহাজঘাটানাম হয়েছে। দ্বিতীয়ত যে ধরনের পাথর দ্বারা এই সব ইমারত তৈরী করা হয়েছে এই ধরনের পাথরের অস্তিত্ব চিটাগাং এ কোন দিনই খুজে পাওয়া যায় না। পাথর ভাসিয়ে আনা তারমত অলির পক্ষে অসম্ভব মোটেই নয়. কিন্তু প্রকৃত ঘটনা অন্যরূপ।

তবে পটুয়াখালী জেলা থেকে এই বাগেরহাট পর্য্যন্ত অনেক স্থানের নাম পাথরঘাটা রয়েছে। এই নামগুলি হযরত খানজাহান আলীর (রঃ)র পাথরের স্মৃতিই বহন করে রেখেছে। এই সকল স্থানে পাথরের জাহাজগুলিই নঙ্গর করেছিল। পাথরগুলি জ্যান্ত কোন প্রাণির মত ঝাক ধরে জড়াজড়ি করতে করতে ঘাটে ঘাটে বিশ্রাম নিয়ে ঠুন খেতে খেতে কোথাও কোথাও দু একটা পড়ে গিয়ে ভেসে এসে পৌছায় নাই এবং হযরত বায়জীদ বোস্তামির এই কাহিনীর সঙ্গে জড়িত থাকবারও কোন যৌক্তিকতা নেই। হযরত খানজাহান আলী (রঃ) কোন অবস্থাতেই হযরত বায়োজিদ বোস্তামির মুরিদ হতে পারেন না. কারণ ইতিহাস স্বাক্ষ্যদেয় যে হযরত বায়জীদ বোস্তামি (রঃ) হযরত খানজাহান আলী (রঃ)র প্রায় পাঁচ শত বৎসর পূর্বে মৃত্যু মুখে পতিত হয়েছেন। দ্বিতীয়তঃ চট্টগ্রাম বাস করা দূরের কথা তিনি এ দেশে কোন সময় আগমন করেছিলেন বলে জানা যায় না। চিটাগাং এ তার মাজার সম্পর্কেও

www.pathagar.com

শোনা যায় সে এটি তার প্রকৃত মাজার নয়। বোস্তাম শহরেই তার মাজার রয়েছে। অনেকে বলে থাকেন এটি তার চিল্লার মাজার। কাজেই তাদের সঙ্গে দেখা হওয়া বা গুরু শিষ্য সম্পর্ক স্থাপন করা মোটেই সম্ভব নয়। চট্টগ্রাম থেকে যদি কিছু পাথর তিনি এনেও থাকেন নিশ্চয় তিনি তা জাহাজ যোগে এনেছিলেন এবং এই জাহাজ এসে ভিড়েছিল খলিফাতাবাদ রাজ্যের বন্দর জাহাজ-ঘাটায়। তবে ভৈরব নদীর মরে যাওয়ার কারণ সম্পর্কে একটি প্রবাদে জানা যায় যে জাহাজ ঘাটার অদূরে এই নদীর মোহনায় ২টি পাথরের জাহাজ ডুবি হয়েছিল। যদিও খানজাহান আলী (রঃ) কেরামতির ফলে সমস্ত মূল্যবান পাথরগুলি তোলা হয়েছিল কিন্তু জাহাজ দুটি তোলা সম্ভব হয়নি ফলে নদীতে চর পড়ে নদীটি মরে যায়। কোন এক বোজর্গ বলেন, রাজস্থানের পাথর জাহাজে এলেও চিটাগাং এর পাথর পানিতে উজানেই ভেসে এসেছিল।

কোন অলিআল্লার কেরামতিকে আমি অস্বীকার করতে চাইনা তবে স্বভাবতই দেখা যায় যে অলি আল্লারা সব সময়ই আত্মগোপন করে থাকতে ভাল বাসেন, কোন জাহেরি কেরামতি তারা দেখাতে চান না। কোন সময় তাদের কেরামতি জাহির হ'য়ে পড়লে তারা ইহজগত ত্যাগ করেন। হযরত খানজাহান আলী (রঃ) যিনি তার ব্যক্তিগত ইতিহাস ও মুল নামটি পর্য্যন্ত গোপন রেখেছেন তিনি এত বড় জাহেরি কেরামতি দেখিয়েছেন বলে আমার মনে হয় না। কেরামতি অর্থে মানুষ সাধারণতঃ এইটুকু বোঝেন, যে এমন কোন অসাধারণ কাজ করা যা মানুষের অসাধ্য। যে কাজ দেখে সাধারণ মানুষ বিস্মিত হয়ে যায়। কিন্তু আল্লার রহমতের মাধ্যমে মানুষের ধারণা বহির্ভূত যে কাজ অলিআল্লা দ্বারা সাধিত হয়, তাই তার

www.pathagar.com

কেরামতি। তাই যদি হয় তবে হযরত খানজাহান আলি (রঃ) যে সব কাজ ও কীর্ত্তি রেখে গেছেন তা সবই কেরামতিতে ভরপুর। তার দীঘি. তার মছজিদের পাথরের স্তম্ভগুলি দেখলে, মানুষের তৈরী বলে লোকে বিশ্বাস স্থাপন করতে পারে না। সাধারণ মানুষ বলে বসে যে তিনি জীনদের দ্বারা এই সব কাজ একরাত্রে ক'রেছেন। কিন্তু জীনদের এত বড় দুষমন তিনি ছিলেন না। তার এতগুলি কীর্ত্তির পিছনে যদি আল্লার রহমত ও নেক দৃষ্টি না থাকতো তবে এ গুলি শত শত বৎসর ধরে টিকে থাকার ক্ষমতা অর্জন করতো না। কাজেই তার কেরামতি জাহির করবার জন্য অসামঞ্জস্য ও অলিক গল্প তৈরী করার কোন প্রয়োজন আছে বলে আমি মনে করি না। জীনদের তাবেদার বানিয়ে কোন অসাধারণ কাজ করলে তাকে কেরামতি বলা চলে না।

এই মাজারে এ রকম ১১ জন ফকিরের সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হয়েছে যারা ২১টি খারাপ জিনকে তাবেদার বানিয়ে তাদের দ্বারা কিছু ভোজবাজি দেখিয়ে বা কিছু ওঝালি ক'রে তাদের রুজির বন্দবস্ত করে থাকে। তাদের উত্থান ও পতন আমার সম্মুখেই ঘটেছে। কিছু দিন পুর্ব্বের ঘটনা; মরহুম সৈয়দ গোলাম মোক্তাদির হোসেন সাহেব ছিলেন একজন বিশিষ্ট আলেম ও বোজর্গ ব্যক্তি। বৃদ্ধ বয়সে তিনি হুজুরের মাজার জেয়ারতের জন্য এবং তার শাশুড়ি আম্মার মাজার জেয়ারতের জন্য প্রায়ই দরগায় চলে আসতেন। পরিচয় সুত্রে প্রায়ই আমাদের বাড়ীতেও যেতেন। এই সময়ের ঘটনা এখানে একজন নামধারী দরবেশের উদ্ভব হয়েছিল। তার নাম ছিল সুন্দর আলী দরবেশ। কিছু দিনের মধ্যে অনেকেই

www.pathagar.com

তার দোয়ার ভিখারি হ'য়ে পড়লো। ২ | ১টি অসাধারণ কাজও নাকি সে দেখিয়েছিল। লোকে ব'লতো পানির উপর থেকে তাকে হেটে যেতে দেখেছে। দীঘি পাড়ি দিয়ে যেতে দেখেছে। রাত্রে সে বাঁশি বাজালে সাপ এসে ভিড় করে। সুন্দর বনে তার আস্থানাও ছিল। তাকে বাঘে কিছু বলতো না। সে আগুন জ্বালিয়ে সাধনা করতো এবং একদমে সে একটি গাজার কলকি ফাটিয়ে দিতে পারতো। এতবড় দরবেশের মৃত্যু হয়েছিল তারই এক ভক্তের হাতে। ভক্ত তার স্ত্রী ও তার পীরকে একই ঘরে এক সঙ্গে দা দিয়ে হত্যা করেছিল। যার ময়না তদন্ত হয়েছিল এই বাগেরহাটেই।

এই দরবেশকেই একদিন আমি সৈয়দ গোলাম মোক্তাদির সাহেবের পায়ে ধরে ক্ষমা চাইতে দেখেছিলাম। মসজিদের উত্তর দিকে তেতুল গাছের নিচে সে তার ভক্তবর্গ নিয়ে বসেছিল। এই সময় তার "ভর" হয়েছিল বলে সে মাঝে মাঝে কিছু একটা বলে চিতকার করে উঠছিল। এই সময় মোক্তাদির সাহেবের জিয়ারতে ব্যঘাত ঘটায় তিনি হঠাৎ আমাদের বাড়ীতে চলে আসেন। তখনই এই নাটকীয় ঘটনা। সে দৌড়ে এসে তার পায়ে ধরে পড়লো। পরে তিনি তওবা পড়িয়ে তাকে ক্ষমা করে দিয়েছিলেন। পরে জিজ্ঞাসা করে জেনেছিলাম যে ওর কাছের ২টা বদ জীনকে তিনি নাকি কেমন করে শায়েস্তা করেছিলেন যার ফলে তার শক্তি নষ্ট হয়ে গিয়েছিল।

হযরত খানজাহান আলী (রঃ) সুন্দর আলীদের দলের লোক ছিলেন না। জীনদের তাবেদার বানিয়ে কিছু করবার তার প্রয়োজন হোত না। তিনি ছিলেন আল্লার রহমতের মোহতাজ তাই আল্লার

www.pathagar.com

রহমতও ছিল তার প্রতি অফুরন্ত। এখানে এলে সকলের মনে যে আনন্দ প্রবাহিত হয় তা আল্লার রহমতেরই প্রতিক। অন্য কোন যাদু এখানে নেই। এখানে এলে মানুষ দুনিয়ার দুঃখ বেদনাকে ভুলে যায়, যারা নাস্তিক তাদের মনেও আল্লার প্রতি বিশ্বাসের উদয় হয়। যে আল্লাকে বিশ্বাস করেনা, পুর্ণ নাস্তিক, এখানে এসে হঠাৎ তাকে নামাজ পড়তে দেখে জিজ্ঞাসা করেছি যে, কি ব্যপার নামাজ পড়া ধরলে নাকি? লজ্জার সাথে, কৈফিয়তের সুরে সে উত্তর করেছে—'বলা যায় না যদি আল্লা থেকেই থাকে তবে মরে গেলে একটা মুসকিলই হয়ে যাবে। তাই অবসর সময়ের একটা কাজের মত, নামাজটা পড়াই ধ'রলাম।" হযরত খানজাহান আলী (রঃ) কীর্ত্তি ও তাঁর সমস্ত পরিবেশের মধ্যে এরূপ কেরামতিই ছড়িয়ে রয়েছে। কিন্তু অতি দুঃখের বিষয় স্থানীয় অনেকের মনেই হুজুরের পরিবেশের এই ইংগিত ও কেরামতি আছর করেনি। তাদের মনে স্থায়ীভাবে আছর করেছে সুন্দর আলীর কেরামতি। মাজারের অনেক খাদেমদের মধ্যে সুন্দর আলীর দাপটটাই বেশী। এদের কেউ কেউ তার নামের স্মৃতি স্বরূপ পুত্রের নামও রেখেছেন সুন্দর আলী। আর তার সেই মোজেজার গাজার কলকিটা ২/৩ জন খাদেমের হাতে রেখে যেতে সে সক্ষম হয়েছে। তারা আস্তানার অনুকরনে এরা আস্তানাও গড়ে তুলেছে। এখানেও তাঁরা বিশেষ বিশেষ দিনে নারী-পুরুষ সম্মিলিত হয়ে ধর্মের নামে বিচিত্রানুষ্ঠান করে থাকে। আস্তানার পাশে সাইন বোর্ডে দেখা যায় যে তিনি চার তরিকার কামেল পীর। জানিনা এই মানসিকতার পরিবর্তন কবে ঘটবে।

www.pathagar.com

কয়েকটি প্রশ্নের আলোচনা

হযরত খানজাহান আলী (রঃ)র জীবনী আলোচনা করতে গিয়ে কয়েকবারই আমি বিশেষ কয়েকটি প্রশ্নের সম্মুখীন হয়েছি। তার মধ্যে ১৯৮০ সালের ৭ই এপ্রিল "খানজাহান আলী ইসলামিক রিসার্চ একাডেমি" ও "ইসলামিক ফাউণ্ডেশনের যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত এক সিম্পোজিয়াম অনুষ্ঠানে "ইতিহাসের আলোকে খানজাহান আলী" প্রবন্ধ আলোচনার পর অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তি বক্তব্য রেখেছেন যে "এই প্রবন্ধে তুর্কি মুছলমানগণ কখন বাংলায় বা গৌড় ও তার পার্শ্ববর্তি এলাকায় স্থায়ী বসতি স্থাপন করেছিলেন এবং পর্তুগীজ মানচিত্রে এর সন্ধান পাওয়া গেলেও ঐতিহাসিক অন্য কোন প্রমাণাদি আছে কি না এর বিস্তারিত আলোচনা করা হয়নি।"

এই প্রশ্নের আলোচনার প্রয়োজন আমি অস্বীকার করি না কিন্তু হযরত খানজাহান আলী (রঃ)র জীবনী আলোচনার ক্ষেত্রে এই আলোচনা প্রসঙ্গতঃ প্রয়োজন বলে মনে হয় না। তবুও এই আলোচনা করতে গেলে, ঐতিহাসিক পর্য্যালোচনায় দেখা যায় যে তৎকালে তুরস্ক একটা বীরের দেশ ও তুর্কি একটা বীরের জাতি বলে বিশ্বে পরিচিত হয়ে পড়েছিল। জাতীয় জীবনে দেখা যায় যে তারা প্রথম ছিল তাতার, অগ্নি উপাষক, নিষ্ঠুর ও নির্দ্দয় প্রকৃতির। বিশ্বের যেকোন দেশ তাদের নামে ভয়ে কেপে উঠতো। প্রাকৃতিক নিয়মে তারা ছিল অসাধারণ বলিষ্ঠ ও অনমণীয় প্রকৃতির। কিন্তু এই জাতি যখন ইসলাম গ্রহন ক'রলো, তখন তাদের জাতীয় জীবনে

www.pathagar.com

একটি অসাধারণ পরিবর্ত্তন ঘ'টলো। মনে প্রাণে তারা ইসলামের সবকিছুকেই গ্রহণ করলো এবং ইসলামের প্রচার ও প্রসারতার জন্য তারা তাদের সর্ব্বশক্তি নিয়োগ করলো। কিন্তু তাদের ইসলাম প্রচারের পদ্ধতিটা ছিল তাদের জাতীয় বৈশিষ্ট্যগত ও স্বকীয় পন্থায়। তুরস্কের অনেক আক্রমণকারীদের মধ্যে কারো কারো যে ধনলিপ্সা ছিল না এ কথা বলা যায় না। কিন্তু কখন কি কারণে তাদের এদেশে প্রথম আগমন ঘটেছিল তার কারণ সম্পর্কে ঐতিহাসিক ডক্টর আর, সি, মজুমদার বলেন, যে এদের আগমনের পূর্ব্বে বাগদাদের একজন মুছলিম পর্য্যাটক এদেশে আগমন করে-ছিলেন। এদেশ ভ্রমণের উদ্দেশ্যে যিনি প্রথম আগমন করেছিলেন তিনি হলেন আল মাসুদি। R. C. Majumdar তার outlines of ancient Indian History and Cevilization এ বলেন, "The great extent and prosperity of the Pratihara empire is also attested to by the mohamadan travellers AL-Masudi, a Natvie of Bagdad who visited India in the year 915—16 A D. It appears from his statment that the pratihara empire reached to Rashtrakuta Territory in the south and included a part of sind and Panjab.

এই প্রতিহার রাজ্যই ছিল বাংলার কনৌজ রাজধানী, পরবর্ত্তিকালের রাজধানী হোল গৌড়। দেখা যায় পর্য্যটক আল মাসুদি দেশে প্রত্যাবর্তনের পর থেকেই শুরু হ'য়েছিল এদেশে তুরস্কের মুছলমানদের আগমন। আল মাসুদি দেশে ফিরে তাঁর বর্ণনায় লিখেছিলেন "এদেশের অধিবাসীরা তাদের আত্মীয় স্বজন

www.pathagar.com

ছাড়া অন্য বিদেশীদের ম্লেচ্ছ বা Impure বলে মনে করে। তারা বিদেশীদের প্রতি অত্যন্ত নির্দ্দয় ব্যবহার করে। এমনকি তারা তাদের গৃহ থেকে তাদের একটু আগুন ও পানি পর্য্যন্ত দেয় না। বিশেষ করে মুছলমানদের এরা একেবারেই সহ্য করতে পারে না।"

আল মাসুদির এই বর্ণনার পর তুরস্কের মুছলমানগণ অন্তরে অত্যান্ত বেদনা অনুভব করেন। ও ইসলাম প্রচারের জন্য বদ্ধপরিকর হন। বিজয় পালের পুত্র জয়পালও তুরস্কের এক শাসকের সামান্য একজন উজিরের সহয়তায় কাবুল ও কনৌজে তার রাজ্য স্থাপন করতে সক্ষম হয়েছিলেন। এই জয়পালের সঙ্গেই আযমীরে হযরত খাজা মইনুদ্দিন চিশতী (রঃ)র সঙ্গে মোকাবেলা হয়। R. C. majumdar তার একই গ্রন্থে বলেন, "In the west joypala, the king of shahi Dinesty of Kabul which was founded by the Brahmin vizir of the Turkish rular towards the close of 9th century A. D. aggrandised himself at the expense of the pratihara .... He fixed his capital at Bethenda South east of Lahore."

তাই দেখা যায় এই দেশ ছিল তুর্কিদের পূর্ব্ব পরিচিত স্থান। জলপথে এদেশে আগমনের পথও ছিল এদের নখদর্পনে। তাই তুরস্কের কৃতদাসেরা পর্য্যন্ত এদেশে রাজ্য স্থাপন করতে সক্ষম হয়েছিল। দেখা যায় এই বাংলার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজশক্তি যখন শক্তিশালী হওয়ার প্রতিযোগিতায় মেতে উঠেছিল ও রাজ্য লিপসায় উন্মাদ হয়ে উঠেছিল তখন এরাই নিজেদের প্রয়োজনে শক্তিশালী

www.pathagar.com

তুর্কি জাতীকে এদেশে আহবান করে এনেছিল। এ সম্পর্কে আল মাসুদি বলেন, "যখন রাজপুতেরা মুছলমানদের বন্ধু হয়েছিল তখন কনৌজের রাজা মুছলমানদের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত ছিলেন।" while the Rastakutas ware the friends of mohamadans. The gurjara king of Kanauj was constantly at war with them." আলপতোগীন এবং সবুকতোগীন ও তুরস্কের অধিবাসী ছিলেন। এরা দুজনে ছিলেন কৃতদাস এবং সবুকতোগীন ছিলেন কৃতদাসের কৃতদাস। R. C. majumda বলেন About 960 AD. Alaptagin a Turkish slave of Somani king had carved an indipender principality in the Solaiman hill round gazni the kingdon passed on after his death to one of his Turkish slave named Sabuktagin about 975 AD.

জয়পাল মুছলমান শক্তিকে পছন্দ করতেন না বরং নিন্দা করতেন বলে এই সবুকতোগীনই তার বিরুদ্ধে প্রথম যুদ্ধ ঘোষণা করেন। ইতিহাসের শ্রেষ্ঠ বীর ও যোদ্ধা নেপোলিয়ন যাকে তার থেকেও বড় ভেবে মন্তব্য রেখেছেন, সেই সুলতান মাহমুদ ছিলেন এই সবুকতোগীনেরই পুত্র। তিনি প্রথমে খোরাসানের গভর্ণর ছিলেন কিন্তু পরবর্ত্তিকালে নিজ ভ্রাতা ইসমাইলকে পরাজিত ও বিতাড়িত করে গজনীর রাজা হন ও পরে মুছলিম খলিফার সনদ প্রাপ্ত হয়ে সুলতান উপাধি ধারণ করেন। He recieved an investiture from the Caliph and assumed the title of Sultan indicating the indipendent Sovereignty." শক্তিশালী কুতুবুদ্দীন আইবেকও ছিলেন তুরস্কের অধিবাসী।

www.pathagar.com

তারপর বল্লাল সেনের পুত্র লক্ষন সেন গৌড়ের সিংহাসনে আরহণ করেন ও ১১৮৫ খৃঃ—১২০০ খৃঃ পর্যন্ত রাজ্য শাসন করেন। তার শাসনামলে তাদের প্রচলিত কৌলিন্য প্রথার কড়াকড়ির ফলে যখন রাজ্যময় একটা চাপা অসন্তোষ ধুমায়ীত হয়ে উঠেছিল ঠিক সেই সময়ে যিনি গৌড় আক্রমণ করেন, তিনি হলেন ইখতিয়ার উদ্দিন মুহম্মদ ই বখতিয়ার। তিনি তুরস্কের খিলজি বংশের লোক ছিলেন বলে খিলজি উপাধি ধারণ করেছিলেন। তিনি বিনা যুদ্ধে গৌড় অধিকার করেন এবং পরবর্ত্তিকালে সোনারগাও পর্য্যন্ত তার রাজ্য বিস্তার করেছিলেন। তিনি ১১৯৯ খৃঃ ৩৮০ জন সৈন্যসহ রাজ্য বিজয় ও ইসলাম প্রচারে বহির্গত হয়ে প্রথমে কারমানাছা নদীর তীরে চুনার দুর্গের নিকট ২টি পরগনা দখল করেন ও ১২০০ খৃঃ মাত্র ১৪ জন সৈন্য নিয়ে গৌড় অধিকার করেন। কিন্তু মাত্র তিন বৎসর রাজত্ব করার পর তিব্বত অভিযানের ব্যর্থতার ফলে আলি মর্দ্দান নামক এক গুপ্ত ঘাতকের হাতে তিনি নিহত হন। তার গৌড় অধিকার করার পর এদেশে মুসলিম বসতি স্থাপনের উদ্দেশ্যে তিনি ৩৬০টি তুর্কি পরিবারকে এদেশে স্থায়ী বসতি স্থাপনের নির্দ্দেশ দেন।

হরেন্দ্র কুমার সরকার তার Heroes of Bengal (Edited by clifford eldridge) গ্রন্থে বলেন, "When the eternal condition of goura was such a new threatened Laksman sen, already old and worn out. Muhammad-E-Bakhtiar, a Turk of Khilji dynesty and a miliiery advanturer came to hold two Parganas near the fort of Chunar to the West of the river Karmanasa.......................and Bakhtear without opposition occupied the deserted country (goura)

and Bakhtear soon made hemself masetr of the whole Bengal.''

ইতিহাসে জানা যায় যে, বখতিয়ারের দীর্ঘকার দেহ ও অজানুলম্বিত বাহু দেখে গৌড়ের সমস্ত ব্রাহ্মনগণ বিনা যুদ্ধে রাজ্য ছেড়ে পলায়ন করেছিলেন। এর কারণ এই যে লক্ষণ সেনের রাজজ্যোতিষীর সুচিন্তিত একটি ভবিষ্যৎবাণী এইরূপ ছিল যে, তাতার বা তুর্কিদের হাতে এই রাজ্যের পতন ঘটবে। অভিযানকারীর চেহারার বর্ণনাও তিনি দিয়েছিলেন এবং এই বর্ণনার সঙ্গে বখতিয়ারের চেহারার মিলই ছিল তাদের পলায়নের কারণ। যুদ্ধ করে অহেতুক লোক ক্ষয়ে কোন ফল হবে না বলেই তারা পলায়ন করেছিলেন। গৌড় অধিকারের পর বখতিয়ার ইসলাম প্রচারে মননিবেশ করেছিলেন বলে এই সময়ে গৌড় তুর্কি মুছলমানদের স্থায়ী বাসস্থানে পরিনত হয়েছিল।

শ্রী ধনঞ্জয় দাস মজুমদার (কবিরত্ন, পুরাতত্ব বিশারদ সিদ্ধান্ত বাগিশ) তার "বঙ্গের অনন্ত সাশন্তচক্র ও ইসলাম রাষ্ট্রের ইতিহাস" গ্রন্থে বলেন, "১১৯৯ খৃঃ পাল বংশের পতনের পর বখতিয়ার উদ্দিন ১২০০ খৃঃ গৌড় অধিকার করিলেও বঙ্গের বলি বংশধরগণের সামন্তচক্রের সন্ধিবদ্ধ অনেক স্বাধীন রাজ্য অধিকার করিতে পারেন নাই ·· ·········তাহার পর ১৪৯৩ খৃঃ শক সেনাপতি বেদশশী ২ লক্ষ শক সৈন্যসহ ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করিয়া হোসেন শাহ নামে গৌড়ের সিংহাসন লাভ করেন। তিনিও এই অনন্ত সামন্তচক্র জয় করিতে না পারিয়া··· ··কণ্টক নৈব কণ্টকম নীতি গ্রহণ করিয়া হিন্দুদের ধ্বংশ ও ধর্মান্তরিত করিয়া ক্রমে ক্রমে ষোড়শ শতাব্দিতে সমগ্র বঙ্গ করায়ত্ত করেন।"

www.pathagar.com

ইতিহাসে দেখা যায়, সে এই হোসেন শাহ বাদশা ইসলাম প্রচারে ব্রতি হয়ে সমগ্র বাংলায় ইসলাম রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করে বাংলাকে করায়ত্ত করতে সক্ষম হয়েছিলেন। যদিও ধনঞ্জয় বাবু এই বইয়ে হিন্দুদের গৌরব ও বিজয় গাথা তুলে ধরে এবং মুসলিম শাসকদের একটু খাটো করার চেষ্টা করেছেন তবুও এর মধ্য থেকে ঐতিহাসিক সত্যকে খুঁজে নিতে কষ্ট হবার কথা নয়।

শুধু তাই নয় তুরস্কের কুবলাই খান সুদূর চীন পর্যন্ত শাসন করেছেন।

Eva march Tappan Ph. D তার Hiroes of meddle ags গ্রন্থে মার্কোপোলো সম্পর্কে বলতে গিয়ে বলেন। "He had gone for into asia had sold the jewlary brought from constantinople had been at the court of great Kublai Khan rular of China and now he had his brother (**Necolopolo**) had come back to Italy with a massage from the Khan to the Pope."

অন্যদিকে এই দেশে এসেছিল পর্তুগীজগণ তাদের নিতান্ত পরিচিত জলপথে। কারণ ছিল এই যে, মধ্যযুগে ভারতবর্ষের ঐশর্য্য ও সম্পদের খ্যাতি সমস্ত ইউরোপ বাসীকে প্রবল ভাবে আকর্ষণ করেছিল। তাই মুছলিম আমলে ১৪৯৮ খৃঃ ২০শে মে ১০৬ জন সঙ্গী নিয়ে ভারতের কালিকটে অবতরণ করলেন ভাস্কোডা-গামা। তিনি ইচ্ছামত জাহাজ ভর্ত্তি সোনাদানা নিয়ে দেশে ফিরে গেলেন। তার দেশের লোক যখন দেখলো যে তাদের পরীর দেশের গল্পের সবকিছুই এই মর্তলোকে রয়েছে তখন আবার এ দেশে এলেন ফ্যাক্সো আবুকার্ক। তিনি আর দেশে ফিরে গেলেন না।

www.pathagar.com

লেগে গেলেন তাদের দেশের রশদ যোগাড় করতে এবং তাদের জন্য একটি আস্তানা স্থাপন করতে। তারা এদেশের ম্যাপ তৈরী করলো, যুদ্ধ করলো সুলতানের বিরুদ্ধে। বিজাপুরের গোয়া তারা দখল করলো। ধীরে ধীরে গ্রাস করতে চাইলো তারা সমগ্র বাংলাকে এবং এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য যে পন্থা তারা অবলম্বন করলো, তা বড় নির্মম ও নিদারুন। এদেশের সম্পদ আর নারীর সৌন্দর্য্য তাদের পাগল করে তুললো। বাণিজ্যের নামে তারা শুরু করলো লুটতরাজ, ডাকাতি, খুনখারাবি। পিতা ও স্বামীকে হত্যা করে নারী ও শিশুর পরে তারা অত্যাচার চালাতে লাগলো। আরাকানে নিয়ে এদেশের অসহায় নারী ও শিশুকে তারা বিক্রী করতে লাগলো। তখন সমুদ্রপথে জলদস্যু হয়ে এরা উপকুল ও বনজঙ্গল পর্য্যন্ত চষে বেড়িয়েছে। বাংলার বুকে এই ফিরিঙ্গিরা তখন বাঘের চেয়েও হিংস্র ও কুমিরের চেয়েও নৃশংস।

কিন্তু এর পরের ইতিহাস তাদের বড়ই করুন। সম্রাট জাহাঙ্গীরের সময়ে কাশিম খানের হাতে তারা নিশ্চিহ্ন হয়। এই সময়ে তারা যে মানচিত্র তৈরী করেছিল তাতেই এই খলিফাতাবাদ রাজ্যের নামের উল্লেখ আছে। এই কথাটা পাশাপাশী মনে রাখলেই এ প্রশ্নের সমাধান মিলবে যে হযরত খানজাহান আলী (রঃ) মৃত্যুমুখে পতিত হন ১৪৫৯ খৃঃ। আর ফিরিঙ্গী নেতা এদেশে আসেন ১৪৮৯ খৃঃ। তখনও খলিফাতাবাদ রাজ্যের নাম কোনমতেই মুছে যেতে পারে না।

তবে এই রাজ্যের কোন ধারাবাহিক ইতিহাস নেই। এ সম্পর্কে রমেশচন্দ্র মজুমদারের একটি মন্তব্য খুবই প্রনিধান যোগ্য। তিনি বলেন,

www.pathagar.com

"One of the gravest defect of Indian culture which dely nrtional explanation is the aversion of Indians to writing history. They applied themselves to all concievable brances of litature acd excelled in mny of them but they never seriously took to the writing of history."

ভারতীয়দের সে যুগে ইতিহাস লেখার দিকে বিশেষ কোন লক্ষ্য ছিল না কিন্তু কাব্য সাহিত্য দর্শন সবদিকেই তাদের পরিপক্ক হাত ছিল। যদিও কেউকেউ লিখেছেন সেখানে অনেক ঘটণা লিপিবদ্ধ হয়নি। এই একই কারণে খলিফাতাবাদ রাজ্যের ইতিহাসের প্রতিও উদাসিনতা দেখানো হয়েছে কারণ এটি ছিল গৌড়ের অন্তর্ভুক্ত। তিনি নিজে কোন স্বাধীন রাজা ছিলেন না। নাছিরউদ্দিন মাহমুদ শাহের অধিনে কয়েকটি পরগনার শাসনভার গ্রহন করেছিলেন মাত্র। তবুও তার সম্পর্কে ইতিহাসের অনেক সাক্ষ্য রয়েছে। তার ৩৬০টি দীঘি ও ৩৬০টি মাছজিদের কথা শুনে অনেকে নিশ্চিত মনে করেন যে তিনি তুরস্কের অধিবাসী ছিলেন। কারণ সংখ্যাগত দিক থেকে তুর্কিদের জাতীয় জীবনে যে ৩৬০ সংখ্যার প্রভাব দেখা যায় তা তুর্কিদেরই জাতীয় ঐতিহ্য। তুর্কিদের বিজয় অভিযান যেখান থেকে শুরু সেখানেই এর বীজ নিহিত ছিল। মুছলমান হবার পর ৩৬০ জন সৈন্য এবং জনপ্রতি ১টি ঘোড়া ১টি তলোয়ার, ঢাল ও বর্শা, এর ফলেই তাদের প্রথম বিজয় আসে আর সেই থেকেই তাদের উপর এই ৩৬০ সংখ্যার প্রভাব বিস্তার লাভ করে।

আবার কেহ কেহ মনে করেন যে তুর্কিরা মুছলমান হবার পর মুছলিমদের বদর যুদ্ধের সময়কার সমগ্র মুছলিম পুরুষদের

www.pathagar.com

সংখ্যাকে তারা বিজয় প্রতিক হিসাবে গ্রহন করে। (মওলানা শামছুল আলম মোহাদ্দেস) এই প্রতিকের প্রভাব সামগ্রীকভাবে তাদের জাতীয় জীবনে প্রতিফলিত হয়েছে যার নিদর্শন আমরা তাদের বিভিন্ন কাজকর্মে দেখতে পাই। কাজেই ইতিহাসের এইরূপ স্পষ্ট নিদর্শনের মধ্য দিয়ে এরূপ একটা নির্দিষ্ট সিদ্ধান্তে পৌছানো আমাদের পক্ষে সম্ভব যে হযরত খানজাহান আলী (রঃ) মূলত তুরস্কের অধিবাসী ছিলেন এবং তুরস্কের কৃষ্টি ও সভ্যতাই তখন থেকে এদেশে বিস্তার লাভ করেছিল। এদেশের নামিদামি লোকদের ঘরে খুজলে আজও তুর্কি টুপি পাওয়া যাবে।

হযরত খানজাহান আলী (রঃ)র সর্ব্বশ্রেষ্ট কির্ত্তী

হযরত খানজাহান আলী (রঃ)র সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কীর্ত্তি কোনটি? আলোচনা করতে বসলে অনেকের মধ্যে প্রায়ই মতবিরোধ দেখা দেয়। কেহ বলেন ষাটগুম্বজ মছজিদই তার সর্ববৃহৎ ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কীর্ত্তি আবার কেহ বলেন তার মাজার মছজিদ ও দিঘী মিলে যে পরিবেশ তিনি সৃষ্টি করেছেন এবং যে প্রসস্তি এখানে বিরাজিত রয়েছে তাতে এইটিই তার সর্ব্বশ্রেষ্ট কীর্ত্তি বলে বিবেচনা করা যায়। এই সমস্ত মতামতের বিরুদ্ধে কোন মন্তব্য রাখা বা কোন পক্ষ সমর্থন করা সম্ভব নয়। কারণ তার কোন কীর্ত্তিটি যে মানুষের বিস্ময় সৃষ্টি করেনা এবং শ্রেষ্ট স্থাপত্য শিল্পের নিদর্শন নয় এটাই আমার পক্ষে বুঝে ওঠা অসম্ভব সুনিপুন শিল্পির হাতে তৈরী কি অপূর্ব্ব কারুকার্য্য খচিত তার কীর্ত্তিসমূহ। প্রত্যেকটি মছজিদের

www.pathagar.com

দেওয়ালে খোদিত ইট ও পাথরের ফুলগুলি দেখলে মনে হয় এইতো সেদিনের। এগুলি লাগিয়ে শিল্পী মনে হয় এইমাত্র বাইরে গেলেন। এত জীবন্ত আজও এর কারুকার্য্যগুলি। এবং এগুলি ভাল লাগার কথা বললে বলতে হয়—সেতো অনুভূতির ব্যপার। কিন্তু তার কোন্ কীর্ত্তির পাশে গেলে যে ভাল লাগেনা, তাও বুঝে ওঠা দুষ্কর। ভীষণ খারাপ লাগে শুধু তখনই যখন তার ভগ্নপ্রায় কীর্ত্তিগুলি নজরে পড়ে।

তার প্রত্যেকটি মছজিদের মাঝে গেলে গরমের দিনে ঠাণ্ডা ও ঠাণ্ডার দিনে গরম বোধ হয়। এ ব্যবস্থা সেদিনেও ছিল, আজও আছে এবং ভবিষ্যতে যতদিন এগুলি ঠিক থাকবে ততদিন থাকবে। শত শত বৎসর পুর্ব্বের বিনা যন্ত্রে শীততাপ নিয়ন্ত্রন ব্যবস্থা এই মছজিদগুলিতে আজও বহাল তবিয়াতে বিদ্যমান। আধুনিক বিজ্ঞানের সঙ্গে যেদিনের বিজ্ঞানের তফাৎটা শুধু এখানেই। আধু কনিসিজ্ঞান উন্নত বলে সেদিনের বিজ্ঞান যে অনুন্নত ছিল একথা মোটেই ঠিক নয় বরং বলা যেতে পারে যে এর ধারা পরিবর্তন হয়েছে মাত্র। সেদিনের বিজ্ঞানের সঙ্গে ছিল আধ্যাত্মিক শক্তির মিশ্রণে তার আধুনিক বিজ্ঞানের সঙ্গে হয়েছে যন্ত্রের মিশ্রণ। কাজেই বিজ্ঞানের রূপের পরিবর্ত্তন ঘটেছে মাত্র।

তবুও অনুভূতির সুক্ষ্ম মাপকাঠিতে একটা মতামত ব্যক্ত করবার অধিকার সবারই রয়েছে বৈ কি। এই সংঘাতময় জীবনের বিভিন্ন ঘাত প্রতিঘাতে বিদগ্ধমন যখন হাপিয়ে ওঠে, নানা সমস্যায় জর্জরিত হয়ে দিশেহারা হয়ে যায় ও অপরিসীম গ্লানিতে ভরে ওঠে;—আত্মীয়ের অনাত্মীয়ের মত ব্যবহারে; ভাই এর ভ্রাতৃত্ব হীনতায়, বন্ধুর বিশ্বাসঘাতকতায়, উর্দ্ধতনদের ক্ষমতার অপব্যবহারে, পরম

www.pathagar.com

বিশ্বাসের ঘরে সুযোগ সন্ধানির মোষক আঘাতে মন যখন ভারাক্রান্ত হয়ে ওঠে তখন মনের উপর একটা উপসম বা শান্তির প্রলেম লাগাবার জন্য জীবনে বহু জায়গায় আমি ঘুরে বেড়িয়েছি। যে য'ই বলেছে, তাই করেছি। প্রাতঃ ভ্রমণ করেছি, ইছুপগুলের ভুষি খেয়েছি, নদীর ধারে বসেছি, কত জ্যান্ত পীরের বাড়ীতে গিয়েছি, কত মওলানার কাছারীর জানালা ধরে দোয়া চেয়েছি, নদী পার হয়ে ঠাকুরের বাড়ীতেও গিয়েছি। কিন্তু মনের দহন ও শুন্যতা বেড়েছে বই কমেনি। কিন্তু যতবার যখনই এই রওজা মোবারকে গিয়েছি ততবার, তখনই আমার মন একটা প্রাগাড় শান্তিতে ও একটা অপরিসীম স্নিগ্ধতায় ভরে উঠেছে। যতটুকু সময়ের জন্যই হোক বেদনাকে ভুলতে সক্ষম হ'য়েছি। সম্মোহনীর মত একটা অব্যাক্ত ভাল লাগায়, একটা অজানা পবিত্রতায় মন আমার আচ্ছন্ন হ'য়ে গিয়েছে। এই বোধ যে শুধু আমারই হয়েছে তা নয়. অনেকেরই হয়ে থাকে এবং এই জন্যই মানুষের ভীড় আজ এখানে এত বেশী। প্রত্যক্ষদর্শী, যারা সেখানে গিয়েছেন. তারা ব্যতিত আমার এ কথার মর্ম্ম উপলব্ধি করার ক্ষমতা আর কারো নেই। আমার এ কথার সত্যতার প্রমাণ তারাই কেউ কেউ দিতে পারবেন।

তার এই মাজারের পাশে দীঘির ঘাটে বসে থাকতে থাকতে জীবনের অনেকগুলি দিনেই যে কতবার আমি কোথায় হারিয়ে গিয়েছি তা আজ আর হিসাব করে বলা যাবেনা। এই নির্ব্বাক মাজারের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে বহুবার আমার এই কথাই মনে হয়েছে সে এই মাজার, এই মছজিদ, এই দীঘি বহু ঘটনার সাক্ষী হয়ে অব্যাক্ত বানী নিয়ে আজও স্থীর হ'য়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। অতীতের পুঞ্জীভুত কথা বলার জন্য যেন ও ব্যাকুল।

www.pathagar.com

রওজা মোবারকের পার্শে জিয়ারতে দাড়ালেই মনে হয় ঐ তো কাপড়ের গেলাপে আবৃত হাজার হাজার কথা মাজারের বুকে আবদ্ধ হয়ে রয়েছে. এরা যদি সবাক হয়ে সমাজের বুকে বেরিয়ে আসে, যদি এদের আমরা শৃঙ্খল থেকে মুক্তি দিতে পারি, তবে সমাজের সকল মানুষের মন থেকে সকল কদাচার ও অসুন্দর মুছে ফেলতে হয়তো এরা সক্ষম হবে। যদিও মুক্তির প্রতিক্ষায় থেকে থেকে আজও তারা শেষ হয়ে এলো প্রায় তবুও তাঁরা মুক্তি পেলো কৈ ?

ইসলামী আদর্শের মূল বানী এখানে লিপিবদ্ধ রয়েছে। তাই শিল্পকর্ম্মে, পরিবেশ, ভাবগাম্ভির্য্য ও উপরোক্ত কারণের জন্য এই মাজারকে আমার কাছেও তাঁর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কীর্ত্তি বলে মনে হয়। এটি তার শ্রেষ্ঠ কীর্ত্তি শুধু নয় তার কেরামতির শ্রেষ্ঠ নিদর্শনও এখানে পরিলক্ষিত হয়। যদিও পুরা ইসলামী আদর্শ এখানে বোবা হয়ে রয়েছে তবুও আমার বিশ্বাস যে, ত্যাগের মহিমায় উজ্জ্বল যে আদর্শ এখানে নীরব হয়ে রয়েছে ইসলামী আদর্শ নিয়ে একদিন সে সোচ্চার হয়ে উঠবেই। ইসলামী আদর্শের ঝাণ্ডা একদিন এখান থেকে উঠবেই। জানিনা কোন সৌভাগ্যবান হবে সেই ঝাণ্ডার বাহক।

যে স্থানকে কেন্দ্র করে আমি ইসলামী আদর্শ বিস্তারের আশাবাদি ও তার শ্রেষ্ঠ কীর্ত্তি বলে অভিহিত করেছি প্রতিটি লোকের কাছে সে স্থানটি "খানজাহান আলীর দরগাহ" নামে পরিচিত। এইখানে তার মাজার অবস্থিত বলে এটি দরগাহ নামে পরিচিত হয়েছে। তার মৃত্যুর পর লোকে তার মাজারে ছেজদা করবে, শিরনি মান্নত করবে, এজন্য তিনি তার মাজারকে সুদৃঢ় করেননি। বরং লোকে মাজার জেয়ারত করে, ছোয়াব রেছানি করে

www.pathagar.com

রুহানি কায়েজ হাসেল করে, ও কবরে লিখিত বানীসমূহ পড়ে জীবনে পরিবর্ত্তন আসুক এবং আখেরাতের পথে ধাবিত হয়ে লাভবান হোক এটাই ছিল তার উদ্দেশ্য। আর এই উদ্দেশ্য ছিল বলেই তিনি তার মাজারকে একটি সুদৃঢ় ও সুগঠিত মছজিদের মত একটি অট্টালিকার মাঝে স্থাপন করেছিলেন। এই অট্টালিকার ভীত্তি—প্রস্তর নির্মিত এবং মাটির উপরেও তিন ফিট এই ভীত্তির উচ্চতা। তার পরে ইটের গাথুনি শুরু হয়েছে। এই মাজার ও মছজিদটি ২টী দেওয়াল দ্বারা পরিবেষ্টিত।

হযরত খানজাহান আলাইহের রহমত তার বিবির মৃত্যুর পর বৃদ্ধ বয়সের দিনগুলি এখানেই অতিবাহিত করেছিলেন বলে শোনা যায়। মাজারের পুর্ব্ব দিকে একটী ভগ্নপ্রায় অট্টালিকা রয়েছে। এটী লোকের কাছে আজও বাবুর্চিখানা বলে পরিচিত। এর গঠনপ্রণালী ঠিক মছজিদের অনুরূপ। এটী মাজারের ঠিক পুর্ব্ব দিকে অবস্থিত। এর দেওয়ালের মধ্যে দুইটী ছোট ছোট কামরা রয়েছে। দেওয়ালটী ৬ ফুট চওড়া। এক সময় এটীকে একটী মোসাফের খানায় রূপান্তরিত করার চেষ্টা করা হয়েছিল কিন্তু আজও তা সফলকাম হয়ে ওঠেনি।

এই দরগায় প্রবেশের প্রথমেই একটি বৃহৎ তোরণ পরিলক্ষিত হয়। এই তোরণের মধ্য দিয়েই সর্ব্ব প্রথম এই দরগার মধ্যে প্রবেশ করতে হয়। এই তোরণটি পার হয়ে দীঘি পর্য্যন্ত যেতে হলে আরও দু-একটি তোরণ পার হ'তে হয়। প্রথম তোরণটি সকলের নিকট সিংদরজা বলে পরিচিত। এই স্থানে প্রবেশের এটি সিংহদ্বার কিন্তু স্থানীয় ভাষায় এটি সিংদরজা নামে ভুষিত হয়েছে। এটি আট ফুট চওড়া—ইট দ্বারা নির্ম্মিত একটি সুউচ্চ তোরণ।

www.pathagar.com

এর উচ্চতা প্রায় ২১ ফিট। এখানে যে একটি কপাট ছিল. এর কলা-কৌশল লক্ষ করলে এটা অতি সহজেই বোঝা যায়। দরজা বসানোর জন্য উপরে পাথরের তৈরী একটি ক্লাম এখনও বিদ্যমান রয়েছে। মাজারের দুরবর্তী দেওয়ালটিও অত্যাধিক চওড়া। এই তোরণটি দেখলে দিল্লি আগ্রার শাহী দরবারের তোরণের কথা মনে হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে একটা যুগকে মনে করিয়ে দেয়। প্রথম দৃষ্টিতেই মনে হয় যেন এটা সে যুগের শাহী দরবারের তোরণ এবং এই তোরণ দ্বারের নির্মাতা একই ব্যক্তি। এই তোরণটিতে বর্তমানে কোন দরজা নেই। বাহিরের দেওয়ালটির প্রস্থ প্রায় ৫ ফিট ও উচ্চতা ৮ ফিট। এই দেওয়ালের চারদিকে ৫টি ও রওজার সোজাসুজি ১টি মোট ৬টি গেট রয়েছে। এই গেটটি পার হলেই চোখে পড়বে বৃহত খানজাহান আলী দীঘি, যেখানে কুমীর রয়েছে এবং মানুষের ডাকে আজও দীঘির ঘাটে চলে আসে।

সিংদরজা পার হয়ে গেলেই বামদিকে চোখে পড়বে বাবুর্চি-খানা ও ডানদিকে একটি লোহার কলাপ সেবল গেট এবং তার ভিতর দিয়ে চোখে পড়বে হযরত খানজাহান আলী (র:)র মাজার। মাজারের উপর নির্মিত অট্টালিকাটি বেষ্টন করে আছে আর একটি দেওয়াল। এই দেওয়ালেও ৫টি গেট রয়েছে। বাবুর্চিখানারদিকে একটি, মছজিদেরদিকে ৩টি ও দীঘিরদিকে ১টি। এই দেওয়ালটির উচ্চতা ৪½ ফিট ও প্রস্থ ৩ ফিট এই দেওয়াল সংলগ্ন দক্ষিণদিকে যে গেটটি রয়েছে এটাই মাজারে প্রবেশের গেট এবং এখানে জুতা রেখে খালি পায়ে লোকে মাজার জেয়ারত করতে যায়। জুতা পাহারা দেবার জন্য এখানে প্রায়ই একটি লোক বসে থাকে। এই

www.pathagar.com

দেওয়াল দুইটির ৪ কোণেই মছজিদের মিনারের অনুকরণে ৪টি করে খাম্বা রয়েছে। এই খাম্বাগুলি একটী যুগের স্থাপিত্য শিল্পের নিদর্শন হিসাবে ব্যহৃত হয়েছে।

হযরত খান জাহান আলী (রঃ)র মাজারটি যে অট্টালিকার মধ্যে অবস্থিত তার আকৃতিও মছজিদের ন্যায় ও ছাদ এক গম্বুজ বিশিষ্ট। অন্যান্য মছজিদের মতই খিলান পদ্ধতিতে প্রস্তুত হলেও এটি অনেক মজবুত করে তৈরী করা। এর সমস্ত ইটগুলি এমন এক পাতলা মশলা দিয়ে গাথা যার শক্তি আজও অটুট রয়েছে। এই মছজিদের ভিতরেরদিকে বিশেষ কোন লতা-পাতা বা ফুল অঙ্কিত নেই। এই মাজারের চারিদিকে ৪টি দরজা ছিল কিন্তু বর্তমানে ৩টি দরজা রয়েছে। দক্ষিণদিকে মাজারে ঢোকার দরজা, পূর্ব্বদিকে বাবুর্চিখানা ও পশ্চিমদিকে মছজিদ। পশ্চিমদিকে ও মাথারদিকের দরজাটি অনেক পূর্ব্বেই ইট দিয়ে গেথে বন্দ করে দেওয়া হয়েছে। এর তিনদিকেই কাঠের দরজা রয়েছে। পুর্ব্ব ও পশ্চিমের দরজাটি এ যুগের কাঠ দিয়ে তৈরী কিন্তু দক্ষিণদিকের দরজার কাঠটি ছয় শত বৎসর পুর্ব্বের কাঠ। দরজাটির উপরে ও নীচে লোহার পাত দিয়ে আটা। এই লোহার পাত দুটির রদবদল হয়েছে মাত্র।

মাজারের উত্তরদিকে তাকালে সহজেই বোঝা যায় যে পুর্ব্বে এখানে একটি দরজা ছিল কিন্তু বর্তমানে দরজাটি নেই। এই দরজা সম্পর্কে আমার এক কাকামিয়া এই মাজারের নামজাদা খাদেম ফমির আমির আলী মিয়ার নিকট থেকে একটি গল্প শুনেছিলাম। অবশ্য তিনি নিজেই ছিলেন একজন গল্পের মানুষ। যদিও তিনি আজ আর বেঁচে নেই তবুও এই মাজারের খাদেমদের ইতিহাস থেকে

www.pathagar.com

তার নাম কোনদিনই মুছে যাবার নয়। এই খাদেম সাহেবের কাছ থেকে অনেক তথ্য আমি সংগ্রহ করেছি। প্রাপ্ত তথ্যের মধ্যে প্রায় সকল তথ্যই কিছু না কিছু যাচাই করা হয়েছে কিন্তু একটি তথ্য আজও যাচাই করা হয়নি। তিনি এবং তার ভাই খাদেম মোজাফ্ফার হোসেম বলেন যে, মোহাম্মদ তাহেরের মাজারের মধ্যেরদিকে পাথরে খোদাই করা আরবী ভাষায় বহু লেখা রয়েছে। কোন এক সময় কোন ডাকাত দল মাজারটীর একদিকে ভেঙ্গে ফেললে বহুদিন পর্য্যন্ত এর একদিক খোলা থাকায় স্থুল জীবনে ভিতরে নেমে এরা তা দেখেছেন। সংসারী জীবনের মধ্যে থেকেও এই খাদেম সাহেব ছিলেন একটু অসাধারণ। কুমীর ডেকে এনে তাকে খাবার দিয়ে তার মাথায় হাত রেখে আদর করতে দেখেছি। ১৯৪২ সালে তৎকালিন বাংলার ছোট লাট, স্যার জন আর্থার হারবার্ট একবার এই মাজার পরিদর্শনে এসেছিলেন। তখন আমি সবে এই দরগার মাদ্রাসার ছাত্র। এই ছোট লাটকে ও স্থানীয় সবাইকে তিনি কুমীর দেখিয়ে ও কুমীরকে আদর করে বিস্মিত করেছিলেন। কলিকাতার আনন্দবাজার পত্রিকায় কুমীরের সঙ্গে তার ছবি বেরিয়েছিল। তিনি বিচক্ষণ এবং বুদ্ধিমান ব্যক্তি ছিলেন। এই মাজারের সীমানায় তাকে কোনদিন জুতা পায়ে আসতে দেখেনি এবং নিয়মিত ফজরের নামাজ তিনি ওই মাজারেই আদায় ক'রতেন। তিনি মাজারের পশ্চিম দরজা সম্পর্কে যে গল্পটী বলেছেন সেটী এইরূপ—

"মাজারের পশ্চিম দিকের এই দরজাটি ছিল স্বর্ণ নির্মিত। এর প্রত্যেকটি দরজায় একজন খাদেম নিয়োজিত থাকতেন। সবচাইতে প্রবীন ব্যক্তিই থাকতেন এই দরজার খাদেম। তার মৃত্যুর বহু

www.pathagar.com

বৎসর পরও এই দরজাটী বিদ্যমান ছিল। অনুমোদন প্রাপ্ত ব্যক্তি ছাড়া কেউই মাথার দিকে যেতে পারতেন না। অনেক বৎসর অতিবাহিত হওয়ার ফলে অনেক খাদেমের পরিবর্তন ঘটে। শোনা যায় কোন এক সময় কোন এক দুরবৃত্তদল লোভের বশবর্ত্তি হয়ে খাদেমদের উপর আক্রমণ করে এবং কোন এক খাদেমকে হত্যা করে এই স্বর্ণ নির্মিত দরজাটী ভেঙ্গে লুটপাট করে নিয়ে যায়। শোনা যায় এই মাজারের চার কোনে যে ৪টী মিনারেরমত খাম্বা রয়েছে এর গুম্বজের পরেও স্বর্ণ নির্মিত চন্দ্র ছিল এবং এই কারণেই এই চারটীকে "স্বর্ণগুম্বজ" বলা হয়। অনেকেই এই নামটী আজ ভূলে যেতে বসেছেন। ডাকাতদল এই স্বর্ণগুম্বজের স্বর্ণ নির্মিত সকল কারুকার্য্য লুটতরাজ করে নিয়ে যায়। বড় গুম্বজটীর উপরের স্বর্ণ নির্মিত বস্তুগুলিও তারা রেখে যায় না। তিনি আফসোস করে বলেন যারা এ কাজ করেছে নিশ্চয়ই তারা ভাল হতে পারেনি। এই ঘটনার সময়কাল সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন, এ কথা সঠিকভাবে বলা যাবেনা তবে ইংরাজ আমলের প্রথম দিকেই এ ঘটনা ঘটেছিল বলে মনে হয়। তিনি বলেন মাজারে ঢুকে মাথারদিকে যাওয়া আমি বেয়াদবি মনে করি বলে সবাইকে নিষেধ করে থাকি। শোনা যায় এই মাজারের উপরে অর্ধচন্দ্রাকৃতির একটি আলোক দণ্ডও স্থাপিত ছিল। এর বৈশিষ্ট ছিল এই যে, এর নিজস্ব কোন আলো ছিল না—দরজা খুলে দিলে কিছু সময় পরে এটী আলোকিত হয়ে উঠতো এবং সারা ঘরটীকে আলোকিত করে রাখতো। কেহ কেহ বলতেন যে সূর্য্যের আলো থেকে এই দণ্ডটী আলো সংগ্রহ করে রাখতো। দিনের চেয়ে রাত্রেই এর আলো বেশী দেখা যেত। আজ আর বলা যায় না এটী কেমন ছিল।

www.pathagar.com

তবে রেডিয়াম জাতীয় কোন পদার্থও হতে পারে। এটাও দুবৃত্তেরা নষ্ট করে দিয়ে যায়।

এই মাজারের অট্টালিকার উপরের ছাদটিও বেশ ঢালু। ছাদের উপর থেকে বৃষ্টির পানি সহজভাবে পড়ার জন্য পাথরের নির্ম্মিত ৪টি নালা বসানো রয়েছে। এখান থেকে ঝরণার মত বৃষ্টির পানি নিচে পতিত হয়। ছেলে বেলায় এর নিচে দাড়িয়ে বৃষ্টির পানিতে ভিজতে আমাদের বেশ আনন্দ বোধ হোত।

মাজারের পশ্চিম দিকে এক গুম্বজ বিশিষ্ট একটি মসজিদ রয়েছে। মসজিদটি বাহিরের দেওয়ালের ভিতরে এবং মাজার পরিবেষ্টিত দেওয়ালের বাহিরে অবস্থিত। এক সময় এই মসজিদের পশ্চিম দিক হতে কিছুটা অংশ ভেঙ্গে গিয়েছিল কিন্তু বহুদিন পূর্ব্বেই সরকারি সাহায্যে সেটুকু মেরামত করা হয়েছে। এই মসজিদের বাহিরে একটু খোলা জায়গা ছিল কিন্তু পরে নামাজি লোকের সংখ্যা বেশি হওয়ায় খাদেম ও স্থানীয় জনগণের প্রচেষ্টায় এই স্থানটুকুতে ছাদ এটে নামাজের জায়গা বাড়ানো হয়েছে।

হযরত খানজাহান আলী (রঃ) র মাজারটি পাথর নির্ম্মিত। চারিদিক থেকে সিড়ির মত করে ৩টি ও নিচে ইটের একটি এই ৪টি স্তরে সাজিয়ে উপরে কবর অকৃতির অর্ধ গোলাকৃতির একটি পাথর বসানো রয়েছে। ইট নির্ম্মিত স্তরটির কারুকার্য্য ছিল অসাধারণ। আট কোনা বিশিষ্ট ইটের মধ্যখানে ফুল অংকিত করে চিনামাটির দ্রব্যের মত মশৃণ ও উজ্জল কোন বস্তু দ্বারা এর উপর সুন্দর রঙিন প্রলেপ দেওয়া ছিল। স্থানীয় লোকের নিকট এটি 'কড়ের মোজাইক" বলে পরিচিত ছিল। এটি যে একধরণের

www.pathagar.com

মোজাইক তাতে কোন সন্দেহ নেই। এই মাজারের সমস্ত মেঝেটিই এক সময় এইরূপ মোজাইক করা ছিল কিন্তু বর্তমানে এই ইটগুলি মাজারের নীচে কিছু লাগানো রয়েছে মাত্র। এর নমুনা স্বরূপ মাজারের গায়ে এই ইটের কিছু নমুনা আজও দেখা যেতে পারে। কোন কোন ইটের উপর পুরানো দিনের কিছু রং আজও বিদ্যমান রয়েছে।

এই মাজারের সমস্ত পাথরেই কোরাণের বিভিন্ন আয়াত, আল্লার গুণবাচক নাম, দোয়া, দরুদ, বিভিন্ন আয়াত ও অমূল্যবাণী আরবী ভাষায় লিখিত রয়েছে। এগুলি যারা খোদাই করেছেন তারা যে কত নিপুন শিল্পি ছিলেন তা সহজেই অনুমান করা যায়। পাথরে খোদাই করা এই লেখাগুলি দেখলে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে যেতে হয়। বর্তমানে কোন কোন পাথরের লেখা ক্ষয় হয়ে উঠে গিয়েছে। কোন কোন লেখার কোন কোন অংশ একেবারেই নেই, ফলে অনেক লেখাই পড় যায়না। তবুও সে যুগের মুসলিম কৃষ্টি ও সভ্যতার ও শিল্পের যে কতখানি উৎকর্ষ সাধিত হয়েছিল তার জ্বলন্ত সাক্ষি হয়ে তার মাজার ও মসজিদ আজও আমাদের সম্মুখে দাঁড়িয়ে রয়েছে।

হযরত খানজাহান আলী (রঃ)র মাজারের পশ্চিম পার্শে উন্মুক্ত স্থানে আর একটি প্রস্তর নির্মিত মাজার রয়েছে। এর নির্ম্মাণ পদ্ধতি তাঁর মাজারেরই অনুরূপ। এটি তাঁর প্রিয় মুরিদ ও সঙ্গি উজিরে আলা, অলিয়ে কামেল পীর আলী মোহাম্মদ আবু তাহেরের মাজার। এই মাজারের দক্ষিণ দিকে পাথরের উপর লম্বা লম্বা কয়েকটি দাগ রয়েছে। কথিত আছে ডাকাত দল যখন মাজারের সোনার দরজা লুট করে নিয়ে যায় তখন এইখানে তাদের অস্ত্র

www.pathagar.com

খার দিয়েছিল। এই মাজারের পাথরেও আল্লার ছেফাতি নাম সমুহ, কলেমা শাহাদাত ও সুরা তাকাছুর লিখিত রয়েছে আরও লিখিত রয়েছে।

هذه روجة مباركة من رياصل الجنت

روجة مجلس مقام محمد طاهر

হাজিহি রওজাতুল মোবারাকাতে মিন রিয়াজিল জান্নাতে রওজাতুল মাজলেছে মাকামাম মোহাম্মদ তাহের।

অর্থ—এই পবিত্র কবরটি বেহেস্তের একটি টুকরা বিশেষ। এটা মোহাম্মদ তাহেরের রওজা মোবারক। "তার সম্পর্কে বিস্তারিত" আলোচনা পরে করা গেল।

হযরত খানজাহান আলী (রঃ)র মাজারের উপরের অট্টালিকার নির্ম্মাণ কৌশল ও গাথুনির মশলা নিয়ে ইংরাজ গভেষকগণ বহু গভেষণা করেছেন। এই মশলা তারা গভেষণার জন্য তাদের দেশে পাঠিয়েছেন। তারাও সঠিক ভাবে নিরুপণ করতে পারেননি জাতীয় যে এটি কোন মশলা, যার শক্তি আজও অক্ষুন্ন রয়েছে। গভেষনার ফল পুরাপুরি জানা যায়নি তবে এইটুকু জানা গিয়েছিল যে এর মধ্যে রয়েছে মুল্যবান পাথরের গুড়ি, চুনা, তৈল ও ডিম জাতিয় জিনিষের মিশ্রণ এবং আরও কিছু আছে বলে তারা সন্দেহ করেন। চেষ্টা করেও এরুপ মিশ্রণ তাদের পক্ষে করা সম্ভব হয়নি। সেদিনের বিজ্ঞানের সঙ্গে এদিনের বিজ্ঞানের পার্থক্য এখানেও পরিলক্ষিত হয়েছে।

এবার মাজারের উপরে লিখিত যে সব বাণী সমুহ পাঠোদ্ধার করা গেছে তার কিছু উদ্ধৃতি দেওয়া যাক—প্রথমে লেখা রয়েছে

www.pathagar.com

"আউজু বিল্লাহে মিনাশ সাইতনের রাজিম বিছমিল্লাহির রহমানির রাহিম।" তারপর কলেমা তৈয়াব ও কলেমা শাহাদাত লেখা রয়েছে। মাজার গাত্রের চার কোনে রসুল করিম (দঃ) এর চার খলিফার নাম লেখা রয়েছে, প্রত্যেক নামের পূর্ব্বে (ইলাহি বেহুরমাতে) লেখা রয়েছে ও পরে রাজি আল্লাহু তায়ালা আনহু লেখা রয়েছে। সরাসরি উত্তরে লেখা রয়েছে—

نصرمن اللہ فتــح قـريب

নাছরুম মিনাল্লাহে ওয়া ফাতহুন কারিব অর্থ আল্লার সাহায্য ও বিজয় আমাদের নিকটবর্ত্তি। মাজারের উপরের পাথরখণ্ডের পাশে লেখা রয়েছে সুরা তাকাছুর। মাজারের উত্তর দিকে চার প্রধান ফেরেস্তার নাম লেখা রয়েছে। তাদের নামের পূর্ব্বেও الـهـى بـحـرمـت ইলাহি বেহুরমাতে ও আলাইয়ে ছাল্লাম লেখা রয়েছে। এই চারজন ফেরেস্তা হলেন জিব্রাইল, আজরাইল ইস্রাফিল ও মেকাইল।

দক্ষিণ দিকে লেখা রয়েছে।

یابرهان یا بدیع السموت والارض خلصنا من النار

ইয়া বুরহানো, ইয়া বদিয়ুছ ছামাওয়াতে ওয়াল আরদে খাল্লিছনা মিনান নার।

অর্থ—হে যাবতীয় বিষয়ের প্রকাশ, হে বিশ্বজগতের প্রতি-পালক আমাদিগকে দোজখের আজাব থেকে রক্ষা করো।

মাজারের পশ্চিম দিকে আয়তাল কুরছি, সুরা কাফেরুণ, সুরা ইখলাছ সুরা ফালাক ও সুরা নাছ লিখিত রয়েছে। মাজারের পশ্চিম দিকে লিখিত আছে—

www.pathagar.com

حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير

وصلى الله على خير خلقه محمد وارحم الراحمين

হাসবুনাল্লাহু ওয়া নেয়ামাল অকিল, ওয়া নেয়ামাল মওলা ওয়া নেয়ামাননাছির ওয়া ছাল্লাল্লাহু আলা খাইরি খালকিহি ওয়া মোহাম্মাদেও ওয়া আরহামার রাহিমিন। তারপর বিছমিল্লা সহ লিখিত আছে—

يا حى يا قيوم يا حنان يا منان

يا ديان يا سبحان يا سلطان يا غفران

ইয়া হাইয়ু, ইয়া কাইয়ুম ইয়া হান্নান, মান্নানু ইয়া দাইয়ানু ইয়া ছুবহানু ইয়াছুলতানু ইয়া গুফরান। আরও অনেক লেখা রয়েছে যা পরবর্ত্তি কালে আলোচনা করার চেষ্টা করা যাবে। তার মাজারের লেখা থেকে বোঝা যায় যে তিনি শুধু শাসকই ছিলেন না আল্লার একজন মস্তবড় অলি ছিলেন। তিনি যে কত বড় মহান ব্যক্তি ছিলেন তা ভাষায় বর্ণনার অতিত। কবি সেক্সপিয়র যথাযথ বলেছেন যে, Feelings are atmost but words are few. হৃদয়ের অনুভূতি যেখানে প্রকট ভাষা সেখানে নীরব।

www.pathagar.com

হযরত খানজাহান আলী (রঃ)র সর্ব্ব বৃহৎ দীঘি

হযরত খানজাহান আলাইহের রহমত সম্পর্কে প্রচলিত প্রবাদের মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য এই যে তিনি হাবেলী খলিফাতাবাদ পরগনায় ৩৬০টি মছজিদ নির্মান ও ৩৬০টি দীঘি খনন করেছিলেন। তার পুর্বে এই অঞ্চলে কোন রাজা বাদশা বা পীর দরবেশ রাজ্য বা আস্তানা স্থাপন করেছিলেন বলে যানা যায় না। তিনিই সর্ব প্রথম ব্যক্তি জিনি এদেশের সম্পদ লুট করে দেশে ফিরে যাননি বরং স্থায়ী বসতি স্থাপন করে জনহিতকর কার্য্যে আত্মনিয়োগ করেছিলেন। অবশ্য তাঁর আগমনের পুর্ব্বে এ দেশের বৌদ্ধ ও মূর্ত্তিপূজা করে. জনগণের কল্যাণে এতটা এগিয়ে আসেনি। তারা এদেশে শুধু পুজার প্রচলন করেছিল। তার মধ্যে শীব, কালি ও মনসার প্রভাবই ছিল বেশী.। সুন্দরবনের সাপ ও বাঘের ভয়ে এরা "বন দেবী" নামক আরও এক দেবীর পুজার প্রচলন করেছিল। জানা যায় এই সময়ে এই সুন্দরবন অঞ্চলে আরও একজন ফকিরের আবির্ভাব ঘটেছিল। তার নাম ছিল গাজী। তার এক ভাই ছিল তার নাম ছিল কালু। কিন্তু পরবর্তীকালে দেখা যায়. স্থানীয় অধিবাসীগণ গাজী-কালুর নামেও পুজার প্রচলন করেছিল।

ঠিক এমনি সময়ে ইসলামী আলোর মশাল হাতে এদেশে আগমন করেছিলেন হযরত পীর খানজাহান আলী (রঃ)। তিনি ইসলাম প্রচারের জন্য এবং এদেশের মানুষের কল্যাণের জন্য জীবন উৎসর্গ করে দিয়েছিলেন। ধর্মের খাতিরে তিনি ও তাঁর শিষ্যবর্গ মিলে নির্মাণ করেছিলেন অসংখ্য মছজিদ ও জীবন ধারণের জন্য

www.pathagar.com

খনন করেছিলেন অসংখ্য দীঘি। এর কারণ এই যে, যদিও বিজয়ীর বেশে তিনি এদেশে প্রবেশ করেছিলেন তবুও তাঁর কার্য্য-কলাপে ব্যবহারে এদেশের মানুষ তাঁর প্রতি মুগ্ধ হয়েছিল এবং তিনিও এদেশ ও এদেশের মানুষকে ভালবেসে ফেলেছিলেন। শান্তি প্রচার, মানব কল্যাণে নিয়োজিত, নিবেদিত প্রাণ এই পবিত্র আত্মাটিকে সকলেই আপন করে নিয়েছিল। ফলে এই রাজ্যের জন-সাধারণের সহজতর জীবনধারনের জন্য তিনি সর্বপ্রথম যে বস্তুর বিশেষ প্রয়োজন উপলব্ধি করেন সেটি হোল পানীয় জলের। শুধু সেই দিনেই নয়, আজও এই অঞ্চল লোনা অঞ্চল বলে পরিচিত এবং আজও এই দেশে পানীয় জলের অভাব রয়েছে। এই কারণেই তিনি ও তাঁর অনুগামীগণ এই দেশে এত অধিক সংখ্যক দীঘি খনন করেছিলেন।

তিনি ও তাঁর অনুগামীবৃন্দ মিলে যেখানে যত দীঘি খনন করেছেন তাঁর মধ্যে খাঞ্জালি দীঘিই সুন্দর ও সর্ববৃহত। তার মাজারের সম্মুখস্ত দীঘির মত এত বড় দীঘি সারা বাংলায় আর একটিও নেই। সারা ভারত পাকিস্তানের মধ্যেও এত বড় খনিত দীঘি আছে কিনা সন্দেহ। অনেকে দিনাজপুরের রাম সাগর দীঘির কথা উল্লেখ করেন কিন্তু তার সঙ্গে এই দীঘির কোন তুলনাই চলে না। এই দীঘির পাড়ে দাঁড়িয়ে প্রাকৃতিক পরিবেশ অবলোকন করলে আনন্দে মন ভরে ওঠে। হযরত খানজাহান আলী (রঃ)র মাজার মছজিদ ও এই দীঘি মিলে তাঁর কীর্ত্তির যে অপরূপ সমন্বয় সাধিত হয়েছে ও যে অভাবনীয় এক অনুভূতি ও মহিমার সৃষ্টি করেছে তা ভাষায় ব্যক্ত করা অসম্ভব। It can better be emagined then describe, বর্ণনা বা কল্পনা করার থেকে দেখে উপলব্ধি করাই উত্তম।

www.pathagar.com

এই দিঘীটি সকলের নিকট "ঠাকুর দিঘী" নামেও পরিচিত। এই মৌজাটির নামও ঠাকুর দিঘী মৌজা। পীর সাহেবের মাজারের সম্মুখের দিঘীর নাম "ঠাকুর দিঘী" কেমন করে হোল এ নিয়ে অনেকেই বিস্ময় প্রকাশ করে থাকেন। এ নিয়ে বেশ কয়েকটি প্রবাদ প্রচলিত রয়েছে। এই দিঘী খননের সময় একটা বৌদ্ধমূর্ত্তি পাওয়া গিয়েছিল বলে অনেকে বলেন এখানে হিন্দুদের ঠাকুরের মূর্ত্তি পাওয়া গিয়েছিল বলে হিন্দুরা একে ঠাকুর দিঘী নাম করণ করেছেন। আবার অনেকে বলেন পীর সাহেবকে হিন্দুরা তাদের ঠাকুরের মতই ভক্তি করতো তাই জমিদার আমলে এই দিঘীর নাম হয়েছে ঠাকুর দিঘী। অনুসন্ধান নিয়ে জানা যায় যে শুধু এই নামকরণই নয় ইংরাজ শাসনামলে কাড়াপাড়ার মুছলিম বিদেশী ও অত্যাচারী হিন্দু জমিদারদের সময়ে সাটগুম্বজ মছজিদ ও দরগায় এসে হিন্দুরা মন্দিরের মত পূজা পর্য্যন্ত করতো। কাজেই আমরা সহজেই মনে করে নিতে পারি যে জমিদারদের পূর্ব্বপুরুষদের মধ্যে কেউ ভক্তি করে মুছলমানদের উপহাস করে উপহার দিয়ে গেছেন এই ঠাকুর দিঘী নামটি যা কাগজের পাতা থেকে আজও মুছে ফেলা সম্ভব হয়নি।

তারা শুধু এইরূপ নামকরণ করে বা মছজিদে ও দরগায় পূজার প্রচলন করেই খান্ত হননি, সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রকে দিয়ে একটা বিকৃত ইতিহাস তৈরীর চেষ্টাও তারা করেছিলেন। বঙ্কিম চন্দ্র এক সময় খুলনায় বিচারকের পদে নিয়োজিত ছিলেন। মোরেল সাহেবের এক খুনি মামলার ব্যাপারে এই সময়ে তিনি কয়েকবার মোরেলগঞ্জে যাতায়াত করেছেন। তিনি এই সকল কীর্ত্তি দেখে মুছলমান ঐতিহ্যকে খাট করার জন্য ইতিহাস লিখতে রাজী হয়েছিলেন এবং এখান থেকে খানজাহান আলী (রঃ) নাম গন্ধও মুছে ফেলতে চেষ্টা করেছেন। তার ইতিহাসের একটু

নমুনা দিলেই অতি সহজেই এ কথা বোঝা যাবে। সৈয়দ মোহাম্মদ ইউনুছ তার "বাঘেরহাট হইতে বাগেরহাট" প্রবন্ধে এ কথা উল্লেখ করেছেন। সাহিত্য সম্রাটের ইতিহাস এইরূপ যে, "কোন এক স্বামী ভবানন্দ, সন্ন্যাসী আন্দোলনের সময় এদেশে আগমন করেন। এদেশে বসতি স্থাপন করার পর তিনি এখানে একটি মন্দির নির্মাণ করেন। পরে পানীয় জলের অভাব দুরীকরণার্থে তিনি নিত্যানন্দ ঠাকুরকে উক্ত মন্দিরের দক্ষিণ পার্শ্বে এক দিঘী খনন করিতে বলিলেন। উক্ত আদেশে পানীয় জলের জন্য তিনি এক দিঘী খনন করেন যাহা 'ঠাকুর দিঘী' নামে খ্যাত।' শুধু এই নয় কাড়াপাড়ায় যাবার পথে পচাদিঘী সম্পর্কে তিনি লেখেন,— "পরবর্ত্তীকালে সন্ন্যাসীদের আবাসস্থলেও গোলযোগের সূত্রপাত হইল। ভবানন্দ স্বামীর সহচর ও অনুচরগণের মধ্যে আহার-বিহার লইয়া দারুন ক্ষোভের সূত্রপাত হইলে তিনি অনুচরগণের আবাসস্থল অনতিদূরে স্থানান্তরিত করিলেন। এই অনুচরগণের মধ্যে পচা কাহার ছিল প্রধান লাঠিয়াল। এই লাঠিয়ালকে তাহাদের বসতি স্থলের সন্নিকটে পানীয় জলের ব্যবস্থা করিবার জন্য এক পুষ্করণী খননের জন্য ভবানন্দ স্বামী নির্দ্দেশ দেন। তাহারা এক বিরাট দিঘী খনন করিয়া পচা দিঘী নামে অবিহিত করে এবং তাহাদের আবাসিক এলাকাকে কাহারপাড়া নামে অবিহিত করে। মুছলিম প্রভাবকালে তাহাই কাড়াপাড়া নামে পরিচিত হয়।"

প্রবন্ধকার লিখেছেন যে, "এইরূপ ইতিহাসের সমর্থনে বিংশ শতাব্দিতে প্রণবি অর্থাৎ প্রমথ নাথ বিশি মহাশয় তাহার ক্ষুরধার লেখনি ধারণ করিয়া সমর্থন জানাইয়া বলিলেন, 'আমি ঘটনা-চক্রে ১৯৪৫ সালে একবার বাগেরহাট গিয়াছিলাম এবং উক্ত বহু

স্তম্ভ বিশিষ্ট মিলনায়তনে এলাকার হিন্দুগণকে পূজা, পার্বন, উৎসব মেলা ইত্যাদি উৎযাপন করিতে দেখিয়াছি এবং উক্ত মিলনায়তনে হইতে মাত্র এক মাইল দূরে মরগা গ্রামের রাস্তার পার্শে একটি বিশাল প্রস্তর খণ্ডে কালিমাতার মূর্ত্তি খোদিত দেখিয়াছি। সেখানে হিন্দু ভক্তরা নিয়মিত পূজা অর্চনা করে। অতএব সাহিত্য সম্রাট, জাতিয়তা মন্ত্রের ঋষি ও কর্মযোগী বংকিম চন্দ্র চট্টপাধ্যায় মহাশয় যে ইতিহাস রচনা করিয়াছেন তাহা বর্ণে বর্ণে সত্য।" বঙ্কিম চন্দ্রের পরবর্ত্তী ইতিহাস এইরূপ যে, "ভবানন্দ ঠাকুর নির্মিত এই সব মন্দির গুলির চুড়া ভাঙ্গিয়া খানজাহান আলী রাতারাতি যে মন্দির গুলিকে মসজিদে পরিবর্তিত করেন, সাট গুম্বজ তাহারই একটি।"

এই সকল প্রখ্যাত ব্যক্তির এইরূপ ইতিহাস সৃষ্টি এবং সমর্থ-নের উৎস কি তার বিশদ আলোচনার প্রয়োজন আছে বলে আমি মনে করিনা। যে কোন সাধারণ লোকেই এর কারণ অনুধাবন করতে পারবেন। তবে মুসলমানদের কপাল ভাল বলতে হবে যে বঙ্কিম চন্দ্র হযরত খানজাহান আলী (রঃ) কেই স্বামী ভবানন্দ ঠাকুর আখ্যায়িত করে একটী পুর্ণাঙ্গ ইতিহাস রচনা করে যাননি। যদি তিনি খানজাহান আলী (রঃ)র মাজারকে ভবানন্দ ঠাকুরের সমাধি বলে লিখে রেখে যেতেন তবে মাজারে যতই নাম ধাম লেখা থাকুক না কেন ঠাকুর দীঘির মত কাগজে কলমে এটী ভবানন্দ ঠাকুরের সমাধি বলেই উল্লেখ থাকতো। প্রমথ নাথ বিশি মহাশয় এখানে যে হিন্দুদের পুজা করতে দেখেছেন, এ কথাকে কোন মতেই মিথ্যা বলে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। আমাদের ছেলে বেলার আমরাও এখানে হিন্দুদের পুজা করতে দেখেছি। মছজিদের গায়ের খাম্বাতে তেল সিঁদুর

www.pathagar.com

মাখিয়ে হিন্দুরা পুজা করতো। বর্তমানে হিন্দুগণ এইরূপ পুজা করে যে তাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবেনা, একথা তারা বুঝতে পেরে মনে হয় পুজাটা খান্ত করেছেন। তবুও খানজাহান আলী (রঃ)র মাজারের অট্টালিকায় পশ্চিম দিকের খাম্বাটীতে তেল সিদুর মাখিয়ে মাঝে মধ্যে সেবা দিয়ে তাদের আবেদন নিবেদন জানিয়ে থাকেন। এই দেখাদেখি অনেক অজ্ঞ মুছলমান নর-নারীও হিন্দুদের পদ্ধতিতে তাদের ভক্তি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করে থাকেন। তবে মরগার নিকটে সে পাথরটীতে হিন্দুরা পুজা করে থাকেন সেটী বিশাল পাথরও নয়, এবং কালী মুর্ত্তিও তাতে অঙ্কিত নেই। এই মাজার ও মছজিদের অঙ্গনে পুজা ও মেলার প্রচলন পীর সাহেবের প্রচলিত নয় এটী পরবর্ত্তীকালে হিন্দু প্রভাবের বিশময় ফল ছাড়া আর কিছুই নয়।

শোনা যায় এই দীঘি খনন করার সময় একটী বৌদ্ধ মুর্তি শুধু নয় বহু তৈজষপত্র ও থালা বাসন পাওয়া গিয়েছিল। এই বৌদ্ধ মুর্ত্তিটী সম্পর্কে এইরূপ একটী গল্প প্রচলিত আছে যে, দীঘি খননের সময় এই মুর্ত্তিটীর গায়ে কোদালের কোপ লেগে গিয়েছিল। পরে মুর্তিটীকে মাটীর নীচে থেকে তুলে দীঘির পুর্ব পাড়ে তুলে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে এটীকে তার অনুসারিগণ ভেঙ্গে ফেলতে চায় কিন্তু উদারচেতা পীর খানজাহান আলী (রঃ তাদের এই কাজে বাধা প্রদান করেন। এই মুর্ত্তিটী তিনি ভাংতে তো দেনই না বরং বলেন মাটীর তলে লুকানো একটী মুর্ত্তি ভাংলেই মানুষকে ইছলাম ধর্মে দিক্ষিত করা যায় না এবং এতে অন্যের ধর্মে আঘাত করা হয়। ওটাকে পুজা করার লোক না থাকলেই ওটা মুল্যহীন পড়বে। হয়তো ওরই পুজরি ওকে পা ধোবার পাথরে পরিণত

www.pathagar.com

করবে। তার এইরূপ কথার ফলে মুর্ত্তিটী আর ভাঙ্গা হোল না। পরবর্ত্তীকালে এক পুজার ব্রাহ্মণ তার কাছে এই মুর্ত্তিটী চাইলে উদারচেতা ও ধর্ম বিদ্বেশহীন হযরত খানজাহান আলী রঃ) তাকে এটী প্রদান করেন। সে এই মুর্ত্তিটী নিয়ে গিয়ে অদুরে শীবপুর গ্রামে স্থাপন করে শীব জ্ঞানে বৌদ্ধ মুর্ত্তিকেই পুজা শুরু করে দেয়। অন্ধ হিন্দুগণ, চতুর ব্রাহ্মণের উদ্দেশ্য কি এবং মুর্ত্তিটী কার একবার ভেবেও দেখলো না শীব ভেবে বৌদ্ধ মুর্ত্তিকেই তারা পুজা করে চললো। এই শীবপুর গ্রাম বাগেরহাট নদীর ওপারে ৪/৫ মাইল দুরে অবস্থিত। এই মুর্ত্তিটী আজও সেখানে বিদ্যমান রয়েছে ও পুজা চালু রয়েছে।

এই ঠাকুর দীঘি নাম সম্পর্কে আবার কেউ কেউ এমন কথাও লিখেছেন যে, তার প্রিয় মুরিদ ও উজিরে আলা মোহাম্মদ তাহের পুর্ব্বে ঠাকুর ছিলেন বলে পীর সাহেব মাঝে মাঝে তাকে আদর করে ঠাকুর বলে ডাকতেন। তার তদারকিতেই এই দীঘি খনন করা হয় বলে লোকে এটিকে ঠাকুর দীঘি বলে অবিহিত করেছে। কিন্তু এই নামের ব্যাপারে মুর্ত্তি প্রাপ্তির কাহিনীটিই সামধীক প্রসিদ্ধ।

একটি বিশাল এলাকা জুড়ে এই দীঘি খনন করা হয়েছে। সাটগুম্বজ থেকে দেড় মাইল পুর্ব্বে ও বাগেরহাট থেকে তিন মাইল পশ্চিমে এই মাজার ও দীঘিটি অবস্থিত। এই দীঘিটি দৈর্ঘে ও প্রস্তে প্রায় সমান। এক দিকে পাড়সহ ১৬০০ গজেরও অধিক হবে এর চারিদিকে পাহাড়ের মত উচু পাড়। কিছু দিন পুর্ব্বেও এর চারি পাড়ে ছিল ভিষণ জঙ্গল। আমাদের বাল্যকালেও আমরা মাজারের পাশে কিছু অংশ ও খাদেমদের ঘরবাড়ী ছাড়া অন্য অংশ জঙ্গলে পরিপুর্ণ দেখেছি। সে সময়ও এই জঙ্গলে বাঘের ডাক

www.pathagar.com

শোনা যেত। আমার পিতাও এই জঙ্গলে বন্দুক দিয়ে বাঘ শীকার করেছেন। বর্তমানে কোন পাড়েই আর তেমন জঙ্গল নেই। চারি পাড়েই খাদেমদের ঘরবাড়ী রয়েছে।

দীঘির চারি পাড়েই পূর্ব্বে চারিটি বাধানো ঘাট ছিল। তার ধ্বংসাবশেষ আজও বিদ্যমান রয়েছে। তবে মাজারের সম্মুখের ঘাটটি তৎকালিন বাগেরহাটের এস, ডি, ও বাহাদুর জনাব আলী আহম্মদ ও স্থানীয় জনসাধারণের প্রচেষ্টায় কিছুকাল পূর্ব্বে মেরামত করা হয়েছে। পূর্বের ঘাট থেকে এই ঘাটটি অনেক বড় করে তৈরী করা হয়েছে। মূল ঘাটটির কয়েকটি সিড়ি দেখার সৌভাগ্য আমার হয়েছে। বর্তমান সিড়ি থেকে সে সিড়িগুলির গঠন প্রনালী ছিল ভিন্ন ধরণের। ইট ও ইটের গুড়ির জমাট দিয়ে সিড়িগুলি তৈরী ছিল। প্রত্যেকটি সিড়ির মাথার দিকে গোল হয়ে অন্য সিড়ির সঙ্গে মিশেছে। বর্তমানে এই ঘাটটিতে ২৮টি ধাপ রয়েছে এবং ধাপগুলি ৬০ ফুট প্রসস্থ।

এই দীঘির পানির মত স্বচ্ছ পরিস্কার ও সুপের পানির তুলনা ছিলনা বললেই চলে। পানি যে এত স্বচ্ছ হতে পারে না দেখালে সে কথা বিশ্বাস করা যেতনা। পানির গভীর তলদেশে সাতার কাটা মাছগুলি পরিস্কার দেখা যেত। কিন্তু বর্তমানে পানির বর্ণ ও স্বচ্ছতা তেমন আর নেই। এক সময়ে এই পানি লালবর্ণ হয়ে গেলেও এর স্বাদের কোন পরিবর্ত্তন ঘটেনি। এর কারণ খুজতে গিয়ে এই কথাই মনে পড়ে যে, আমরা ছেলে বেলা থেকে শুনে এসেছি যে এই দীঘিতে জাল ফেলা পীর সাহেবের নিষেধ রয়েছে। তাই চিরদিন সবাই বড়সি দিয়ে মাছ ধরেছে। কিন্তু কিছুদিন পূর্বে মাজারের কোন এক খাদেম কোন সময়ে

www.pathagar.com

বড় বড় মাছের লোভে এই দীঘিতে জাল দিয়ে মাছ ধরেন। তার এই জালে কুমিরও বেধে গিয়েছিল। কিছুদিনের মধ্যে দেখা যায় পানির রং পরিবর্ত্তন হতে শুরু করেছে এবং সবার চোখের সর্ম্মুখেই এই দীঘির পানির পরিবর্ত্তত ঘটলো। হযরত খানজাহান আলী (রঃ)র কেরামতি যা আজও দুনিয়ার বুকে বিদ্যমান রয়েছে তা আর একবার প্রমানিত হোল।

এই দীঘির গভীরতা এখনও অনেক। অনেকে মনে করেন এই দীঘির গভীরতা এখনও ৩০/৪০ হাত রয়েছে। এই দীঘির পশ্চিম পাড়ে নয়টি গুম্বজ বিশিষ্ট একটি মছজিদ রয়েছে বলে একে নয় গুম্বজ মছজিদ বলা হয়। এই মছজিদের ছাদে ৩ সারিতে ৩টি করে মোট নয়টি গুম্বজ রয়েছে। পশ্চিম দিক ব্যতিত অন্য ৩ দিকেই ৩টি করে দরজা রয়েছে মছজিদের দেওয়ালটি ২০ ফুট উচ্চ। ভিতরে ও বাহিরের দেওয়ালে এবং প্রতিটি প্রাবেশ দ্বারে অপূর্ব কারুকাজ খোদিত ইট ব্যবহৃত হয়েছে। এর দেওয়ালে বিভিন্ন লতাপাতা ও ফুল অঙ্কিত রয়েছে। এই মছজিদের গুম্বজগুলি প্রস্তর নির্মিত ৬টি স্তম্ভের উপর অবস্থিত। এই স্তম্ভগুলির একটির মধ্যে হাতের বৃদ্ধ আঙ্গুলের ছাপের মত একটি গর্ত রয়েছে। কথিত আছে যে এই আঙ্গুলের দাগটি পীর সাহেবের হাতের বৃদ্ধ আঙ্গুলের দাগ। প্রবাদ এইরূপ যে, পীর সাহেব একদিন হাতের বৃদ্ধ আঙ্গুল দিয়ে চেপে এই পাথরটা মজবুত কিনা পরীক্ষা করে দেখেছিলেন। পীর সাহেবের আঙ্গুলের চাপ পাথর সহ্য করতে পারেনি। তার স্পর্শে সে নরম হয়ে গিয়ে তার আঙ্গুলের চাপ বুকে ধারণ করে নিয়েছিল। এই কথা মনে করে লোকে এইখানে চোখের জল ফেলে ও ভক্তিভরে

www.pathagar.com

আজও চুমু খায়। শোনা যায় এক সময় এই মছজিদটি একটি দেওয়াল দ্বারা পরিবেষ্টিত ছিল। মছজিদ থেকে কিছু দূরে একটি পাকা বাড়ীর ধংশাবশেষ পরিলক্ষিত হয়। সম্ভবত এটী খানজাহান আলী (রঃ)র কোন এক নিকটতম ভক্তের বাড়ী ছিল। এই মছজিদের এলাকা দিয়েই মাজারের খাদেমদের ঘরবাড়ী রয়েছে।

এই মছজিদের সোজাসুজি দীঘিতে একটী বাধানো ঘাট ছিল। জানা যায় ঘাটটীর অংশ বিশেষ নাকি দেওয়াল দিয়ে ঘেরা ছিল কিন্তু বর্তমানে ঘাটটী ধ্বংসের কবলে পতিত হয়েছে, অদ্যবধি এর কোন মেরামত করা হয়নি।

এই দীঘির দক্ষিণ ও পূর্ব্ব পাড়ে আরও ২টী বাধানো ঘাট ছিল। এই ঘাটের ধংশাবশেষ আজও বিদ্যমান রয়েছে। এই ঘাট দুটীও আজও মেরামত করা হয়নি। দীঘির পূর্ব পাড়ে ক্ষীর ক্ষেজুর গাছ নামে একটী গাছ রয়েছে, অনেকে বলেন এই গাছটি দীঘি খননের পর পরই তার শিষ্যদের দ্বারা রোপিত হয়েছিল। এই পাড়ে কয়েকটী পুরাতন আমের গাছ ছিল। তার মধ্যে একটী আমের গাছ ৫ শত বছরের আম গাছ বলে পরিচিত ছিল। এটীকে সিন্দুরে আম গাছ বলা হোত। কিছু দিন পূর্বে এই আম গাছ গুলিকে কেটে ফেলা হয়েছে। দীঘির উত্তর পাড়ে মাজারের পূর্ব পার্শ্বে দেওয়ালের বাইরে সরকার কর্তৃক একটী সুন্দর রেষ্ট হাউজ নির্মিত হয়েছে। বর্তমানে অনেকে মাজার জিয়ারত কারীগণ এখানে বিশ্রাম নিয়ে থাকেন। পূর্বের মাদ্রাসাটী বর্তমানে একটী হাইস্কুলে পরিনত হয়েছে। এখানে এই জুনিয়ার মাদ্রাসাটি প্রতিষ্টা করেন জনৈক খোন্দকার মোস্তাজ উদ্দিন ও সেই মাদ্রাসাটিকে হাইস্কুলে রূপান্তরিত করেন ফকির

www.pathagar.com

রজব আলী। হাইস্কুলটি বর্তমানে অচল। এখানে গণবিদ্যালয়ের একটি সাইনবোর্ড ঝোলানো দেখা যায়।

এই দীঘিতে হযরত খানজাহান আলী (রঃ)র কেরামতির বহু নিদর্শন বর্তমান রয়েছে। এই দীঘিতে তিনি যে কুমির ছেড়ে দিয়েছিলেন সেই কুমীরের বংশধরেরা আজও এই দীঘিতে বর্তমান আছে ও পীর সাহেবের হুকুম তামিল করে চলেছে। এই দীঘিতে কুমীরের সংখ্যা বর্তমানে ৫টি। শোনা যায় সর্বপ্রথমে ধলা পাহাড় ও কালা পাহাড় নামে দুইটি কুমির তিনি এই দীঘিতে ছেড়ে দিয়েছিলেন। তিনি তাদের হুকুম করেছিলেন যে তারা যেন কোন মানুষের ক্ষতি সাধন না করে। আয় আয় করে ডাকলে তারা যেন ঘাটে চলে আসে। এই হুকুম তামিল করলে চিরকালই তারা তাদের খাবার পাবে। সেই কুমিরের বংশধরেরা আজও সেই হুকুম তামিল করে চলেছে। তারা ডাকলে আজও ঘাটে আসে এবং হাস মুরগী, ছাগল দিলে আজও তারা খেয়ে যায়।

খাঞ্জালি দীঘি বা ঠাকুর দীঘিতে এই কুমীর কেমন করে এলো এ নিয়ে সুন্দর সুন্দর গল্প প্রচলিত আছে। অনেকে এইরূপ বলেছেন যে, হযরত খানজাহান আলী (রঃ) যখন এই দীঘি খনন করেন তখন সুন্দরবনের এই অঞ্চলে অনেক কুমীর দেখা যেত। এই বন্য কুমীর এদেশের মানুষের অনেক ক্ষতি সাধন করতো এবং মানুষ এই কুমিরকে ভয়ও করতো অত্যাধিক। তিনি আল্লার একজন অলি ছিলেন বলে জঙ্গলের সমস্ত প্রাণিই তার হুকুম তামিল করে চলতো। তাই এই দীঘি খনন করার পর যেন মানুষ এই দীঘিতে কোনরূপ অত্যাচার না করে সেই উদ্দেশ্যে পার্শ্ববর্তী নদী হতে টি কুমীরকে এই দীঘিতে থাকার হুকুম দেন। তিনি তাদের এই দীঘির পাহারাদার হিসাবে

নিযুক্ত করেন। তাদের নির্দেশ দেন তারা যেন অহেতুক কোন মানুষের ক্ষতি সাধন না করে। বংশানুক্রমে আজও তারা সেই হুকুম তামিল করে আসছে। আজ পর্যন্ত এই দীঘির কুমীরের উপর অত্যাচারও কম হয়নি কিন্তু তবুও তারা আজও দীঘি পরিত্যাগ করে পার্শ্ববর্তী নদীতে পালিয়ে যায়নি। আবার অনেকে বলেন পীর সাহেব যে কুমীর দুটির পিটে চড়ে নদী পার হতেন তাদেরই তিনি ধলা পাহাড় ও কালাপাহাড় নাম দেন ও এই দীঘিতে তাদের পাহারাদার নিযুক্ত করে রেখে যান।

আবার এমনি একটি কথাও শোনা যায় যে খানজাহান আলী (রঃ) তার অলৌকিক ক্ষমতাবলে দুটি বদ জীনকে কুমিরে পরিণত করে এই দীঘির তত্বাবধানের কাজে নিয়োজিত করেছিলেন। অন্য একটি প্রবাদে জানা যায় যে, এই দীঘিটী গভীর করে খনন করার পরও যখন পানির কোন সন্ধান পাওয়া যায় না তখন খানজাহান আলী (রঃ) তার একজন সহচর সহ অশ্বারোহনে দীঘির ভিতর পরিদর্শন করতে যান। এই সময়ে তিনি সেখানে হযরত খোয়াজ খিজির (আঃ) এর সাক্ষাত পান। তখন খোয়াজ খিজির তার হাতে একটি দোয়া লিখে দিয়ে বলেন যে তীরে উঠে এই দোয়াটি পাঠ করলেই দীঘি পানিতে পরিপূর্ণ হয়ে যাবে কিন্তু খানজাহান আলী (রঃ) কৌতুহল দমন করতে না পেরে দোয়াটি সেখানেই পাঠ করেন। সঙ্গে সঙ্গে দীঘি পানিতে পরিপুর্ণ হ'য়ে যায়। তখন তিনি ও তার সঙ্গী কোনমতে সাতার কেটে কুলে ওঠেন কিন্তু ঘোড়া দু'টি দীঘির মধ্য স্থলেই থেকে যায়। অবশেষে পীর সাহেবের দোয়ায় ঘোড়া দুটি কুমীরে পরিণত হয়।

আর একটী মশহুর গল্প শোনা যায় এই রূপ, যে একদিন

www.pathagar.com

ভোর বেলায় তিনি একটা গাছের নীচে বসে আল্লার ধ্যানে মশ গুল ছিলেন। ঠিক এমনি সময়ে এক বুড়ি কাঁদতে কাঁদতে ছুটে এসে তার দুটী পা জড়িয়ে ধরে লুটায়ে পড়লো। খানজাহান আলী (রঃ) ব্যস্ত হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন কি হয়েছে মা? বুড়ি কানতে কানতে বললো—আমার একমাত্র নাতি আমার চোখের মানিক—তাকে এই মাত্র কুমিরে ধরে নিয়ে গেছে। তুমি আমার নাতিকে বাচাও বাবা। তুমি থাকতে আমাদের এত কষ্ট হবে পীর বাবা? বুড়ির কথাশুনে পীর সাহেবের মন বেদনায় ভারাক্রান্ত হয়ে উঠলো। বুড়িকে সঙ্গে নিয়ে নদীর কিনারে গিয়ে তিনি কুমীরদের ডাক দিয়ে বললেন তোরা কে কে এই বুড়ির নাতিকে খেয়েছিস আমার কাছে চলে আয়। কিছু সময়ের মধ্যে নদীর তলদেশ থেকে দুটী কুমীর ভেষে উঠলো এবং অপরাধির মত তার সামনে এসে দাড়ালো। তিনি বুজতে পারলেন যে তারা বুড়ির নাতিকে খেয়ে ফেলেছে। তখন পীর সাহেব বুড়িকে সান্তনা দিয়ে বললেন আপনি এদের মাফ করে দেন, এরা আর কোনদিন কোন মানুষের ক্ষতি করবে না। কুমীরদের বললেন আজ থেকে আল্লার নামে তোদের আমি বন্দি ক'রলাম। সারা জীবন তোরা আমার দীঘিতে থাকবি কিন্তু কারো কোন ক্ষতি করতে পারবে না। কুমির অনুযোগ করলো তবে আমরা কি খাব। তিনি বললেন আমার কথা পালন করে চললে চিরকাল তোরা এখানেই খাবার পাবি। অন্যসব কুমিরকেও তিনি তার রাজ্য সীমার বাইরে যাওয়ার নির্দেশ দিলেন। যদি আসতে হয় তবে ভেসে আসতে হবে। সেই থেকে এখানকার নদীতে আর কুমির দেখা যায় না।

এই প্রবাদগুলির কোনটি যে সত্য তা সঠিক করে বলা যায়না।

www.pathagar.com

তবে শেষের এই প্রবাদটি বহুল প্রচলিত। এই গল্প সত্য হোক বা নাই হোক তাকে ঘিরে এই গল্পগুলির মধ্য দিয়ে বোঝা যায় যে তিনি মস্তবড় একজন আল্লার অলি ছিলেন। এমনও গল্প শোনা যায় যে বাঘও তার দাসত্ব স্বীকার করেছিল। তিনি বাঘের পিঠে চড়ে জঙ্গলের পথে ঘুরে বেড়াতেন। তার একজন প্রধান সহচর সৈয়দ আহম্মদ শাহ ওরফে জৌন্দাপীর (রঃ) কে কেন্দ্র করে এমনি একটি গল্প শোনা যায়। পরে সেটি আলোচনা করা যাবে।

এই দীঘির পানি সম্পর্কে ও এমনি একটি প্রবাদ প্রচলিত আছে যে এই দীঘিতে ৪ প্রকারের পানি বিগুমান ছিল এবং সেই জন্যই এই দীঘির পানিতে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন রং পরিলক্ষিত হোত। কোন এক সময়ে নাকি 'আড়েল বাকা' নামক এক শ্রেণীর পানি দীঘির পুর্ব উত্তর কোনের পাড় ভেঙ্গে নদীতে বেরিয়ে যায়। দীঘির পাড়ের অংশটা আজও ভাঙ্গা রয়েছে। এইটিই নাকি পানি ভেঙ্গে বেরিয়ে যাবার চিহ্ন।

এই দীঘি সম্পর্কে আর একটি রহস্যময় কথা জানা যায় এই যে, এই দীঘির ঠিক মাঝখানে পানির তলদেশে মছজিদের মত একটি অট্টালিকা রয়েছে। শোনা যায় কোন এক চৈত্রের দিনে দীঘির পানি অনেক শুকিয়ে যাবার ফলে এই মছজিদের চূড়া বেরিয়ে পড়েছিল। অনেকেই এই চূড়া পরিদর্শন করেছিলেন। খাদেমগণের ভিতর প্রবীণেরা কেউ কেউ একথা সমর্থন করেন। তারা বলেন দীঘির মাঝখানে একটা কিছু যে আছে তাতে কোন সন্দেহ নেই। তারা তালের ডোঙ্গা নিয়ে ভিতরে গিয়ে বাঁশের লগা দিয়ে এর অস্তিত্ব অনুভব করেছেন।

এ সম্পর্কে কেউ কেউ অভিমত প্রকাশ করে বলেন যে, তৎকালে

www.pathagar.com

জল দস্যুদের হাত থেকে নিরাপদ করবার জন্য হযরত খানজা-হান আলী (রঃ) তার ধনাগার পানির তলদেশে দীঘির মাঝখানে নির্মাণ করেছিলেন। এইটিই তার প্রবাদের মধ্যে প্রচলিত সেই গোপন ধনাগার। এই ধনাগার পাহারা দেবার জন্যই তিনি এই দীঘিতে কুমীর রেখে দিয়েছিলেন। এই ধনাগারে প্রবেশের পথ তিনি ছাড়া আর কারোই জানা ছিল না। কেউ কেউ মনে করেন যে তার উদ্বৃত্ত ধন সম্পদ এই ধনাগারে আজও লুক্কায়িত রয়েছে।

এ সম্পর্কে আবার কেউ কেউ বলেন, যে এটি একটি বৌদ্ধ মন্দির বা মঠ জাতিয় কিছু হতে পারে। দীঘি খননের সময় যে বৌদ্ধ মুর্ত্তিটি এখানে পাওয়া গিয়েছিল সেটা এই মন্দিরেরই মুর্ত্তি। দীঘি খনন করার সময় মাটির স্তুপের ভিতর থেকে হটাৎ একটি বৌদ্ধ মঠ আবিস্কৃত হয়ে পড়ে। দীঘি খননের কাজ তখন অনেক দুর এগিয়ে গিয়েছে। তখন এর চারিদিক হতে মাটি অপসারণের ফলে এটি পানির তলদেশে নিমজ্জিত হয়ে যায়। যদি সত্যিই কোন কিছুর অস্তিত্ব টের পাওয়া যায় তবে এটি সেই বৌদ্ধ মঠের অস্তিত্ব ছাড়া আর কিছুই নয়।

এস, এম ইউনুছ আলী তার "ঐতিহাসিক রুপ রেখায় খানজাহান আলী" প্রবন্ধে বলেন, "তবে দিঘীর মাঝখানে যে কিছু একটা আছে এতে কোন সন্দেহ নেই। কেননা কিছু দিয়ে আঘাত করলে ইট পাথরের অস্তিত্ব অনুভব করা যায়।' তাই অনেক সম্পদ লোভি মানুষ একে কেন্দ্র করে আজ সম্পদের চিন্তায় বিভোর।

বর্ত্তমানে এই দিঘীর পানির সচ্ছতা পুর্ব্বের ন্যায় আর নেই। কিন্তু এর চেহারার কিছুটা পরিবর্ত্তন ঘটলেও স্বাদে গন্ধে কোন

www.pathagar.com

ত্রুটিই পরিলক্ষিত হয়না। দুরারোগ্য ব্যাধির মুক্তিলাভের আশায় অনেক লোক এই পানি আজও ভক্তির সাথে ব্যবহার করে আসছে। তবুও পানির রং কেন পরিবর্ত্তন হোল এ নিয়ে অনেকেই চিন্তা করে বলে থাকেন এটা খাদেমগনের অবজ্ঞা ও নির্দেশ অমান্য করার ফল। তাই যদি হয় তবে আল্লার কাছে তাদের তওবা করে পীর সাহেবের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করা উচিত ও দিঘীতে জাল ফেলা চিরতরে বন্ধ করে দেওয়া উচিত।

পীর সাহেবের কুমিরের রহস্যময় জীবন

হযরত পীর খানজাহান আলাইহের রহমতের দিঘীর কুমীরকে কেন্দ্র করে যত গল্প, যত প্রবাদই থাকুক না কেন, ও এগুলি জীন হোক. ঘোড়া হোক বা প্রকৃত কুমিরই হোক এদের জীবন ধারণ ও বংশ বৃদ্ধির পদ্ধতি বড় অদ্ভুদ ধরণের।

এদের জীবনের প্রধান বৈশিষ্ট হোল এরা ভয়ানক হিংস্র প্রকৃতির এবং নিজেরাও নিজেদের প্রতি মোটেই সহনশীল নয়। এদের নিতান্ত স্বাভাবিক ও সহজ চলাফেরা দেখলেও মনে ভয়ের সঞ্চার হয়। বাস্তব অভিজ্ঞতার আলোকে এদের আমি জীবন ধারণ করতে দেখেছি. একের সাবধানতা ও অন্যের ভীষণ হিংস্র-তার মধ্য দিয়ে। এদের মধ্যে একটি মাদি কুমীরকে আর একটি মাদি কুমীর মোটেই সহ্য করতে পারেনা এবং একটি পুরুষ কুমির অন্য একটি পুরুষ কুমীরকে দেখা মাত্র এমন আক্রমণ করে যে, যে কোন একজন মৃত্যুবরণ না করা পর্যন্ত তারা সংগ্রাম থেকে

www.pathagar.com

নিরস্ত হয়না এবং জীবন্ত কুমিরটি মৃত্যু কুমিরটিকে ছিড়ে খেয়ে ফেলে। পুরুষদের মধ্যে অপেক্ষাকৃত যে ছোট সেই পালিয়ে বাচতে চেষ্টা করে। মাদি কুমিরও অনেক সময় একের আক্রমণ থেকে অন্যে পালিয়ে বাচতে চেষ্টা করে। একে অন্যকে দেখামাত্র যদিও তারা আক্রমন করে তবুও একজন যদি পরাজয় স্বীকার করে, পানির নিচে ডুব দিয়ে অন্যত্র পালিয়ে যায়, তবে মাদি কুমির-দের মধ্যে আক্রমণ কারীকে অনেক সময় নিরস্ত হতে দেখা যায়। বছরের বিশেষ এক সময়ে এরা আনন্দ মুখর ও সঙ্গে সঙ্গে বেশী হিংস্র হয়ে ওঠে। বর্ষাকালই এদের সেই সময়। তখন তারা পরস্পর অধিক মারামারি করে এবং মাদি কুমীর পুরুষ কুমিরের সঙ্গ লাভের জন্য উদগ্রীব হয়ে ওঠে। দেখা যায় একটি পুরুষ কুমীরের আওতায় ৩/৪ বা ততোধিক মাদি কুমির থাকতে পারে কিন্তু কোন অবস্থাতেই তার আওতায় বা এই দীঘিতে আর একটি পুরুষ কুমির থাকা সম্ভব নয়। বর্ষাকলে এদের জলকেলি খুবই উপভোগ্য বস্তু। এদের জলকেলী দেখলে বিস্ময়ে ও আনন্দে চেয়ে থাকতে ইচ্ছা হয়। এইভাবে এই দীঘির মাঝে রচিত হয়েছে পুরুষ ও মাদি কুমিরের বহু প্রণয় উপাখ্যান আবার আতাত বিহীন সংগ্রামে অনেক পুরুষ কুমির এখানে নিদারুনভাবে মৃত্যুবরণ করেছে।

শ্রাবন ভাদ্র মাসে দীঘিতে যখন পানি থৈ থৈ করে তখনই মাদি কুমিরের পেটে ডিমের সূত্রপাত হয় এবং মাঘ ফাল্গুন মাসে এরা মাটিতে গর্ত করে ডিম পাড়ে। শীতের দিনে এই কুমীর কুল শীতে বড় কাতর হয়ে পড়ে। তখন পানি থেকে এরা ডাঙ্গায় উঠে পড়ে ও উষ্ণতার লোভে ঘন্টার পর ঘন্টা রৌদ্রের মধ্যে পড়ে থাকে। খাওয়া দাওয়ার প্রতি এদের তখন তেমন কোন আগ্রহই

www.pathagar.com

দেখা যায় না। কোন কোন সময় দেখা যায় খাদেমগণ এদের ঘুমন্ত স্থানে গিয়েই তাদের জন্য লোকের আনিত খাবার দিয়ে আসেন। অলসতা তখন এদের পেয়ে বসে। ডাকলেও তখন এরা সহজে নড়তে চায় না বরং মনে হয় বিরক্তই বোধ করে। পেটে ডিম এলে কুমিরের খুধা লাগলে প্রায়ই মাটী খেয়ে রৌদ্রে পড়ে থাকে। এই সময় এদের প্রধান খাদ্য বলা যায় মাটি। শীতের রাতেও কুমীর পানিতে থাকতে চায় না।

মাঘ ও ফাল্গুন মাসে মাদি কুমীরগুলি দীঘির উচু পাড়ে জঙ্গলের ভিতর অপেক্ষাকৃত নির্জন ও নিরাপদ স্থানে বালি খুড়ে সুদীর্ঘ একটি গর্ত তৈরি করে ডিম পেড়ে সেখানেই অবস্থান করতে থাকে। অনেক সময় তাদের খোড়া পুরানো গর্তেও এরা ডিম পেড়ে থাকে। এই ডিমগুলি রেখে এরা সামান্য সময়ের জন্যও বাইরে যেতে চায় না। ডিমগুলি গর্তের সম্মুখ ভাগে বালুর নীচে ঢাকা থাকে। কুমীরের দেহটা গর্তের ভিতরে থাকে এবং ডিমগুলি তার মুখের কাছাকাছি বালুর নীচে থাকে। সুর্যোর আলো ও বালুর তাপে এবং কুমীর নিজের শ্বাস প্রশ্বাসের তাপেও এই ডিম তা দেওয়া হয়। এই সময় একটি পাখিও তার গর্তের সম্মুখে যেতে পারে না। একটু কিছু দেখলেই সে ভয়ানক ভাবে গর্জন করে তাড়া করে। মানুষ দেখলে সে ভয়ানকভাবে ফোস ফোস করতে থাকে। তিন মাস ধরে এই মাদি কুমিরের কোন খাওয়া নাওয়া থাকে না। বড় বেশি খুদা লাগলেও তখন ওরা মাটি ও বালু খেয়ে ডিমের কাছেই পড়ে থাকে। তখন হাজার ডাকলেও ডিম রেখে এরা কোথাও যাবেনা। অনেক সময় এদের গর্তের কাছে এসে লোকে এদের মুরগী খেতে দিয়ে যায়। দু একটা মুরগী এরা ওখানে বসেই

www.pathagar.com

গিলে খেয়ে ফেলে। কুমিরের জিহ্বা নাই বলে এদের সব কিছুই ছিড়ে ছুটে গিলে খেতে হয়। পানির ভিতর গিলে খেতে এদের বেশ একটু সুবিধা হয়। এক সঙ্গে এরা ৮/১০ হালি ডিম পাড়ে ডিমের প্রতি এদের অপরিসিম দরদ। মাঝে মধ্যে পুরুষ কুমির এদের বাসা তদারক করতে এসে থাকে কিন্তু কোন মাদি কুমিরই তখন তাকে কোন খাতিরই দেখায় না বরং ভাবটা এমনই দেখায় যে 'খবরদার আমার বাসার দিকে এসো না'।

তিন মাস পরে এক সময় এই ডিমগুলি ফুটে যাবার সময় হয়। ডিম ফোটার সময় হলে মাদি কুমীর স্বাভাবিক নিয়মেই বুঝতে পারে এবং সম্মুখের গর্ত হাতা দিয়ে খুড়ে ডিমগুলি বের করে ফেলে। অল্প সময়ের মধ্যেই ডিমগুলি আপনা থেকে ফেটে এক একটা কুমিরের বাচ্চা বেরিয়ে আসতে থাকে এবং মায়ের বুকের ভিতর দৌড়ে যায়। কুমির মায়ের তখন খুশি আর ধরে না। সে আয়ন্দে লাফাতে থাকে এবং অতি ক্ষিপ্রতার সঙ্গে সে এক একটা বাচ্চা ধরে, আর টপাটপ গিলে খেতে থাকে। বাচ্চারা ইতস্তত ছোটাছুটী করতে থাকে বলে বাচ্চাদের মা তখন তাদের সব গুলিকেই ধরে খাবার জন্য ভিষন চঞ্চল ও ব্যস্ত হ'য়ে পড়ে। এমনি অবস্থার ভিতরে পড়ে অধিকাংশ বাচ্চাই প্রাণ হারায়। কেউ কেউ অবস্থা বেগতিক দেখে মায়ের দিকে না গিয়ে দীঘির পানির দিকে দৌড় দেয় ও এখানে সেখানে ঝোপ দামের ভিতরে লুকো-বার চেস্টা করে। বাচ্চা না দেখে কুমির মায়ের তখন ভীষণ কান্না পায়। এত সাধনার ধন তার কোথায় লুকালো ? তাই অতি দুঃখের সঙ্গে সে তখন নাছোড়বান্দা হয়ে তাদের খুজতে থাকে। তার বাচ্চাদের সে ঝোপ দামের নিচে সব জায়গায় খুজতে খুজতে

www.pathagar.com

যাকেই পায় তাকেই ধরে পেটের মধ্যে চালান করতে থাকে।

তারপর পুরুষ কুমীর এই বাচ্চা ফোটার খবর পেয়ে গেলে তো কথাই নেই। এই বাচ্চা ধরে খেতে তার উৎসাহের কোন অন্ত নেই। এমনি করে এই কুমিরের বংশ বৃদ্ধি হওয়া একটা অসম্ভব ব্যাপার হয়ে দাড়ায়। কদাচিত দু'একটি কুমিরের বাচ্চা বাইরে থেকে বড় হয়ে দীঘিতে আসে। তাই এই ছয়শত বছরেও চার পাঁচটির বেশী কুমির এই দীঘিতে দেখা যায় না।

কুমীরের মুখটা বেশ লম্বা ও দুই ভাগে বিভক্ত। এদের মুখের দুই পাটিতেই দাঁত ভর্তি রয়েছে। নীচের পাটির সম্মুখভাগে বেশ বড় বড় দু'টি দাত রয়েছে এবং উপরের পাটিতে এর সোজা সুজি ২টা ছিদ্র রয়েছ। মুখ বন্ধ করলে এই দাঁত দুটী ঐ ছিদ্র দিয়ে উপরের দিকে বেরিয়ে যায়। এই দাঁত দুটীকে "খিল দাঁত" বলা হয়। অনেক সময় এই দাঁত দুটীতে মুখ আটকে গেলে সহজে কুমীর আর মুখ হা করতে পারে না। অনেক সময় ধরে অনেক চেষ্টা করে কুমীরকে তখন হা করতে হয়।

ইতিপূর্ব্বে এই দীঘির কুমীর কোন মানুষ ধরেছে বলে শোনা যায়নি। কিন্তু বেশ কিছুদিন পূর্ব্বে এই দীঘির একটি কুমিরের গায়ে আধুনিকতার ছাপ লেগে যায়। সে বেশ আধুনিক হয়ে ওঠে ও তার মনে শিকারের প্রবৃত্তি মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। সেই কুমিরটাই মাঝে মধ্যে ২/১টা মানুষের ক্ষতি সাধন করেছে। সে যখন এমনি দুর্দ্দান্ত হয়ে উঠলো তখন একদিন দেখা গেল, বলা নাই, কওয়া নাই, দীঘির পশ্চিম পাড়ের নীচে সে বিনা কারণেই ম'রে পড়ে আছে। সে সময় এটাকে বড় কুমির বলা হোত। এই দীঘির কুমির মরে গেলে কবর দেওয়া হয় বলে, তাকেও কবর দিয়ে রাখা

www.pathagar.com

হ'য়েছিল। এদের ছাল খুলে কোন সময়ই কোন কাজে লাগানো হয় না। আমার ছেলে বেলায় একবার কোথা হতে কয়েকটা সাওতাল লোক এসে গর্তের ভিতরে থাকা একটা কুমীরকে হত্যা করে। কিন্তু সে খাদেম সাহেবদের হাতে ধরা পড়ে যায়। তাদের আইনে সোপর্দ্দ করা হয় এবং এই কুমির হত্যার অপরাধে তাদের কয়েক মাস সশ্রম কারাদণ্ড ভোগ করতে হয়েছিল। শোনা যায় খাদেম সাহেবদের কারো কারো দীঘির মাঝে পাতা নায়লনের জালে বেধে কুমীর মারা গেছে। কিন্তু তার কোন বিচার আজও হয়নি। তবে কথা হোল আজকাল আমরা সবাই যদি পীর সাহেবের আদেশ অমান্য করি এবং দীঘির কুমীরও যদি তার একটি আদেশ অমান্য করে তবে তাদের কোন অপরাধ হ'তে পারে বলে আমি মনে করি না।

এই কুমির সম্পর্কে এমন একটা প্রবাদ আছে যে, এই দীঘির কুমিরে কোনদিন মানুষ ধরতো না, বরং মানুষকে এরা শ্রদ্ধা করতো এবং তাদের সন্তানদের এরা খুবই ভালবাসতো। কিছুদিন পুর্বেও মানুষ এমনি মানত করতো যে তার সন্তান হলে সে কুমীরকে দিয়ে আসবে। এনেও দিত তাই। দীঘির ঘাটে সন্তান রেখে দিলে তারা মুখে করে নিয়ে গিয়ে আবার ফেরত দিয়ে যেত। একদিন তাদের কারো মুখ থেকে একটা বাচ্চা পানিতে পড়ে গিয়ে মারা গেলে নাকি এমনি মানত করা বন্দ হয়ে যায়।

এই কাহিনী সত্য, মিথ্যা যাই হোক, এইটুকু সত্য যে, এই কুমিরের উপর মানুষের একটা পরম আস্থা ছিল এবং সে আস্থা আজও রয়েছে। তারা মানুষের উপর আজও কোন আক্রমণ করে না। তাই মানুষ দীঘিতে নেমে আজও হরহামেশা গোছল

www.pathagar.com

করছে কিন্তু কাউকেই তারা ধরে নিয়ে যায় না। দীঘির পানির কাছাকাছি হরহামেশা গরু ছাগল চরতে দেখা যায়। কিন্তু দীঘির কুমির তাদেরও কোন সময় আক্রমণ করে ধরে নিয়ে যায় না। মানুষের কোনরূপ ক্ষতি করার কোন প্রবৃত্তিই এদের নাই।

এই কুমিরের জন্যই মাজারের খাদেমদের প্রচুর আয় হয়ে থাকে। এদের জন্য মানত করা বহু খাশি-মুরগী এখানে হাজির হয়। প্রতিদিন যত মোরগ-মুরগী ও খাশি এখানে হাজির হয় সবগুলিই কুমিরকে খেতে দেওয়া হয় না এবং কুমির এতগুলি খেতেও পারেনা। দর্শকগণ মানতের মুরগী নিয়ে হাজির হলে কুমির ডেকে দেওয়ার জন্য খাদেমগণ দর্শকদের নিকট থেকে পারিশ্রমিক নিয়ে থাকেন। অনেক সময় এই পারিশ্রমিকের পয়সা নিয়ে দর্শক ও তাদের মধ্যে অনেক বাকবিতণ্ডার সৃষ্টি হয়। তাদের মুরগী কুমিরে না খেলে মানত শোধ হবে না এই ভেবে অনেক দর্শক অনেক নিষ্ঠুরতার পরিচয় দিয়ে থাকেন। একটা জ্যান্ত মুরগীকে বার বার তারা পানির মধ্যে ফেলে দিতে থাকেন। কোন কোন মুরগী পানিতে ডুবেও মারা যায়। আবার যখন তার দু'একটি মুরগী কুমিরে ধরে পানির মধ্যে মাথা উঁচু করে গিলে খেতে থাকে তখন এই দৃশ্য দর্শকগণ আনন্দের সঙ্গে উপভোগ করতে থাকেন। 'আয় আয় ও কালাপাড়' বলে খাদেমগণ কুমির ডাকেন। এই কুমিরকে তারা বেশ যত্ন করে থাকেন।

www.pathagar.com

হযরত খানজাহান আলী (রঃ)র অন্যান্য কীর্তি

হযরত পীর খানজাহান আলাইহের রহমাতের যে সকল অমর কীর্তি শতাব্দির ভ্রূকুটিকে উপেক্ষা করে মহাকালের বুকে আজও মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে রয়েছে তা সবই তার ও তার শিষ্যদের শিল্পকীর্তি ও কেরামতির অমর এবং তুলনাহীন নিদর্শন। এইসব বিস্ময়কর কীর্তি সমুহ দেখলে স্বাভাবিক নিয়মে মনে এই প্রশ্নই জেগে ওঠে যে, যাঁর নামের কোন লিখিত ইতিহাস পাওয়া যায় না, একটা জন বিরল জঙ্গল এলাকায় যিনি তার আবাসস্থল নির্বাচন করেছিলেন, যার রাজ্যের পরিধিও সীমিত ছিল এবং ফকিরি হালাতে যিনি জীবন যাপন করেছেন, এই সব মছজিদ নির্ম্মাণ ও দীঘি খননের জন্য এত অর্থ সম্পদ তিনি কোথায় পেয়েছিলেন? সাধারণ জ্ঞানে এই সব চিন্তা করতে গিয়ে অনেকে তাকে অনেক রকম ভেবে বসে থাকেন। কিন্তু একটু ভেবে দেখলে দেখা যাবে যে, তার জীবনের শুরু থেকে প্রত্যেকটি ঘটনাই ছিল অসাধারণ।

এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গিয়ে ঐতিহাসিক সূত্র অনুসন্ধান করে দেখা যায় যে তার জীবনের এক পর্য্যায়ে গৌড়ের সুলতান নাছির উদ্দিন মাহমুদ শাহ দক্ষিণ বঙ্গ অভিযানে এসে তার ভক্ত হয়ে পড়েন এবং তখন তিনি হুজুরের সকল মহত কাজে সম্পূর্ণ সহযোগিতা প্রদান করার জন্য ও তার অর্থ প্রয়োজন মিটানোর জন্য এই খলিফাতাবাদ রাজ্যেই একটি ট্যাকশাল নির্ম্মাণ করেছিলেন। এ সম্পর্কে জনাব হেদায়েতুল ইসলাম খান তার খানজাহান আলী

www.pathagar.com

প্রবন্ধে দৃড়তার সঙ্গে বলেন যে, 'তার মাজারের উপরেও নাছির উদ্দিন মাহমুদ শাহের নাম লিখিত আছে।' তাহলে ইতিহাসের সাক্ষী ও নিদর্শন আমরা পেয়ে যাই এবং তার ইতিহাস প্রমাণ করবার জন্য অন্য কোন নজিরের প্রয়োজন হয়না।

তিনি যখন এই অঞ্চলে আগমন করেন তখন বাগেরহাটের এই অঞ্চল ছিল সুন্দরবনের গভীরতম প্রদেশ। তাই এই স্থানকে বসবাসের উপযোগী করে তোলার জন্য তিনি একটা বিস্তীর্ণ এলাকার জঙ্গল কেটে পরিস্কার করে অজস্র জলাশয়, রাস্তাঘাট নির্মাণ করে ও সর্ব্বোপরি এখানে শহর স্থাপন করে এই এলাকাকে মানুষের বসবাসের উপযোগী করে তুলেছিলেন। তার এই মহত্ত কাজে তার অনুগামীগণ তাদেরও জীবনকে বাজি রেখে তাকে সাহায্য করেছিলেন। তাদের উপহার দেওয়া কোদাল ও তরবারির তারা পূর্ণ সদ্ব্যবহার করেছিলেন। যার ফলে একটি জনবিরল জঙ্গল এলাকা অতি অল্প সময়ের মধ্যে একটি ছোট হলেও খ্যাতি সম্পন্ন রাষ্ট্রে পরিণত হতে পেরেছিল।

তার স্থাপিত রাজ্যের জনসাধারণের সকল প্রকার সুখ সুবিধার দিকে তার বিশেষ লক্ষ্য ছিল। ধর্ম প্রচার ও মানব কল্যাণই ছিল তার শেষ জীবনের একমাত্র লক্ষ্য। তার এইসব কাজে তার মুরিদগণই তাকে সদা সর্বদা সাহায্য করেছেন এবং অনুগামীগণও এসব কাজে সকল সময়েই নেতৃত্ব দিয়েছেন। এইসব কাজে যারা তাকে সর্বদা সাহায্য করতেন তাদের মধ্যে যাদের নাম উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে তারা হলেন, মোহাম্মদ আবু তাহের, গরিব শাহ, বইরাম শাহ বা বাহরাম শাহ, হাশিম শাহ, রেবাস শাহ, ফতে খাঁ, বুড়ো খাঁ, খালেছ খাঁ, গদা খাঁ, ইখ-

www.pathagar.com

তিয়ার খাঁ, বখতিয়ার খাঁ আনোয়ার খাঁ, আজম খাঁ, দিদার খাঁ মকিম খাঁ, কোমর খাঁ, ওমর খাঁ, আহম্মদ খাঁ, আনার খাঁ, শাহবাজ খাঁ, রেজা খাঁ, দরিয়া খাঁ, শাহাদত খাঁ, আহম্মদ শাহ ওরফে জিন্দাপীর, ঠাণ্ডাপীর ও পাগল পীর। এ ছাড়াও আরও অনেক মাজার রয়েছে' কিন্তু এই মাজারগুলি কাদের তা আজও অজ্ঞাত। তবুও যাদের মাজারগুলি বহু পুরাতন বাঁধানো অবস্থায় পাওয়া যায় তারাও যে এক একজন বিশিষ্ট কামেল ব্যক্তি ছিলেন তাতে সন্দেহের অবকাশ নেই। উপরে যাদের নামগুলি উল্লেখ করা হোল তাদের অধিকাংশের ব্যক্তিগত নামে মাজার দীঘি ও মছজিদ বর্তমান রয়েছে।

এই এলাকা ছাড়াও অন্য এলাকায় আরো অনেকের নামে অনেক দীঘি রয়েছে। যেমন ইরান খাঁ, তুরান খাঁ, বিলাল খাঁ, রহমত খাঁ, জমজম খাঁ, নফর খাঁ, ইত্যাদি।

ভৈরব নদীর কুলে হযরত খানজাহান আলী (রঃ)র বাসভবন ও কোতয়ালী চৌতারার মাঝামাঝি ১২ গুম্বজ বিশিষ্ট একটি মছজিদ ছিল। এই মছজিদটির নাম ছিল দিদার খাঁ মছজিদ। এই মছজিদটি বর্তমানে আর নেই। এখানে আছে সামান্য কিছু ইটের স্তূপ। সোনা বিবির বাড়ী থেকে বেশ কিছু দূরে বাগমারা গ্রামের মধ্যে রয়েছে আনার খাঁর দীঘি ও মছজিদ। এই মছজিদ-টার অবস্থাও ভগ্নাতুর। কাঁঠাল তলার কাছে রয়েছে গাদাখাঁর মছজিদ। রণ বিজয়পুর গ্রামে রয়েছে দরিয়া খাঁ ও আহম্মদ খাঁর মছজিদ। এই মছজিদগুলি আজ ধ্বংসের কবলে। এখানে আর একটী নামকরা মছজিদ ছিল যার নাম ছিল 'কাতাবি মছজিদ'। কিন্তু এই মছজিদগুলিও বর্তমানে নেই। এই মছজিদটি এই কারণেই উল্লেখযোগ্য যে, সেখানে একটী মাদ্রাসা স্থাপিত হয়েছিল।

www.pathagar.com

এই গ্রামে আরও কয়েকটী পুরাণো দীঘি রয়েছে। ষাটগুম্বজ মছজিদে প্রবেশের পথেই রয়েছে আর একটী দীঘি। এই দীঘিটী কোদাল ধোয়া দীঘি নামে পরিচিত।

এই কোদাল ধোয়া দীঘিটী সম্পর্কে বেশ কয়েকটী গল্প প্রচলিত রয়েছে। প্রথম গল্পে জানা যায় যে, ঘোড়া দীঘি খনন কার্য সমাধা হবার পর যখন পীর সাহেব দেখলেন যে, দীঘি সাঙ্গে সঙ্গে স্বচ্ছ ও নির্মল পানিতে ভরে গিয়েছে তখন তিনি পানির কাছে গিয়ে এই নির্মল পানি হাতে নিয়ে আল্লাহ শোকর গোজারী করে বললেন, এ পানি বেহেস্তের পানি, আল্লার দেওয়া পানি, এ পানি কেউ যথেচ্ছা ব্যবহার কোরনা। তখন তিনি পুকুর খনন করা কর্দমাক্ত কোদালগুলিকেও এই পানিতে ধৌত করতে নিষেধ করেন। তখন এই কোদালগুলি ধোবার জন্য তারই নির্দেশে এক ঘড়ি অর্থাৎ এক ঘন্টা সময়ের মধ্যে সবাই এই দীঘি খনন করেন এবং কোদালগুলি এই দীঘির পানিতেই পরিস্কার করা হয় বলে এই দীঘির নাম হয় 'কোদাল ধোয়া দীঘি'। এই এক ঘড়ি সময়ের দীঘি দেখলে অতি সহ-জেই অনুমান করা যায় যে, কত বড় বিশাল জনতা এই দীঘি খননের কাজে নিয়োজিত ছিল। এক ঘন্টা সময়ের মধ্যে তিনি যে দীঘি খনন কারেছিলেন তা দেখলেও বিস্ময়ের অন্ত থাকে না।

আবার এমন একটী গল্পও শোনা যায় যে, ঘোড়া দীঘি খনন করার পর কোদাল ধোয়ার জন্য তিনি সবাইকে বললেন যে, তোমরা সবাই এই স্থান থেকে যার যার কোদালে করে এক এক কোদাল মাটী নিয়ে যাও। সবাই এই স্থান থেকে এক এক

www.pathagar.com

কোদাল মাটী উপরে ফেলে দিল এবং তাতেই এই দীঘির সৃষ্টি হয়। এক প্রবীন বৃদ্ধ বলেন, এর পাশেই আর একটী দীঘি ছিল এই দীঘিটী কাদির ধোপার দীঘি নামে পরিচিত ছিল। এখানে এক জন ধোপা বাস করতো. প্রথমে সে হিন্দু ছিল। কিন্তু পরে মোছলমান হয়ে পীর সাহেবের অনুমতি নিয়ে সে তার কাজের সুবিধার জন্য একাই এই দীঘিটী খনন করে।

যেহেতু ষাটগুম্বজ মছজিদকে কেন্দ্র করেই ছিল খলিফাতাবাদ শহর এবং এই কেন্দ্র স্থলে ধোপা থাকাই স্বাভাবিক। কিন্তু সেই দীঘিটী এখানে নয়। কাঁঠাল গ্রামের মধ্যে অন্য একটী দীঘি রয়েছে, সেই দীঘিটীই ধোপার দীঘি নামে পরিচিত। কাজেই বাস্তব ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, কোদাল ধোয়া ও ধোপার দীঘির দুরত্ব প্রায় ৪ মাইল। তবে এখানে আর একটী দীঘি থাকাও স্বাভাবিক।

ঘোড়া দীঘির কিছুদুর পশ্চিমে বাদামতলা নামক স্থানে একটি মছজিদ রয়েছে। এই মছজিদটি যে কার নামের স্মৃতি বহন করতো তা আজ আর সঠিক বলা যায় না। তবে চুনো খোলা নামক স্থানে এই মছজিদটি আছে বলে বর্তমানে একে চুনো খোলা মছজিদ বলা হয়। এই খানেই পীর সাহেবে চুনো তৈরীর কারখানা ছিল। মছজিদটির আশে পাশে পুরাতন বাসগৃহের চিহ্ন তেমন একটা দেখা যায় না। তবে মছজিদটি যে তৎকালীন ভৈরব নদীর কুলে অবস্থিত ছিল তাতে কোন সন্দেহ নেই। এই মছজিদটি আজও বিদ্যমান রয়েছে এবং সরকার কর্তৃক সংরক্ষিত। বাদোখালি বিলও এই মছজিদের কাছাকাছি। বর্তমানে এখানে নিয়মিত নামাজ পড়া হয়। আরও পশ্চিমে সায়ড়া

www.pathagar.com

গ্রামের মধ্যে আরও একটি মছজিদ ও একটী দীঘি ছিল। সুগন্ধি গ্রামেও এমনি একটী ভগ্নপ্রায় মছজিদ ও একটী দীঘি আজও বিদ্যমান রয়েছে। এখানে শেখ বাড়ীর সন্নিকটে একটী পুরাতন মাজার রয়েছে। বলা যায় না এই মাজারটী কার। তবে মাজারটী যে সেই আমলের তা তার ইট ও গঠন পদ্ধতি দেখলে বোঝা যায়। অনেকে অনুমান করেন, যার কবরই এটী হোকনা কেন, তিনি নিশ্চয়ই খানজাহান আলী (রঃ) সঙ্গী ও বিশেষ কামেল ব্যক্তি ছিলেন। স্থানীয় অনেক লোকেই তার প্রমাণ পেয়েছেন। সায়েস্তা গ্রামের মধ্যে যে ছোট মছজিদটির ধ্বংসাবশেষ বিদ্যমান, শোনা যায়, এটি নাকি এক সময়ে কোন এক গরীব শাহের ব্যক্তিগত এবাদতখানা ছিল। নির্জনে এবাদতের জন্য তিনি এইখানেই তার এবাদত খানা তৈরি করেছিলেন।

বর্তমানে বাগেরহাট পৌরসভার অন্তর্গত খারছুয়ার গ্রামে আজম খাঁর মসজিদ নামে একটি মসজিদ রয়েছে। এই আজম খাঁ সম্পর্কে একটি সুন্দর গল্প শোনা যায়। গল্পটি এইরূপ যে, আজম খাঁ নামে এখানে দুই ব্যক্তি বসবাস করতেন। একজন ছিলেন বড় আজম খাঁ ও একজন ছিলেন ছোট আজম খাঁ। এরা দুই জনেই এখানে দুইটি দীঘি খনন করেন। এই দীঘি দুইটি আজও সকলের নিকট বড় আজম খাঁর দীঘি ও ছোট আজম খাঁর দীঘি নামে পরিচিত। কেউ কেউ বলেন, এরা ছিলেন দুই ভাই। কিন্তু একই নাম যখন তখন দুই ভাই না হওয়ার সম্ভাবনাই বেশী। তবে দু'জনে একই কাজ করতেন ও দু'জনের মধ্যে মহব্বতের কোন অভাব ছিল না। এরা দু'জনেই ছিলেন পীর সাহেবের প্রধান ভাস্কর ও রাজমিস্ত্রী। এরা দুজনেই ছিলেন পীর সাহেবের

www.pathagar.com

মুরিদ। হযরত পীর খানজাহান আলী (রঃ) এই দুই রাজমিস্ত্রীর কর্মদক্ষতায় খুশী হয়ে তাদের বসবাসের জন্য এই এলাকায় তাদের গৃহ নির্মাণের জন্য ভূমি প্রদান করেছিলেন। এখানে দুই খাঁযের বাসস্থান ছিল বলে পীর সাহেবই এই স্থানের নাম দিয়েছিলেন খাঁর দ্বার।

সেন রাজাদের রাজত্বকালে স্থাপিত সুন্দরবন অঞ্চলের শাসন কেন্দ্র 'খাদি অঞ্চল' সম্পর্কে আলোচনাকালে অনেকে বলেন যে, খাদি অঞ্চলের কেন্দ্রভূমিও ছিল এই খারদ্বার গ্রাম। এই গ্রামের ইংরেজ আমলের প্রভাবশালী হিন্দু জমিদার নাগদের পূর্বপুরুষগণ ছিল এই শাসন কেন্দ্রের সঙ্গে জড়িত। তারা খানজাহান আলী (র)র বশ্যতা স্বীকার করলে তিনি তাদের আর কিছুই বলেননি। আবার কেউ বলেন যে, যেহেতু নৌপথে এই অঞ্চলে আগমন করতে হত সেই হেতু বাগেরহাট শহর থেকে অদূরে বনগ্রাম জমিদারদের কেন্দ্র করেই এই 'খাদি অঞ্চল' স্থাপিত হয়েছিল। দেখা যায় যে, এদের পূর্ব পুরুষগণই এ বংশে কৌলিন্যবাদের ধারক ও বাহক ছিলেন। ইতিহাস অনুসন্ধানে দেখা যায়, সুন্দরবনের দক্ষিণ উপ-কূলে ছিল এই খাদি অঞ্চল। সেদিক দিয়ে দুটি মতই সম্ভাবনা-পূর্ণ সন্দেহ নেই। তবুও, প্রথম মতটি বেশী গ্রহণযোগ্য বলে বিবে-চিত হয়।

হযরত পীর খানজাহান আলী (রঃ) সুন্দর ঘোনা গ্রামে বৈজ্ঞা-নিক উপায়ে পাথরের উপর সাদা মোজাইক করে একটি সুন্দর মছজিদ নির্মাণ করেছিলেন। কেউ কেউ বলেন, এটি ছিল সাদা মার-বেল পাথরে তৈরি। অবশ্য অসম্ভব কিছুই নয়, তবুও দেখা যায়, তিনি ইটের উপরও এই ধরণের মোজাইক করেছিলেন। পাথরের

www.pathagar.com

মোজাইকটি ছিল মসৃণ ও দুগ্ধ ধবল এবং ইঁটের মোজাইকটি ছিল সামঞ্জস্যপূর্ণ বিভিন্ন রংয়ের একটি পুরু অটুট উজ্জ্বল ও মসৃণ প্রলেপ। যার চকমকিতে চোখ ঠিকরে আসতো ও নিজের প্রতিবিম্ব দেখা যেত। স্থানীয় লোকেরা বলতো যে, ইঁটে এনামেল করা হয়েছে। এই মসজিদটি 'কড়ের মছজিদ' নামে খ্যাত ছিল। এই মছজিদটির সম্মুখে একটি দীঘি ছিল। এই দীঘিটি আজও বিদ্যমান রয়েছে কিন্তু অনেকটা ভরাট হয়ে গিয়েছে। তবে মছজিদটির চিহ্ন আর অবশিষ্ট নেই। কাড়াপাড়ার কুখ্যাত জমিদারই এই মছজিদটির ধ্বংসের কাজ শুরু করেন। এটি তার জমিদারির অন্তর্ভুক্ত ছিল বলে ভাংতে তার মোটেই বেগ পেতে হয়নি। এর মূল্যবান পাথরগুলি তারাই হস্তান্তর করে' ছিলেন এবং কলকাতার বাড়ীতে কিছু স্থানান্তরিত করেছিলেন।

এই প্রসঙ্গে খাদেম ফকির মোজাফফর হোসেনের বর্ণিত একটা সত্য ঘটনার বর্ণনা করা বিশেষ প্রয়োজন। তিনি বলেন যে, বেশী দিনের কথা নয়। এক সময় কাড়াপাড়ার এই জমিদার ও যশোরের নড়াইলের বিখ্যাত জমিদার মিলে গুপ্তধনরত্নের লোভে হযরত খানজাহান আলী (র') মাজারের এক অংশ ভেঙ্গে একটা পাথর সরিয়ে ফেলে তার কবরে লুক্কায়িত ধনরত্ন আছে কিনা পরীক্ষা করতে গিয়েছিলেন এবং একখানা পাথরও অপসারণ করেছিলেন। কিন্তু একটা পাথর সরানোর পর কোন এক অজ্ঞাত কারণে নিশা-বসানে তারা গৃহাভিমুখে যাত্রা করেন এবং সঙ্গে সঙ্গে রাজমিস্ত্রী পাঠিয়ে দেন, পাথরটিকে যথাস্থানে লাগানোর জন্য। তাদের এই কাজে বিরত হওয়ার কারণ কি, একথা তারাও কারো নিকট কোনদিন ব্যক্ত করেননি। ভাঙ্গার পরিবর্তে তারা মাজারে পাঠিয়েছেন

www.pathagar.com

ডালাভর্তি ভোগ ও পুজার ঠাকুর। এই ঘটনার বর্ণাকারী আজও জীবিত রয়েছেন। যে সব মুর্খ রাজমিস্ত্রীগণ এই স্খলিত পাথরটী মাজারের যথাস্থানে লাগাবার চেষ্টা করেছিল তারা এটী যথাযথভাবে লাগাতে পারেনি। পাথরটীর উপরের দিক নীচে ও নীচের দিক উপরে দিয়ে লাগিয়েছে। ফলে পাথরটি মেশেনি এবং পাথরটিতে যে আরবী লেখা ছিল সেগুলি উল্টা হয়ে গিয়েছে। আজও পাথরটি মাজারের গায়ে সেই অবস্থায় রয়েছে। উল্টা আরবী শব্দগুলি পাথরটিকে চিহ্নিত করে রেখে জমিদারদের এই নিকৃষ্ট ও ঘৃণ্য কাহিনীর জলন্ত সাক্ষী হয়ে রয়েছে। এই ঘটনার পর থেকে হিন্দুগণ খুব জোরে সোরে মাজারের খাম্বায় তেল সিন্দুর লাগিয়ে ঠাকুরের পুজা করতে শুরু করে। লোকের মুখে মুখে শোনা যায় তাদের এই কর্মই ছিল নাকি তাদের পুত্র ত্রয়ের মৃত্যু ও তাদের ধ্বংসের কারণ।

কড়ের মসজিদ থেকে অনতিদুরে শাহাদাত খাঁর দীঘি ও বখতিয়ার খাঁর দীঘি নামে দু'টি দীঘি রয়েছে। আজও এই দীঘি দু'টি বর্তমান থেকে তার মুরিদদের অমর কীর্তির বিজয় ঘোষণা করছে। তবে শাহদাত খাঁর দীঘিটি বেশ ভরাট হয়ে গিয়েছে। বখতিয়ার খাঁর দীঘিটি অনেক বড় এবং অনেকটা ঠিকই রয়েছে। এই দীঘিটি প্রায় ৪০ বিঘা জমি নিয়ে খনন করা হয়েছিল। বহু কাল অযত্নের ফলে এই দীঘিটি পুরু—ধাপ দামে ভর্তি হয়ে গিয়েছিল। এই পুরু দামের উপর দিয়ে গরু ছাগলে ঘাস খেয়ে বেড়াতো ও বিরাট বিরাট শাপের আবাসস্থল ছিল। কিন্তু বর্তমানে দীঘিটি পরিস্কার করে এখানে মাছের চাষ করা হয়েছে। দীঘিটী আবার মানুষের প্রয়োজনে ব্যবহৃত হচ্ছে।

www.pathagar.com

রণবিজয়পুর গ্রামে ফকির বাড়ীর সম্মুখে এক গুম্বজ বিশিষ্ট একটি বড় মসজিদ রয়েছে। তবে এই মসজিদটীর পাশাপাশি কোন দীঘি দেখা যায় না। অবশ্য কিছু দুরে একটা দীঘি রয়েছে। কিছুদিন পুর্ব্বেও এই মসজিদটী ভগ্নপ্রায় ছিল। কিন্তু বর্তমানে সরকারের প্রচেষ্টায় মেরামত করা হয়েছে এবং মসজিদটী প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের সংরক্ষিত তালিকার অন্তর্ভুক্ত।

হযরত খানজাহান আলী (রঃ)র মাজারে প্রবেশের পথে যেখানে রিকসাগুলি যাত্রীর প্রতিক্ষায় দাঁড়িয়ে থাকে তারই পাশে অল্প কিছুদিন পূর্বে একটী মাটীর স্তূপ খোড়ার পর কয়েকটী কবর বেরিয়ে পড়েছে। কবরগুলি সবই সারিবদ্ধভাবে সাজানো এবং সেই আমলের ইট দিয়ে বাঁধানো পাকা কবর। একই জায়গায় সারিবদ্ধভাবে এই কবরগুলি দেখলে মনে হয়, এরা সবাই যেন স্নেহশীল কোন এক পিতার সন্তান। একই সময়ে মৃত্যুবরণ করেছেন এবং এই দুঃখের স্মৃতিকে অন্তরে জাগরুক করে রাখার জন্য সবাইকে সারিবদ্ধভাবে কবর দিয়ে তিনি বাঁধিয়ে রেখেছেন। এই সঙ্গে মনে পড়ে যায়, পীর সাহেবের রণবিজয়পুরে হটাৎ আক্রান্ত হয়ে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ার কথা। এই যুদ্ধে যারা মৃত্যুবরণ করেছিলেন সেই সব শহীদদের মাজারই হয়তো এইগুলি। এই কথা মনে করে এই কবরগুলিকে শহীদানের মাজার বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। তারা যে পীর সাহেবের অনুগামীদের মধ্যে কোন কোন বিশেষ ব্যক্তি ছিলেন তা খুঁজে বের করার কোন উপায় আর নেই। এই শহিদানের মাজারের নিকটে বর্তমানে একটি হাফেজী মাদ্রাসা খোলা হয়েছে এবং এখানে কোরআন তেলোয়াত অব্যাহত রয়েছে।

এরই পার্শ্ববর্তী একটি খালের ওপারে জঙ্গলে ঢাকা একটি

www.pathagar.com

মাটির ডিবি দেখা যেত। কিছু দিন পূর্ব্বে ঐ মাটি খুঁড়তে গিয়ে সেখানেও একটি পাকা কবর পাওয়া গিয়েছে। কবরটী বহু পুরাতন সন্দেহ নেই। তবে এটী যে কার মাজার জানা যায় না। কিন্তু কিছু দিন পূর্ব্বে কোন এক ব্যক্তি মাজার ব্যবসার প্রসারতার জন্য এটিকে রহস্যজনকভাবে 'আগুন পীরের মাজার' নামে আখ্যায়িত করেছিলেন। কিন্তু এই নাম সম্পূর্ণ হাস্যকর ও ভিত্তিহীন বলে ব্যবসাটী বন্ধ হয়ে গিয়েছে।

কিছুদুর অগ্রসর হয়ে ডানদিকে একটী রাস্তা চলে গিয়েছে। তার পাশে আরও একটী মাজার পরিলক্ষিত হয়। এটি শত শত বৎসর ধরে সকলের নিকট ঠাণ্ডা পীরের মাজার বলে খ্যাত। এই মাজারটী প্রায় ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু কিছুদিন পূর্ব্বে স্থানীয় জনসাধারণের প্রচেষ্টায় মাজারটী মেরামত করা হয়েছে। কিন্তু মাজারের উপরে নির্মিত মছজিদটী সম্পূর্ণরূপে ধ্বংশপ্রাপ্ত হয়েছে। এটী মেরামত করা মোটেই সম্ভব নয়। এর অদূরে একটি দীঘিও ছিল। কিন্তু ব্যক্তিগত মালিকানায় সেটিও বিলীনের পথে।

এই মাজার থেকে আরও কিছুদুর অগ্রসর হয়ে রণবিজয়পুর কাজীবাড়ীর নিকটে আরও একটি মাজার দেখা যায়। এই মাজারটিও বহু বছর ধরে 'পাগল পীরের মাজার' বলে পরিচিত। এই মাজারটিও প্রায় সম্পূর্ণ ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছিল। কিন্তু জনসাধারণের প্রচেষ্টায় এটীকেও মেরামত করা হয়েছে। স্থানীয় জনসাধারণ এই মাজারের উপর একটি টীনের চালও নির্ম্মাণ করে দিয়েছেন। এই মাজারটির উপরেও একটী মছজিদ ছিল। এই মাজারের পাশে একটী ছোট দীঘিও বিদ্যমান। এখানে রাশি রাশি ইঁটের স্তুপ দেখে এখানে একটি মছজিদ ছিল বলে অনুমান করা হয়। ইসলামী ইতিহাসের

www.pathagar.com

লীলাভূমি এই বাগেরহাটে এমনি কত যেনি দর্শন রয়েছে এবং কত নিদর্শন যে ধ্বংস প্রাপ্ত হয়েছে তার ইয়ত্তা নেই।

বাগেরহাট শহর থেকে ২ মাইল দূরে কাঁঠাল গ্রামের সন্নিকটে আর একটী বৃহৎ দীঘি রয়েছে। এই দীঘিটি ইখতার খাঁর দীঘি নামে পরিচিত। এই দীঘি সম্পর্কে দুটি মতামত রয়েছে। কেউ বলেন, এটি খানজাহান আলী (রঃ)র খনিত দীঘি আবার কেউ বলেন, এটি নছরত শাহের খনিত দীঘি। খানজাহান আলী (রঃ) মৃত্যুর পর এই অঞ্চল পরিদর্শনে এসে জনগণের সুবিধার জন্য তিনি এই দীঘি খনন করেছিলেন। শোনা যায়, এই দীঘির পাড়েই ছিল খানজাহান আলী (রঃ)র বিখ্যাত মুছাফিরখানা। বর্তমানে এটি ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে কিন্তু মোসাফিরখানার চিহ্ন বিদ্যমান রয়েছে। অনেকে আবার বলেন এই সরাইখানাটি দশগুম্বজ মছজিদের নিকট অবস্থিত ছিল যদিও এই দীঘির পাড়ে যে কোন একটী কীর্তির ধ্বংসাবশেষ বিদ্যমান। তবুও সরাইখানাটি দশগুম্বজ মছজিদেরই সন্নিকটে ছিল এইটিই অধিক যুক্তিসঙ্গত বলে মনে হয়। এটি খুব বিখ্যাত সরাইখানা ছিল। মুছাফির থেকে শুরু করে দেশ বিদেশের বহু জ্ঞানীগুণী লোক এই সরাইখানায় এসে অবস্থান করতেন। শোনা যায়, হোসেন শাহ ও তদীয় পুত্র নছরত শাহও এসে এই সরাইখানায় অবস্থান করতেন। এর সন্নিকটে একটী দীঘিও রয়েছে। এখানে যে মছজিদটি রয়েছে এটী দশগগুম্বজ মছজিদ বলে পরিচিত। এর নিকটবর্তী কিছু কোঠাবাড়ীর ধ্বংশাবশেষ পরিলক্ষিত হয়। এইগুলিই সেই সরাইখানার চিহ্ন। অনেকে বলেন এই দশগুম্বজ মছজিদটি নছরত শাহের কীর্তি। অনেকে আবার এটীকে 'ছুমসি দালান'' বলে আখ্যায়িত করেন। তারা

www.pathagar.com

বলেন, এইটাই এর আসল নাম। হোসেন শাহ কয়েকবারই এখানে এসেছেন। তাই এই নাম সুলতান আলাউদ্দিন হুসেন শাহের স্মৃতি বহন করে রেখেছে। হুসেন শাহের মৃত্যুর পর তার ভ্রাতা নাছির উদ্দিন মাহমুদ শাহ ও পুত্র নছরত শাহ ছিলেন এই রাজ্যের সুলতান এবং খানজাহান আলী (রঃ) ছিলেন তাদের খলিফা। কিন্তু এই খলিফার আসন ছিল অনেক উচ্চে। তাদের নামের খোদাইকৃত টাকা এই অঞ্চলে আজও পাওয়া যায়।

এই দশগুম্বজ মছজিদ এক সময় ধ্বংসপ্রাপ্ত হবার উপক্রম হয়েছিল। কিন্তু সকলের নিকট একজন পাগল ও পরে কুতুব ও দরবেশ বলে পরিচিত একটি লোকের সারাজীবনের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় এই মছজিদটির মেরামত কাজ পূর্ণভাবে সম্পন্ন হয়েছে। বর্তমানে এখানে একটি হাফেজী মাদ্রাসা চালু রয়েছে। এবং জনগণের প্রচেষ্টায় এটি বর্তমানে আরও সুন্দর করে মেরামত করা হয়েছে। এই মছজিদে এখন পাঁচ ওয়াক্ত মাইকের সাহায্যে আজান দিয়ে নিয়মিত নামাজ পড়া হয়। এই মছজিদটি যিনি মেরামত করেন সেই অসাধারণ মানুষটীর নাম ছিল—হাজী আরিফ। সবাই তাকে আরিফ হাজী বলেই জানতো।

শুধু দশ গুম্বজ মছজিদই না হযরত পীর খানজাহান আলী (রঃ)র অনেক কীর্তিই তিনি জঙ্গল কেটে পরিষ্কার করে আবিষ্কার করেছেন ও লোক চক্ষুর সন্মুখে তুলে ধরেছেন এবং তিনি দশ-গুম্বজ মছজিদের নিকটেই তার মাজারের স্থান নির্বাচন করে নিজের মর্জি মাফিক মৃত্যুবরণ করে এখানেই শুয়ে আছেন। এই কারণেই তাঁর একটু পরিচয় দেওয়া আমি বিশেষ প্রয়োজন মনে করি।

www.pathagar.com

আরিফ হাজি সাহেব ছিলের একজন পাগল ও ফকির মানুষ। তিনি কোন ধনির ঘরে জন্মগ্রহণ করেননি এবং নিজেও কোন সম্পদশালী ছিলেন না। অতি সাধারণ ঘরেই তার জন্ম। রামপাল থানার অন্তর্গত বাশতলী গ্রাম ছিল তার মুল বাসস্থান। শোনা যায়, তিনি হজ্জ করে আসার পর একদিন এই মাজার জেয়ারত করতে আসেন। এবং আর গৃহে ফিরে যান না। তারপর থেকেই তিনি স্ত্রী, পুত্র পরিজন পরিত্যাগ করে এই মাজারকে কেন্দ্র করেই এই দেশের বিভিন্ন স্থানে ঘুরতে থাকেন এবং এক সময় তার স্বাভাবিক চলাফেরার পরিবর্ত্তন ঘটে ও সবার নিকট পাগল বলে পরিচিত হন। শোনা যায় তিনি একাধিকবার হজ্জ করেছেন। তার জীবদ্দশায় এমন কথাও শোনা গেছে যে কোন এক হাজী সাহেব একই সঙ্গে তার সাথে কাবা শরীফ তওয়াফ করেছেন এবং হজ্জ এর পরদিনও তার সঙ্গে এক সঙ্গে খানা খেয়েছেন অথচ দেখা গেছে যে হজ্জের দুদিন পুর্বেও তিনি বাগেরহাটেই ছিলেন। এমনি দু'চারটি কথা শোনার পর, জীবনের শেষের দিকে ওলি বলে লোকে তাকে বেশ একটু সন্দেহের চোখে দেখতে থাকে। তার সম্পর্কে অনেকে অনেক কথা বলতে শুরু করে কিন্তু তিনি কোন দিকেই ভ্রুক্ষেপ করেন না। এদেশের প্রতিটি বাড়ীই ছিল তার নিজের বাড়ী এবং সবাই ছিল তার আপনজন। পথ চলার সময় কলমা ছিল তার জপনা ও আল্লাহু আকবর ধ্বনি ছিল তার হুশিয়ারী সংকেত। তার এই শব্দ শুনেই লোকে বুঝতে পারতো যে ঐ হাজী সাহেব আসছেন। তার হাতে সব সময় একটা লম্বা দা, একটা পাখা ও একটা বাশের কান্দুল বা উফই থাকতো। দা দিয়ে তিনি জঙ্গল কেটে পরিস্কার করতেন, ক্লান্ত হয়ে পড়লে

www.pathagar.com

পাখা দিয়ে বাতাস দিতেন এবং বাদ্দুড়টি ছিল তার নিশ্বাস বাহক। এই ভাবে তিনি জঙ্গল কেটে পরিষ্কার করে খানজাহান আলী (রাঃ)র বহু কীর্তি জঙ্গলের কবল থেকে মুক্ত করেছেন। তিনি মানুষকে সব সময় ইসলামের পথে দাওয়াত দিতেন ও নামাজ পড়ার নির্দ্দেশ দিতেন।

এদেশের এমন কোন বাড়ী নেই যে বাড়ীতে তিনি আল্লাহু-আকবর ধ্বনি দিয়ে হাজির হননি এবং ইসলামকে দৃঢ়ভাবে আকড়ে ধরবার নির্দ্দেশ দেন নি। ইংরাজ রাজত্বের আমলেও তিনি সবাইকে এই সংবাদ দিতেন যে 'জানিস আমরা আবার বাদশাহি পেয়েছি ?' পাগলের প্রলাপ বলে লোকে তখন সে কথা উড়িয়ে দিয়েছে। কিন্তু তার মৃত্যুর কিছুদিন পরেই পাকিস্তান হাসিল হয়ে তার কথার সত্যতা প্রমানিত হয়েছে। তার জীবনে তিনি অনেক স্কুল মাদ্রাসা ও মছজিদ নির্মাণ করেছেন। মাঝে মাঝে দেখা যেত তিনি বড় বড় নৌকা ভর্ত্তি করে হাজার হাজার টালি নিয়ে এসে হাজির হয়েছেন। এই টালি দিয়ে তিনি কি করবেন, জিজ্ঞাসা করলে বলতেন, খুব বড় একটা মাদ্রাসা তৈরী করতে হবে। তার এই সব কাজে সহায়তা করার জন্য কোন লোক ছিল বলে কারোর জানা ছিল না। কিন্তু তিনি এগুলি যে কোথা থেকে জোগাড় করতেন এটি ছিল একটি বিস্ময়ের ব্যাপার। হাজী আরিফের প্রচেষ্টায় এদেশে যে সকল স্কুল মাদ্রাসা হয়েছে তার মধ্যে অনেকগুলি আজও টিকে আছে। বাগেরহাটের সরুই নামক স্থানে হাজী আরিফের নামে একটি মাদ্রাসা বর্ত্তমানে সরকার কর্ত্তৃক একটি প্রাইমারী স্কুলে পরিণত হয়েছে। এমনি করে সারা জীবন অক্লান্ত পরিশ্রম করে এদেশের সকল মানুষকে ইসলামের

www.pathagar.com

পথে দাওয়াত দিতে দিতে সবার সঙ্গে হেটে হেটে কথা বলতে বলতে হঠাৎ একদিন চিরতরে ঘুমিয়ে পড়লেন, বাগেরহাটের বুকে হাসান শহিদ সরওয়ার্দীর এক বিরাট জনসভার মাঝে। ঐ দিন মঞ্চে উঠে তিনি সরওয়ার্দী সাহেবকে দোয়া করলেন ও ঠিকমত চলার নির্দেশ দিলেন। মুসলমানদের বাদশাহি পাওয়ার সংবাদটাও তাকে দিলেন। মঞ্চ থেকে নেমে এসে যার সঙ্গে দেখা হোল তাকেই বললেন, তোমরা সবাই ইসলামের পথে ঠিকমত থেকো, আজ আমি একটু বাড়ী যাবো। তার এই কথা সবাই চিরদিন যেমন শোনে তেমনিই শুনে রাখলো। একটু পরেই তিনি জনসভার ময়দানের এক কোনে গিয়ে একটি সাদা চাদর মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়লেন। সবাই মনে করলো তিনি একটু বিশ্রাম নিচ্ছেন। কিন্তু কিছু সময়ের মধ্যেই সংগের বোচকাবহনকারী ছেলেটি কেঁদে উঠে বলল যে, হাজী সাহেব মারা গিয়েছেন (ইন্না লিল্লাহে…)। এমনি করে হাজী সাহেব সবার চোখের সম্মুখে তার স্থায়ী বাড়ীতে চলে গেলেন। দশগুম্বজ মছজিদের নিকটেই তাকে দাফন করা হয়। তার মৃত্যুর পর পীর সাহেবের মাজারে আরও বহু পাগল দেখা গিয়েছে, কিন্তু তারা সবাই নেওয়ার পাগল, আর তিনি ছিলেন সবাইকে দেওয়ার পাগল। মানুষকে আল্লার পথে দাওয়াত দিতে দিতে দুনিয়া থেকে তিনি বিদায় গ্রহণ করলেন। ফুরফুরার দাদা হুজুর বলেন, তিনি ঐ জামানার একজন কুতুব ছিলেন।

হযরত খানজাহান আলী (রঃ)র বিভিন্ন কীর্তি সংস্কারের জন্য যে যতবড় অবদানই আজ রাখুক না কেন হাজী আরিফের দানই সর্বপ্রথম। এদিক দিয়ে তিনি আমাদের কাছে চির

www.pathagar.com

স্মরণীয়। তিনি ছিলেন এমনই একজন পাগল যিনি নিজেই ছিলেন একজন ওলি ও কুতুব। কাজেই হযরত খানজাহান আলী (রঃ) যে যতবড় ওলি ছিলেন। তা তিনি বুঝতে পেরেছিলেন। আর তার কীর্তিরাজিও যে মুসলিম জাতির জীবনে কতখানি গুরুত্ব-পূর্ণ তা তিনি অনুধাবন করেছেন এবং মুসলিম সভ্যতা যে কত বড় তা মানুষের সম্মুখে তুলে ধরার জন্য আপ্রান চেষ্টা করেছেন। সেদিনের তার সেই প্রচেষ্টার ফলশ্রুতি হিসাবে আজ খানজাহান আলী ইসলামিক রিসার্চ একাডেমী স্থাপিত হয়েছে।

হযরত খানজাহান আলী (রঃ)র আরও একটি সুবৃহত দীঘি রয়েছে। এই দীঘিটি কাড়াপাড়া যাবার রাস্তার পার্শ্বে বাদেকাড়াপাড়া গ্রামের নিকট ইবস্থিত। এই দীঘিটি 'পচা দীঘি' নামে খ্যাত। এইরূপ জনশ্রুতি আছে যে এই দীঘিটি হযরত খানজাহান আলী (রঃ)র ভাগ্নে খনন করেছিলেন। তার এই ভাগ্নের নাম কি ছিল জানা যায় না, তবে প্রবাদ এইরূপ যে তার মামার উপর টেক্কা দেওয়ার জন্য তিনি এই দীঘি খনন করেছিলেন। এই দীঘির পাড়ে এমন একটি সুউচ্চ মছজিদ তিনি নির্মাণ করেছিলেন যে, যার উপরে উঠলে মক্কা—মদিনা দেখা যেত। একদিন ভাগ্নে মামাকে দাওয়াত দিয়ে নিয়ে এলেন তার এই কীর্তি দেখাবার জন্য। মামা একদিন এলেন এবং ভাগ্নের অনুরোধে যখন তিনি মছজিদটির উপরে উঠলেন তখন ভাগ্নের গরিমা চুর্ণবিচুর্ণ হয়ে গেল। মছজিদটি সঙ্গে সঙ্গে এতটা মাটির নীচে বসে গিয়েছিল যে তার উপর থেকে আর কিছুই দেখা যেত না এবং সঙ্গে সঙ্গে দীঘির পানিরও বর্ন পরিবর্তন হয়ে গিয়েছিল। ভাগ্নে লজ্জিত হয়ে তখন মামার নিকট অন্যায় স্বীকার করেছিলেন। অনেকে বলেন 'দেড়

www.pathagar.com

বুড়ির খারানি তার চটিগার খরাত' প্রবাদটি এখানেই প্রযোজ্য হয়েছিলো।

এই দীঘির পাড়ে একটি মছজিদের ধ্বংশাবশেষ আজও বিদ্য-মান রয়েছে। এটি সেই ভাগ্নের মছজিদেরই ধ্বংশাবশেষ বলে লোকে মনে করে থাকেন। এই দীঘির পানি পচা না হলেও এর রং কিছুটা বিবর্ণ এবং এই দীঘির পানি লোকে পান করে না। এই দীঘিটির দৈর্ঘ, এর প্রস্ত থেকে অনেক বেশী। এই দীঘির চারিদিকে দেখলে মনে হয় কোন এক সময় এর খনন কাজ বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। যার ফলে এর উত্তর ও দক্ষিণ পাড়ে তেমন উল্লেখ-যোগ্য মাটি নেই। এই দীঘিটি একটা বৃহত নদীর বাকের মত। তাই অনেকে এটিকে একটি নদীর বাকও মনে করে থাকেন, কিন্তু মুলতঃ এটা অসমাপ্ত একটি খনিত দী ঘি।

হযরত পীর খানজাহান আলী (রঃ'র মাজার থেকে কিছুদূর পশ্চিমে গেলেই আর একটা বৃহত মাজার চোখে পড়বে। এই মাজারটা জিন্দাপীরের মাজার বলে পরিচিত। তার আসল নাম জানা যায় সৈয়দ শাহ মাহম্মদ। তিনিও একজন জবরদস্ত আউ-লিয়া ছিলেন। তার মাজারটি এক সময় ধ্বসে পড়ে ভগ্ন ইট ও ও মাটীর স্তুপে চাপা পড়েছিল কিন্তু আবদুল করিম নামক জনৈক বিদেশী একজন লোকের প্রচেষ্টায় ও স্থানীয় লোকের সহোযো-গীতায় এক সময় সামান্য কিছু সংস্কার সাধিত হয়েছে এবং বর্তমানে সেই অবস্থায়ই পড়ে রয়েছে।

জিন্দাপীর (রঃ)র মাজারের কিছু পশ্চিম দিকে ভগ্নপ্রায় আর একটা সুবৃহত মছজিদ বর্তমান। মছজিদটা রেজা খাঁর মছজিদ নামে পরিচিত। কোন এক সময় এই মছজিদটার ছাদ ধ্বশে গিয়ে

www.pathagar.com

মছজিদটী ব্যবহারের অযোগ্য হয়ে পড়েছিল কিন্তু কিছুদিন পূর্ব্বে স্থানীয় খোন্দকার বংশের গোলজার আহম্মদ নামক জনৈক ব্যক্তির প্রচেষ্টায় এর সামান্য কিছু সংস্কার সাধিত হয়েছে। এই মছজিদটী আজও পূর্ণ ব্যবহারযোগ্য হয়নি। অনুমান করা হয় যে এই মছজিদটী ছয় গুম্বজ বিশিষ্ট ছিল। অনেকে বলেন এই মছজিদটী জিন্দাপীর সাহেবই তৈরী করেছিলেন এবং এখানে তিনি জুম্মার নামাজ পড়তেন। কিন্তু অধিকাংশের মত, এটী খানজাহান আলী (রঃ)র অনুগামী রেজাই খাঁর কীর্ত্তি এবং এই মছজিদটীর নাম আজও তার নামেরই স্মৃতিবহন করছে। এখানে অপেক্ষাকৃত কয়েকটী ছোট ছোট দীঘি রয়েছে। তার মধ্যে দুইটি দীঘি. ছোট কোমরা ও বড় কোমরার দীঘি নামে পরিচিত। এই দীঘি দুইটী আজও কোমর খার নামের স্মৃতি বহন করে, রেখেছে। এর পাড়েই জিন্দাপীর সাহেবের বাড়ী ছিল। তার বংশ ধরেরা আজও সেখানে বাস করেন। তাঁর কাছারি বাড়ীটীর ধংশাবশেষ আজও বিদ্যমান রয়েছে।

হযরত খানজাহান আলী (রঃ)র মাজারের পশ্চিম দিকে ও জিন্দাপীর সাহেবের বাড়ীর পূর্ব্ব দিকে একটী স্থান 'ছিলিয়া খানা' নামে পরিচিত। জনশ্রুতি এইরূপ যে এখানে পীর খানজাহান আলী (রঃ)র অস্ত্রাগার অবস্থিত ছিল। ছিলিয়াখানার অর্থ অস্ত্রাগার। এখানে পুরাতন একটী বড় অট্টালিকার ধ্বংশাবশেষ বিদ্যমান রয়েছে। এখানে একটি মছজিদ ও ছিল বলে জানা যায়। কিছুদিন পুর্ব্বে এখানের একটী ইট ও মাটীর স্তুপের মধ্য থেকে একটী বৃহত মাজার আবিস্কৃত হয়েছে। মাজারটী ইট দিয়ে সুন্দরভাবে বাধানো ছিল। এই মাজারটি বর্তমানে কিছু মেরামতও করা হয়েছে। মাজারটি

www.pathagar.com

একটু অসাধারণ লম্বা। ঘন্দকার গোলজার আহম্মেদ সাহেবই এই মাজার উদ্ধারের কৃতিত্বের দাবীদার।

এই এলাকায় যেখানেই একটু লক্ষনীয় ইট ও মাটির স্তুপ দেখা যায় সেখানে খুড়লেই কিছু না কিছু পুরানো কীর্ত্তির ধংশাবশেষ বেরিয়ে পড়ে। তাছাড়া এই অঞ্চলের বিভিন্ন স্থানে পুকুর খুড়তে গিয়েও অনেকে বৌদ্ধ আমলের অনেক পাথরের থালা ঘটি বাটি পেয়েছেন। বেশ কিছুদিন পূর্বে সুন্দরঘোনা গ্রামে পুরাতন ভৈরব নদীর কুলে একটি বাড়ীর ধংশাবশেষ আবিস্কৃত হয়েছিল। অনেকে অনুমান করেছিলেন এটি বৌদ্ধ আমলের একটি বাড়ী হ'তে পারে। কিন্তু পরে এই বাড়ীটির ইটগুলি নুতন মাজার কাজে ব্যবহার করা হয়েছে। এইভাবে ইতিহাসের বহু চিহ্ন এই অঞ্চল থেকে মুছে ফেলা হয়েছে।

অনতিদুরে বল্লভপুর গ্রামেও একটি মছজিদ ও একটি দীঘি রয়েছে। এই দীঘি ও মছজিদটি খাঞ্জালী দীঘি ও খাঞ্জালী মছজিদ নামে পরিচিত। মছজিদটি বর্তমানে ধংশের কবলে পতিত হয়েছে। বাগেরহাটের নিকটবর্ত্তি সোনাতলা গ্রামে 'শাহবাজ খাঁর' দীঘি নামে একটী দীঘি রয়েছে। শোনা যায় শাহবাজ খাঁ ছিলেন হযরত খানজাহান আলী (রঃ)র একজন সুদক্ষ সেনাপতি। এই সকল কীর্ত্তি বহু কাল আগের একটী নামের স্মৃতি আজও বহন করে রেখেছে। কিছুদিন পূর্ব্বে লাল চন্দ্রপুর গ্রামে একটি মছজিদ আবিস্কৃত হয়েছে। এটীও হযরত খানজাহান আলী (রঃ র কীর্ত্তি তাতে কোন সন্দেহ নেই। বদোখালি, আফরা, উৎকুল, কালে খাঁর বেড় প্রভৃতি জায়গায়ও তার বহু কীর্ত্তির নিদর্শন আজও বিদ্যমান রয়েছে।

www.pathagar.com

হযরত খানজাহান আলী (রঃ) অধিকাংশ অট্টালিকাই গুম্বজ বিশিষ্ট। তার নির্মাণ কৌশলের এটি একটি নিজস্ব বৈশিষ্ট্য যা অন্য কীর্তি থেকে তার কীর্তিকে আলাদা করে রেখেছে। তার সমস্ত অট্টালিকাই স্বাভাবিকভাবে মছজিদ বলে মনে হয় কিন্তু যে গুলিতে পশ্চিম দিকে মেম্বর ও মেহরাব নেই সেগুলি মছজিদ নয়, অট্টালিকা। যশোর ও খুলনাতে এই ধরনের যত কীর্তি যেখানেই বিদ্যমান, তা সবই এই একই যুগের সাক্ষী বহন করছে। শুধু তিনি নয়, তার সঙ্গীরাও যে সমস্ত কীর্তি রেখে গিয়েছেন সে সকল কীর্তিও এই একই ধরণের। এদের কীর্তির সঙ্গে অন্য কারো কীর্তির যে কোন মিল নেই তা অতি সহজেই অনুধাবন করা যায়।

এ ছাড়াও তিনি এই রাজ্যের ব্যবসা বাণিজ্যের উন্নতি বিধানের জন্য একটি নদী বন্দর নির্মাণ করেছিলেন। মরগা গ্রামে জাহাজঘাটা নামক স্থান আজও তার স্মৃতি বহন ক'রছে। শোনা যায় জাহাজ বাধার জন্য এখানে বহু পাথর বসানো ছিল ও একটি পাথরের ঘাট ছিল। রাজমহল, গৌড়, চট্টগ্রাম, সিলেট প্রভৃতি স্থান থেকে জাহাজ ভর্তি বহু মাল সামগ্রী এসে এখানে ওঠানামা করতো। তিনি যে সকল রাস্তা নির্মাণ করেছিলেন তা এই যুগের রাস্তার নির্মাণ কৌশল থেকে নিঃসন্দেহে অনেক উন্নত মানের ছিল। এই কারণেই শত শত বৎসরের ব্যবধানেও আজও তা বিনষ্ট হয়ে যায়নি। দীঘি খনন, রাস্তা ও ইমারত নির্মাণে তিনি যে কৌশল ও দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন তা অতি বিরল। তার নির্মিত রাস্তার মধ্যে সর্ব বৃহত রাস্তা ছিল বাগেরহাট থেকে সামন্তসেনা হয়ে বারোবাজার পর্যন্ত রাস্তাটি। এই রাস্তাটি আজ লুপ্ত হয়ে গেলেও মাঝে মাঝে এর চিহ্ন আজও বিদ্যমান রয়েছে।

www.pathagar.com

হযরত খানজাহান আলী (রাঃ)র কীর্তিরাজী দেখতে দেখতে এমন কোন ব্যক্তি নেই যে একবার অতীতের বুকে ফিরে না যায়। মাজারের পার্শ্বে দীঘির পাড়ে দাড়িয়ে থাকলে প্রাণ শীতল হয়ে আসে, মন উদাস হয়ে যায়, ভাবনাহীন মানুষও ভাবুক হয়ে ওঠে এবং আবেগে অবিভূত হয়ে পড়ে। মনের কোনে প্রশ্ন জাগে যার কীর্তি এমন সুন্দর কেমন ছিলেন সেই কীর্তির। মূলত শ্রেষ্ঠ ইসলামের খলিফাদের মত তিনি মছজিদে ছিলেন ইমাম, যুদ্ধক্ষেত্রে সেনাপতি, বিচার মঞ্চে বিচারক, রাজ্য পরিচালনায় দরদী শাসক, শিল্পে সুদক্ষ শিল্পী, জ্ঞানে বৈজ্ঞানিক, বিপদের বন্ধু ও ধর্মে পরম ধার্মিক ও ওলিয়ে কামেল আর ছিলেন পরধর্ম সহিষ্ণু মহাপুরুষ।

তাই কবি ব্যাকুল চিত্তে লিখেছে—

হে হযরত—
শৈশব কৈশোর পার হয়ে গেছে সে কবে, —।
যৌবনে পড়েছি আমি, সেও কবে, তাও বুঝি পার হ'য়ে যায়।
তোমার কীর্ত্তির পাশে বসে তখনও ভেবেছি আমি,
আজও ভাবি, কে তুমি? আর কি তুমি নও?
যতবার ভাবি ততবার খুজি, —
খুজে খুজে ফিরে আসি, নিকশ আধারের বুকে ;
চক্ষুষ্মাণ অন্ধ হয়ে যাই।
হাতড়ে হাতড়ে খুজে ঝুলি ভরে নিয়ে আসি,
কিছু কিংবদন্তি, পাটকেল আর পাথরের রাশি,
এছাড়া কিছুই জোটেনা বরাতে।
তোমার কীর্ত্তির পানে তাকাই যখন,

www.pathagar.com

ভাবনার শিকলে মন বাধা প'ড়ে যায়।
কখনও ভাবি এদেশের বাদশা ছিলে তুমি,
সৈন্য সামন্ত ছিল, শান্তিতে নিদ্রিত ছিল তুমি।
আর ছিলে সকলের আপনার জন,
তব নির্দেশে, উৎসর্গিত হোতো তাই কোটি কোটি প্রাণ।
কখনও ভাবি অপূর্ব্ব শিল্পী ছিলে তুমি,
কারু কার্য্য খচিত কীর্ত্তিরাজি প্রমাণিত করে দেয় তাই।
কি উদার, কি বৃহত্ত দৃষ্টী ভঙ্গি তোমার, —।
নির্বিকার দাড়িয়ে থেকে, —
তোমার অমর কীর্ত্তি আজও সাক্ষ্য দেয় তার।

তুমি দরবেশ, সাধক শ্রেষ্ট, অলিকুল চুড়ামনি,
তোমার যা ছিল নিঃস্ব হয়ে করে গেছ দান।
শীতল করেছ তুমি দীঘির শীতল জলে
এ দেশের কোটি কোটি প্রাণ।
তোমার দীঘির পাশে আজও বয় বেহেস্তি হাওয়া
তোমার কবর পাশে বেহেস্তি ঘ্রান বুক ভরে যায় পাওয়া
তোমার মাজার পাশে যখনই নিরবে বসি
নিজেরে হারিয়ে ফেলি পলকে পলকে।
তোমারে খুজিতে গিয়ে নিজেরে হারিয়ে ফেলি
তাইতো ফিরে আসি, তোমারে হয়না খোজা।

www.pathagar.com

পীর আলী মোহাম্মদ তাহের ও তার মাজার

পীর আলী মোহাম্মদ তাহের যে কে ছিলেন সে সম্পর্কে ইতিপূর্ব্বে আমি বেশ কিছু আলোচনা করেছি। তিনি ছিলেন পীর খানজাহান আলী (রঃ)র মুরিদ, তার উজিরে আজম ও নিকটতম বন্ধু। তিনি প্রথমে হিন্দু ছিলেন। সে সময় তার নাম ছিল গোবিন্দ ঠাকুর। কিন্তু ইসলাম ধর্ম গ্রহন করার পর হযরত পীর খানজাহান আলী (রঃ)র তার নাম রাখেন মোহাম্মদ আবু তাহের। পরবর্তিকালে হিন্দু ব্রাহ্মণদের দেওয়া পীর আলী উপাধি তিনি স্বেচ্ছায় তার নামের পুর্বে ব্যবহার করতেন। হযরত পীর খানজাহান আলী (রঃ)র মাজারের পার্শ্বে তার মাজার অবস্থিত।

তাঁর হিন্দু জীবনে তিনি ছিলেন সে যুগের কুলিন শ্রেষ্ঠ এক জন বিখ্যাত ব্রাহ্মণ পণ্ডিত। তাঁর পাণ্ডিত্যের সুখ্যাতি চারিদিকে এরূপ ছড়িয়ে পড়েছিল যে দেশ বিদেশের বহু ব্রাহ্মণ পণ্ডিতও তার সঙ্গে ধর্ম শাস্ত্র আলোচনা করতে ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে পড়তেন। তার পাণ্ডিত্যের সুখ্যাতি যখন চরম শিখরে তখনই বেদ ও উপনিষদের এই বিখ্যাত পণ্ডিত কোন এক মুহূর্তে হযরত খানজাহান আলী (রঃ)র সাক্ষাত লাভ করেন। তার সাহচর্যে কিছুদিন থাকার পর তিনি হিন্দু ধর্মের অসারতা বুঝতে পারেন ও একদিন স্বেচ্ছায় ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন। তিনি নিজে মুর্তি পুজার অসারতা এবং ধর্ম গ্রন্থে শেষ ধর্ম প্রবর্তক হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা (দঃ) এর আগোমনের কথা সবাইকে বুঝিয়ে দিয়ে বহু হিন্দুকে ইস-

www.pathagar.com

লাম ধর্মে দীক্ষিত করেন। এই কারণেই সেই যুগের বর্ণ শ্রেষ্ঠ হিন্দুগণ তার উপর ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে এবং তার কুৎসা রটনা করতে প্রবৃত্ত হয়। তারা তার কুৎসা রটনা করার জন্য একখানি উপ-খ্যান রচনা করে তার কাহিনী এইরূপ যে, 'তিনি কোন মুছলমান রমনীর প্রেমে মজে তাকে পাবার জন্য নিজ ধর্ম পরিত্যাগ করে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন ও হিন্দু ধর্ম বিদ্বেষী কার্যকলাপ শুরু করেন। কিন্তু এই মুছলিম রমনী যে কে এবং তার সঙ্গে দাম্পত্য জীবন তিনি কেমনভাবে অতিবাহিত করেন, এই উপাখ্যানে তার কেনে উল্লেখ নেই।

হিন্দু ধর্মে থাকাকালে শুধু নয় ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেও তিনি মুছলমানদের শীর্ষ স্থানে আরোহণ করেছিলেন। তিনি এক জন খাটি ইমানদার মুছলমান ও আল্লার ওলি হয়েছিলেন। ইস-লামের প্রতিটি বিধান তিনি অক্ষরে অক্ষরে পালন কর-তেন। হযরত পীর খানজাহান আলী (র)র ফায়েজ হাসেল করতে ও তার ভাবাদর্শে রাজ্য পরিচালনা করতে তিনি সক্ষম হয়েছিলেন। সুশাসন ও ন্যায় পরায়নতার জন্য খলিফাতাবাদ রাজ্যের প্রতিটী লোকের কাছে তিনিও একজন চিরস্মরণীয় ব্যক্তিতে পরিণত হয়েছিলেন। শুধু তাই নয় তিনি হযরত খানজাহান আলী (রঃ)র এত প্রিয় পাত্র হয়ে উঠেছিলেন যে মৃত্যুর পর তার মাজারের পাশে স্থান লাভ করার সৌভাগ্য অর্জন করেছিলেন। এমনি প্রবাদ শোনা যায় যে পীর সাহেব আদর করে মাঝে মাঝে তাকে ঠাকুর বলে সম্বোধন করতেন। কেউ কেউ বলেন এই কারণেই এই দীঘির নাম ঠাকুর দীঘি হয়েছে।

পীর আলী মোহাম্মদ আবু তাহেরের মাজার হযরত খান-

www.pathagar.com

জাহান আলী (রঃ) মাজারের মত একই পদ্ধতিতে তৈরি। মাজারটি সম্পূর্ণ পাথরের। এখানে ইটের কোন ব্যবহার নেই। তবে তার মাজারের স্তরগুলির উপরে কোন আরবি লেখা নেই। সর্ব উপরে অর্ধ গোলাকৃতির যে পাথরটি রয়েছে শুধু তার উপর কিছু আরবি শিলা লীপি রয়েছে। এই মাজারে আরবি ভাষায় যে কথা লেখা রয়েছে তার উদ্ধৃতি ইতিপুর্বে দেওয়া হয়েছে। তার অর্থ 'এই রওজা মোবারক বেহেস্তের বাগান সাদৃশ্য। ইহা এক জন বন্ধুর সমাধি যার নাম মোহাম্মদ তাহের। ৮৬৩ হিজরিতে জিলহজ্ব মাসে তার মৃত্যু হয়।' অন্য দিকে এবং উপরে লেখা রয়েছে কলেমা তৈয়াব, কলেমা শাহাদাত, সুরা ইখলাছ, ছুরা তাকাছুর ও আল্লার বহু ছেকাতি নাম সমুহ ও আছমায়ুল হুসনা। এর প্রতিটি কলামই বিশেষ তাৎপর্যপুর্ণ।

কবর গাত্রের শীলা লিপিতে দেখা যায় হযরত খানজাহান আলী (রঃ) ও তার বন্ধু সমতুল্য মোহাম্মদ তাহের (রঃ) দুজনেই একই বৎসর জিলহজ্ব মাসেই মৃত্যু বরণ করেছেন। কিন্তু কত দিনের পার্থক্যে তারা মৃত্যুবরণ করেছেন সে সম্পর্কে কিছুই জানা যায় না। তবে এইরূপ একটি জনশ্রুতি আছে যে হযরত খান-জাহান আলী (রঃ) কে দাফন করার ১০ দিন পর, কেহ বলেন ১৩ দিন পর আছরের নামাজের শেষ রাকাতের শেষ সেজদায় জায়নামাজের উপরেই তিনিও মৃত্যু বরণ করেন। এই গল্পটি কোন কোন জায়গায় কারো কারো কাছে হযরত খানজাহান আলী (রঃ) সম্পর্কেও শোনা যায় কিন্তু মোহাম্মদ তাহের (রঃ) সম্পর্কেই এই প্রবন্ধটির প্রয়োগ বেশি। যাহোক মৃত্যুর এমন অদ্ভুদ যোগাযোগ খুব কমই দেখা যায়। এক বন্ধুর প্রতি অন্য

www.pathagar.com

বন্ধুর মহব্বত যে কত গভীর ছিল, এই মৃত্যুই তার জলন্ত প্রমাণ। উপরোক্ত জনশ্রুতির মধ্য দিয়ে এই কথা সহজেই অনুমান করা যায় যে হযরত খানজাহান আলাইহের রহমাত জীবিত থাকতেই এই দুটি মাজারই প্রস্তুত হয়েছিল। তারা শুধু দুনিয়ার বন্ধুই ছিলেন না, সাধনা বা এবাদতের জগতের বন্ধুও ছিলেন। তাদের দুজনের সাধনার পদ্ধতি ছিল একই। মাজার তৈরি করে মৃত্যুকে সম্মুখে রেখে তারা আল্লার আরাধনা করতেন। তাই মৃত্যুও তাদের সঙ্গে বন্ধুর মত ব্যবহার করেছে। তাদের মৃত্যুর পর এই মাজারের পাথরের উপরে শুধু তাদের মৃত্যু সন তারিখটি খোদাই করা হয়েছে। মোহাম্মদ তাহেরের (রঃ) মাজারে মৃত্যু তারিখটি খোদাই না থাকাতে একটু দ্বিধা দ্বন্দ্বের মধ্যে পতিত হতে হয়। বোঝা যায় না এটি কি বিচক্ষনতার অভাব না নির্দেশ মূলক।

মোহাম্মদ তাহেরের মাজার হযরত খানজাহান আলী (রঃ র মাজারের সংলগ্ন প্রথম দেওয়ালের মধ্যে হওয়া সম্পর্কে একটি সুন্দর গল্প প্রচলিত আছে। গল্পটি এইরূপ যে একদিন আছরের নামাজ বাদ পীর সাহেব দীঘির ঘাটে এসে বসেছেন। মোহাম্মদ তাহের সহ বহু অনুগত ভক্ত তাকে ঘিরে বসে আছেন। তিনি দীঘি ও আকাশের দিকে চেয়ে আছেন। সবই নিস্তব্ধ। নিরবতা ভঙ্গকরে হঠাত তিনি বললেন, 'আমি তো বৃদ্ধ হয়ে গিয়েছি। মৃত্যুর আর বেশী দিন বাকি আছে বলে আমার মনে হয় না। তোমাদের ছেড়ে আমাকে তো একদিন বিদায় নিতে হবে। সবাইকে উদ্দেশ্য করে প্রশ্ন করলেন, আমি যখন থাকবো না আমার কথাগুলিকে তোমাদের মনে থাকবে, না তোমরা বিব্রত

www.pathagar.com

হয়ে পড়বে ?" কারো কারো কাছে শোনা যায় তখন তিনি একটি গজল শুনছিলেন। এই কথা শুনে মোহাম্মদ তাহের আকুল ভাবে ক্রন্দন করে ওঠেন। তার ক্রন্দন শুনে পীর সাহেব জিজ্ঞাসা করেন তোমার কি হয়েছে? তিনি বলেন, আমার এই কথাই বার বার মনে হচ্ছে যে তখন আমি কার কাছে থাকবো এবং আমার কাছে কে থাকবে? পীর সাহেব এই কথা শুনে ব্যথিত হয়ে সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিলেন, কেন, শান্ত হয়, আল্লা তোমার কাছে এবং তুমি আল্লার কাছে থাকবে আর আমি তোমাদের কাছে থাকবো। তার কয়েকদিন পরেই নাকি তিনি তার মাজারের স্থান নিদৃষ্ট করে দেন ও এই ভাবেই তিনি তাকে তার কাছে রাখেন।

এমনি বিভিন্ন ঘটনা নিয়ে বহু গল্প এই মহামানব সম্পর্কে এদেশে আজও প্রচলিত আছে। এই মাজারের পাথরে কয়েকটি লম্বা লম্বা গর্ত রয়েছে। গল্প রয়েছে এগুলি ডাকাতের অস্ত্র ধার দেওয়ার দাগ। মাজারের পাশের দেওয়ালের উপর ৫টি ছোট ছোট মাজারের মত রয়েছে। লোকে বলে এগুলি পীর সাহেবের পোষা শালিকের কবর। বর্তমানে এই মাজারে জেয়ারত কারিগণ নজর নেওয়াজ ও দিয়ে থাকেন বলে এখানে একটি সিন্দুক বসানো হয়েছে। খাদেমদের কেউ কেউ দর্শকদের পরিচালনা করেন এবং তাদের বিস্মিত প্রশ্নের গোজামিল উত্তর দিয়ে তাদের বুঝাতে চেষ্টা করেন। বহু ভদ্র ও শিক্ষিত লোকও তাদের কথা শুনে অবাক হয়ে যান। মাজারের একজন প্রবীন খাদেম বলেন মোহাম্মদ তাহেরের মাজারের বাহিরের পাথরে যদিও কিছু লেখা নেই তবে মাজারের ভিতরের দিকে পাথরে অনেক আরবী লেখা রয়েছে।

www.pathagar.com

জমিদারগণ যখন এই মাজারের এক অংশ ভেঙেছিল তখন তিনি কোন এক সময় মাজারের মধ্যে নেমে তা দেখেছেন। সেগুলি কি লেখা তা তিনি বলতে পারেন না তবে তার মনে হয় এগুলি কোরানের আয়াতই হবে। (মোহাম্মদ তাহের সম্পর্কে লিখিত একটি উপাখ্যান প্রাপ্তির সম্ভাবনা রয়েছে। হস্তগত হলে বিস্তারিত বর্ণনা করা যাবে আশা করা যায়।)

সৈয়দ শাহ আহম্মদ ওরফে জিন্দা পীর

শুধুমাত্র আজকের দিনেই নয় হযরত খানজাহান আলী (রঃ)র মতই জিন্দা পীর (রঃ)র এর নামের সারা দেশে একটা বিশেষ পরিচিতি রয়েছে। আর শুধুমাত্র বাগেরহাট খুলনাতেই নয় সারা বাংলা-দেশেই একদিন তার কেরামতির সুখ্যাতি ছড়িয়ে পড়েছিল এবং জনমনে একজন জবরদস্ত আউলিয়া হিসাবে একটা স্থায়ী আসন অধিকার করেছিলেন। তাকে ঘিরে বহু কেরামতির গল্প একদিন লোকের মুখে মুখে সারা দেশে ছড়িয়ে পড়েছিল। কিন্তু বিশেষ কোন ব্যক্তি এই জিন্দা পীর নামে পরিচিত হয়েছিলেন। যার সম্পর্কে এমনি প্রবাদ রয়েছে যে তিনি জিন্দা কবরে গিয়ে আবার অন্য এক জায়গায় উদয় হয়ে মৃত্যু বরণ করেছেন। এ সম্পর্কে অনেকেই

www.pathagar.com

অনেক মতামত পেশ করে থাকেন। কেউ বলেন পীর মাত্রই জিন্দা। তাই পীরেরা সবাই জিন্দা পীর। কিন্তু তাহলে এই ব্যক্তিই শুধু জিন্দা পীর নামে কেন খ্যাত হলেন। নিশ্চয়ই এর একটা বিশেষ তাৎপর্য রয়েছে। এইরূপ নাম কোন পীরই নিজে নিজে ব্যবহার করেন না। তার কার্য্যকলাপের মধ্য দিয়েই লোকে তাকে এই-রূপ নামে আখ্যায়িত করে থাকে। নির্ভরযোগ্য সূত্রে এই কথাই জানা যায় যে, বাগেরহাটের এই জিন্দা পীর সাহেব এক কালের অলৌকিক শক্তি সম্পন্ন এমনই এক ব্যক্তি ছিলেন যিনি আবাল বৃদ্ধ বনিতা সকলের নিকট জিন্দা পীর নামে পরিচিত হয়ে এক-দিন তার আসল নামটি হারিয়ে ফেলেছিলেন।

এই দুইজন প্রখ্যাত আউলিয়ার মাজার খুব কাছাকাছি এবং জিন্দা পীর (র.)র মাজারও কিছু কিছু ঐতিহ্যপূর্ণ কীর্তি সম্বলিত। তার বাস গৃহ এবং বৈঠকখানাটিও তার মাজারের সন্নিকটে বহু পুরাতন ইটে প্রস্তুত। ইটগুলি হযরত খানজাহান আলী (রঃ)র একই যুগের ঐতিহ্য বহন করে। পীর খানজাহান আলী (রঃ)র মাজারের পশ্চিম দিকে দিঘির পাড়ের উপর দিয়ে যে রাস্তাটি সোজা চলে গিয়েছে এই রাস্তাটি ধরে দিঘির সীমানা ছেড়ে সামান্য কিছুদূর গেলেই একটি মাজার ও ভগ্নপ্রায় একটি মছজিদ চোখে পড়বে। এই মাজারটিই জিন্দা পীরের মাজার বলে পরিচিত। এই জিন্দাপীরের দরগায় বহু লোক আজও মানত ও সিন্নি সালাত দিয়ে থাকেন। তিনি যে নিঃসন্দেহে একজন আউলিয়া শ্রেণীর লোক ছিলেন, যে কোন লোক এখানে এলে এর পরিবেশ ও প্রকৃতিতে তা সহজেই অনুধাবন করতে পারবেন। এমনি একটি কথা আজও প্রচলিত রয়েছে যে তিনি আজও জিন্দা। এই

www.pathagar.com

মাজারে অতি সহজেই লোকে তাঁর কায়েজ হাসেল করতে পারে। জিন্দাপীর (রঃ) এর মাজারটিও হযরত খানজাহান আলী (রঃ)র মাজারের মত এক গুম্বজ বিশিষ্ট একটি অট্টালিকার মধ্যেই অবস্থিত ছিল। কিন্তু কালের নিষ্ঠুর আঘাতে মাজারের উপরে গুম্বজটি একদিন ভেঙ্গে পড়ে ও ইট এবং মাটির স্তূপে মাজারটি ঢাকা পড়ে যায়। পাশের দেওয়ালগুলি সেদিনও যেমন দাঁড়িয়েছিল আজও তেমনি দাঁড়িয়ে আছে। এই মাজারের সম্মুখে আরও একটি মাটির স্তূপ বিদ্যমান ছিল ও চারিদিকের দেওয়ালগুলি ভেঙ্গে গিয়েছিল কিন্তু কিছুদিন পূর্বে আবদুল করিম নামক বহিরাগত একজন ফকির ধরনের লোক এখানে এসে হাজির হয়। তার এবং খোন্দকার বংশের গোলজার আহম্মদ নামক এক ব্যক্তির প্রচেষ্টায় ও জনসাধারণের সহ যোগিতায় মাটি ও ইট অপসারণ করে মেরামতের কাজ শুরু করা হয়। কিন্তু কাজ শেষ না হতেই কোন এক সময়ে তাদের প্রচেষ্টার পরিসমাপ্তি ঘটে।

এত দিন পর্য্যন্ত তার নাম কেউ কোন দিন খোঁজ করে দেখেনি কিন্তু মাজার মেরামতের কাজ আরম্ভ হলে প্রচুর খোঁজাখুজির ফলে যতদূর জানা যায়, তার প্রকৃত নাম ছিল সৈয়দ শাহ আহম্মদ মতান্তরে সৈয়দ আহম্মদ শাহ। বহু দিন পর্য্যন্ত জীন্দাপীর (রঃ) এর এই নামটি মানুষের কাছে অজ্ঞাত ছিল। খোন্দকার বংশের কোন এক প্রবীন ব্যাক্তি তাদের সেজরা নামা থেকে তার এই মূল নামটি উদ্ধার করেছেন এবং মাজার মেরামত করার সময় এই নামটি মাজারের গায়ে লিখে দেওয়া হয়।

হযরত সৈয়দ শাহ আহম্মদের পিতা মাতার কি নাম ছিল জানা যায় না। তিনি কোন দেশ হ'তে এ দেশে আগমণ করেছিলেন

www.pathagar.com

তারও কোন নিশ্চিত ইতিহাস জানা যায় না। অনেকে বলেন তিনি ইরান দেশীয় লোক। তার সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে অনেকে বলেন, যে তিনি হযরত খানজাহান আলী (রা)র বংশের লোক না হলেও তার বিশিষ্ট আত্মীয় হবেন এবং একই সময়ে আগমণ করেছিলেন ও তার উপাধিও ছিল খান। তাদের মতে তার পূর্ণ নাম হবে শাহ সৈয়দ আহম্মদ খ'ান। কিন্তু মাজারে যে নামটি লেখা রয়েছে সেখানে খান শব্দটী নেই। বাগেরহাট উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রবীন প্রধান শিক্ষক জনাব মোজহারুল ইসলাম তার 'A short history of Bagerhat' গ্রন্থে লিখেছেন যে,

Apart from Khanjahan Ali his companions were also great builders and many mosques and tanks were ascribed to them. Daria Khan,Fate Khan, Pir Khan, Chand Khan, Ektiar Chan, Baktiar Khan, Dider Khan, Md. Taher Khan and Ahmed Khan (Zinda Pir) were his chief companions.

The last named Ahmed Khan aleas Shah Syed Ahmed Khan is popularly known as "Zinda Pir". His majar and mosque now stand about one furlong away to the north west corner of Khanjahan Ali tomb.

অর্থ :— হযরত খানজাহান আলী { রঃ }র শুধু নয় তার সঙ্গিগণও বহু বড় বড় দিঘী ও মছজিদের এক এক জন বিখ্যাত নির্মাতা ছিলেন। দরিয়া খান, ফতে খান, পীর খান, চাঁদ খান, ইখতিয়ার খান, বখতিয়ার খান, দিদার খান, মোহাম্মদ তাহের খান ও আহম্মদ খান (জিন্দাপীর) ছিলেন তার প্রধান সঙ্গি।

www.pathagar.com

শেষের নামটি আহম্মদ খান ওরফে শাহ সৈয়দ আহম্মদ খান সবার কাছে জিন্দাপীর নামে পরিচিত। তার মাজার ও মছজিদ খানজাহান আলী (রঃ)র মাজারের উত্তর পশ্চিম কোনে মাত্র রশি দুই দূরে অবস্থিত।"

জনাব মোজহারুল ইসলাম সাহেব জিন্দা পীর (রঃ) কে খান জাহান আলী (রঃ)র প্রধান সঙ্গিদের একজন হিসাবে বর্ণনা করেছেন। তার একথা মনে করার যথেষ্ট কারণ রয়েছে। তিনি হযরত খানজাহান আলী (রঃ)র বিশিষ্ট সঙ্গি শুধু নয় তার বিশেষ প্রিয় পাত্রও ছিলেন। যে কারণে মৃত্যুর পূর্বে হযরত খানজাহন আলী (রঃ)তাকে ও তার বংশধরদের বহু লাখেরাজ জমি দান করে যান। সেই হিসাবে এক সময় তারা এ দেশের শির্ষস্থানীয় ব্যক্তিদের মধ্যে পরিগণিত হয়েছিলেন। জানা যায় হযরত খানজাহান আলী (রঃ) যশোরে মনিরামপুরে তাদের যে জমি দান করেছিলেন সেখানে তারা প্রজাপত্তন করেছিলেন।

হযরত সৈয়দ শাহ আহম্মদ (রঃ)র জন্ম বা মৃত্যুর সাল তারিখ কিছুই জানা যায় না। তার মাজারের নিকটতম বাসিন্দা তারই বংশধরগণ এ সম্পর্কে কোন তথ্যই পরিবেশন করতে পারেন না। উত্তরাধিকার সূত্রে শোনা পীর সাহেবের কয়েকটা কেরামতির গল্প ছাড়া তারা কিছুই জানেন না।

হযরত জিন্দাপীর (রঃ)র মাজারও সুউচ্চ একটি প্রচীর বেষ্টিত ছিল এবং দেওয়াল সংলগ্ন সুউচ্চ চারটি তোরণও ছিল। এই চারটি তোরণের ২টি ছিল উত্তরদিকে একটি ছিল পশ্চিম দিকে ও একটি ছিল দক্ষিণ দিকে। কিন্তু সেই পুরাতন দেওয়াল এখন আর নেই। বর্তমানে সংস্কারের পর সব গেটই বন্ধ করে মূল প্রবেশ

www.pathagar.com

তোরনটিই রাখা হয়েছে। মাজারের উত্তর দিকে ও বাহিরের দেওয়ালের মধ্যে একটা বৃহৎ ইট ও মাটির স্তুপ ছিল। সংস্কারের সময় এই মাটি ও ইট কিছুটা অপসারণ করলেই সারিবদ্ধ কয়েকটি কবর বেরিয়ে পড়ে। এই মাজারগুলি কিছুটা মেরামত করে সেই অবস্থায়ই রাখা হয়েছে।

জিন্দাপীর (রঃ) এর মাজারটি এক গুম্বজ বিশিষ্ট যে সৌধটির মধ্যে অবস্থিত ছিল তার গঠন প্রনালীর সঙ্গে হযরত খানজাহান আলী (রঃ) র মাজারের গঠণ প্রনালীর হুবহু মিল রয়েছে তবে এতে পাথর ব্যবহৃত হয়নি। এই সৌধটি চার কোণে চারটি মিনারের আকৃতির খাম্বা রয়েছে। এই মাজারের সৌধটির চার দিকেই চারটী দরজা রয়েছে। এই চার দিক থেকেই মাজারের মধ্যে প্রবেশ করা যায়। সৌধটী সুন্দর কারুকার্য্য খচিত ছিল। চারিদিকে ফুল ও লতাপাতা অঙ্কিত ছিল। বর্তমানে এর গুম্বজটি ধ্বসে পড়ায় অনুরূপভাবে তৈরি করা খুবই ব্যায় বহুল। পুরানো কীর্ত্তি সংরক্ষনের আওতায় সরকারী প্রচেষ্টা ছাড়া এর মেরামত কাজ সম্পন্ন হওয়া সম্ভব নয়। এদিকে সরকারে দৃষ্টি দেওয়া খুবই প্রয়োজন।

এই মাজারের সংলগ্ন একটী ছোট মছজিদ রয়েছে। কিছুদিন পুর্ব্বেও এখানে নামাজ পড়া হোত। বাল্যকালে স্থানীয় লোকদের এখানে ঈদের নামাজ পড়তেও দেখেছি। কিন্তু কিছুদিন পুর্ব্বে এর ছাদ ধ্বশে পড়ায় এখানে নামাজ পড়া বন্ধ হয়ে গিয়েছে। এটি মেরামত করাও এখন খুব ব্যায় বহুল। জিন্দাপীর (রঃ)র এই সমস্ত কীর্ত্তিগুলি খানজাহান আলী (রঃ)র কীর্ত্তিগুলি থেকে অনেক কম মজবুত বলে মনে হয়।

জিন্দাপীর (রঃ) সময়কাল নিরুপন করতে গিয়ে কেউ কেউ

www.pathagar.com

লিখেছেন, "হযরত জিন্দাপীর (রঃ) হযরত খান জাহান আলী (রঃ)র সমসাময়ীক অথবা কিঞ্চিত পূর্ব্ববর্ত্তি কালের একজন বিখ্যাত কামেল দরবেশ ছিলেন।" কেউ লিখেছেন, "হযরত শাহ সৈয়াদ আহম্মদ খানজাহান আলী (রঃ) এর প্রধান সহকর্মিদের মধ্যে একজন। শুধু মাত্র তাই নয় তার সঙ্গের কামেল ওলিয়ের মধ্যে তিনি সর্ব্বাধিক নিকটতম একজন কামেল ব্যক্তি।"

খোন্দকার বংশের সবচেয়ে প্রবীন ব্যক্তি খোন্দকার মোহছেন উদ্দিন বলেন, "আমার মনে হয় তিনি ইসলাম প্রচারের উদ্দেশ্যে হযরত খানজাহান আলী (রঃ) র পূর্ব্বেই এদেশে আগমণ করেছিলেন। তিনি ছিলেন ইরান দেশীয় একজন মুসলমান। তার পীরের হুকুম অনুযায়ী সপরিবারে হিজরাত করে ক্রমে ক্রমে এখানে এসে বসতি স্থাপন করেন। তিনি জীবিত থাকতেই খানজাহান আলী (রঃ) এদেশে আগমন করেন। তিনি হোসেন শাহা বাদশাহার সনদ নিয়ে এদেশে আগমন করেন। তার নামের সঙ্গে পরবর্ত্তি কালে খান উপাধি ব্যবহার করা হয়েছে বটে তবে তিনি সৈয়দ বংশিয় লোক ছিলেন। তার বংশধরেরা খোন্দকারি ক'রবার জন্যই এই উপাধিতে ভূষিত হন। তার এই বর্ণনার পর তিনি তাদের বংশের একটি তায়েদাদ নামার ইংরাজ আমলের একটা অনুবাদ নকল বের করে দেখান। মূল ফারসি তায়েদাদটির অবিকল অনুবাদ নকল উদ্ধৃতি করা গেল

তায়েদাদ নামা (অনুবাদ নকল)

শ্রী শ্রী দূর্গা সহায়

নং ৮৭ হাবেলী পং	হকিকত বাজে জমি গ্রহিতার নাম	তায়েদাদ সন দখিল কারের নাম	দস্তার নাম ও সন জমিন যে গ্রাম	গ্রহিতার নাম ও গয়রহ কাছারি কালেক্টারি ও গয়রহ সন ১২০৯ সাল কাত্তিক			
					গ্রহিতার সহিত দখিল কারের সম্পর্কতা	যে গ্রাম জমি তার নাম	পরগনার নাম
সন দস্তার নাম হোসেন সাহ বাদশাহ হোসেন সাহা বাদশাহ	হযরত শাহা খানজাহান আলী	আস্তানার মৌজে তদ্বি খোন্দকার ছাবেরদ্দি ও খোন্দকার ছোমরদ্দি মুন্সি সবরদ্দির আমার পিতার কাল থেকে আন্দাজ ৬০ বৎসর দখিলকার আছি, ইহার পূর্বে ৬০ বৎসর দখিল কার ছিলে আমি ছোমরদ্দি আমার পিতা—একনাম পূরণ দখিল-কার ছিলেন পিতার পরে আমি ২২ বৎসর দখিলকার আছি।	রণবিজয়পুর ও সুন্দর ঘোনা পং হাবেলি	০	তায়েদাদের জমি ১০০/ ১০০/ একশত বিঘা মাত্র	পাটরপাড়া রনবিজয়পুর ও সুন্দরঘোনা	হাবেলি পরগণা লাখেরাজ

বিঃদ্রঃ-উহার সনদ না থাকায় তাহার হকিকত হোসেন সাহা বাদশাহার আমলে হযরত খাজা আলী এই মর্হুমার স্বত্বা হইয়া আসিয়াছিলেন। তাহার সন ৮৬৩ হিজরিতে সন হইয়াছে। এই সুন্দত ভুমি বরাবর দখল কাবেজ থাকিয়া উপসত্ত আস্তানার খরচ লাগিতেছে'—

www.pathagar.com

তিনি বলেন খুলনার মহাফেজ খানায় এর পূর্ববর্ত্তি সবকিছু জমা রয়েছে। একটু অনুসন্ধান করলে মূল ফার্সি তায়েদাদ খানাও পাওয়া যাবে।

এই তায়েদাদ পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে এই পরগনার সুবা অনাৎ সুবেদার ছিলেন হযরত খানজাহান আলী (রঃ)। মূল তায়েদাদে তার নামের পূর্বে হযরত ব্যবহার দেখে বোঝা যায় যে তিনি কত বড় ব্যক্তি ছিলেন। কামেল লোক ছিলেন বলে হিন্দু জমিদারগণও, তার নামের পূর্বে হযরত কথাটা মুছে ফেলতে সাহসী হয় নাই। তিনি যে হোসেন সাহা বাদশার সুবেদার ছিলেন তাতে কোন সন্দেহ নেই। তবে মতভেদ এই যে তিনি কি নসরত হোসেন সাহা না তার পিতা আলাউদ্দিন হোসেন সাহা।

এখানে দেখা যায় যে, এই তায়েদাদে যে সমস্ত জমি খানজাহান আলী (রঃ) এদের দান করেছিলেন বা লাখেরাজ ভোগ দখল করতে দিয়েছিলেন সেই তায়েদাদের সম্পর্কের ঘরে রয়েছে শুন্য। এখন একথা সহজেই বলা যায় যে তিনি মোটেই হযরত খাঁনজাহান আলী (রঃ) পূর্বে এদেশে আগমন করেননি বরং তার সঙ্গেই এদেশে আগমন করেছিলেন এবং সম্ভবত খানজাহান আলী [রঃ]র মৃত্যুর পরে তিনি মৃত্যু বরণ করেন। এই তায়েদাদটিও পরবর্ত্তিকালের বলে মনে হয়। এই এক শত বিঘা জমি খানজাহান আলী [রঃ] এদের এমনিভাবে দান করেছিলেন বলে অনুমান করা যায় যে এদের মধ্যে একটা নিবিড় সম্পর্ক বিদ্যমান ছিল। তাদের এই সম্পর্কের ব্যাপারেও কয়েকটা গল্প এদেশে প্রচলিত আছে।

এইরূপ একটি গল্প শোনা যায়, যে একদিন ফজর নামাজ বাদ হযরত খানজাহান আলী (রঃ) বাঘের পিঠে চড়ে হযরত জিন্দাপীর (রঃ)র

www.pathagar.com

বাড়ীতে কোন কারন বশতঃ তার সঙ্গে দেখা করতে যান। ঠিক সেই সময় হযরত খিন্দাপীর (রঃ) তার কাছারির সম্মুখের সিড়ির উপর বসে মেছওয়াক করছিলেন। তিনি হঠাৎ হযরত খানজাহান আলী (রঃ কে এই অবস্থায় দেখে তাকে কিভাবে অভ্যার্থনা করবেন তার জন্য ভিষণ ব্যস্ত হয়ে পড়েন। উপয়ান্তর না দেখে তিনি সিড়ির উপর বসে দেওয়ালের উপর মেছওয়াক দিয়ে আঘাত করে তাকে অভ্যার্থনা করে আনবার জন্য সিড়িকে হুকুম করেন। সিড়ি ও দেওয়াল যখন তাকে অভ্যার্থনা করবার জন্য রওনা হোল, তখন হযরত খানজাহান আলী (রঃ) বাঘের পিঠ থেকে নেমে দেওয়ালকে নিশেধ করেন। দেওয়াল তখন থেমে যায়। দুজনে তখন দুজনের বাহন থেকে নেমে পরস্পর মোছাফাহা করেন।

এই দুই পীর সাহেবকে ঘিরে মানুষ কখন যে এই গল্পটি রচনা করেছে, না এটি সত্য কাহিনী নিশ্চিত করে কেউ বলতে পারেন না। এই কাহিনী সত্য কিনা তা যাচাই করবার আমাদের কোন প্রয়োজন নেই কিন্তু একথা সত্য যে, যে কোন প্রবাদের পিছনে কালের সত্যতার একটা ছায়া পড়ে থাকে। বর্গির হাঙ্গামার সময় 'ছেলে ঘুমালো পাড়া জুড়ালো বর্গি এলো দেশে' ছড়া রচিত হয়েছিল। বর্গির ভয়ে আজও ছেলে ঘুমিয়ে পড়বে, না ভয় পাবে, বলা যায় না। কিন্তু বর্গির দৌরাত্ম যে বাংলায় একদিন ছিল একথা বলা যায়। তাই এই গল্প দিয়ে অন্ততঃ একথা বলা যায় যে তারা একই সময়ের লোক ছিলেন এবং দু'জনেই কামেল ছিলেন। শুধু তাই নয় এদের মধ্যে একটা প্রগাঢ় আন্তরিক সম্পর্কও ছিল। শোনা যায় খিন্দাপীর সাহেবের এক ছোট ভাই ছিলেন। তিনিই রেজা শাহ নামে পরিচিত ছিলেন। তার নামে আজও রেজাই খাঁ মছজিদ রয়েছে। তিনিই

www.pathagar.com

নাকি ছিলিয়া খানায় অস্ত্রাগারের প্রধান পদে নিয়োজিত হয়ে সম্মান জনক খাঁন উপাধিতে ভূষিত হয়েছিলেন। সম্ভবতঃ এই দুজনই একই তরিকার পীর ছিলেন এবং খানজাহান আলী (রঃ) মৃত্যুর পর লোকে তার নিকট দোয়া প্রার্থী হোত।

হযরত জিন্দাপীর (রঃ) এর মাজার থেকে তার বাড়ীর ধ্বংসাবশেষ অতি নিকটবর্ত্তি। বাড়ীর সম্মুখে তার বৈঠকখানাটি এখনও সম্পুর্ণ-ভাবে ধ্বংশ হয়নি এই কাছারি সংলগ্ন ছিল তার এবাদত খানা বা হোজরা খানা। শোনা যায় অনেক পূর্ব্বেই এর গুম্বজ বিশিষ্ট ছাদটি ধ্বংশে গিয়েছে। এই বাড়ীতে বসবাসকারি তার বংশের লোকেরা এই কাছারির কিছুটা মেরামত করে ব্যবহার ক'রছেন। ছিলিয়া খানা জায়গাটি তার এই বাড়ীর অতি নিকটবর্ত্তি এবং এটা খোন্দকার বংশের লোকদের আয়ত্তাধীন রয়েছে।

জিন্দাপীর (রঃ) এর মাজারের নিকটেও রেজাই খাঁ মছজিদের সম্মুখে কোমরার দিঘি অর্থাৎ কোমর খাঁর দিঘি অবস্থিত। এই দিঘিটা এক সময় ভীষন জঙ্গলাকীর্ণ হয়ে পড়েছিল কিন্তু বর্ত্তমানে পরিস্কার করে এখানে মাছ ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। এর পাড়ে রেজাই খাঁর মছজিদটা বেশ বড় ছিল। শোনা যায় এই মছজিদটা ছয় গুম্বজ বিশিষ্ট ছিল কিন্তু বর্ত্তমান অবস্থা থেকে আজ তা অনুমান করাও কঠিন। এই মছজিদের মাঝে খাম্বার লম্বা লম্বা কিছু পাথর আজও পড়ে রয়েছে। এর একটা পাথর সম্পর্কে লোক মুখে এমনি একটা প্রবাদ ছড়িয়ে পড়েছিল যে, এই পাথটি দুধ খায়, এবং অনেক লোকে অজ্ঞতাবশতঃ মানত করে এখানে দুধ দিয়ে যেত। এইখানে আর একটা গল্প এমনি শোনা যায় যে, "দুইশত বৎসর পূর্ব্বের কথা জিন্দাপীর সাহেবের আমল থেকেই প্রতি বৎসর নির্দিষ্ট এক সময়ে

www.pathagar.com

এখানে একটী উরুজ হোত। এই উরুজের সময়ে পীর সাহেবের প্রয়োজন মত যাবতীয় থালা ঘটী বাটি পীর সাহেব নির্দ্দেশ দেওয়া মাত্র কোমরার দিঘি থেকে উঠে আসতো। এই থালা বাসন সবই ঝক ঝকে রুপার থালা বাসন ছিল। আবার প্রয়োজন শেষে পরিস্কার করে রেখে দিলে এগুলি যথাস্থানে চলে যেত। ফেরত দিতে একটি কম থাকলে সে আর যেত না। তাই খাবার শেষে এই থালা গেলাস পরিস্কার করে সবাই যথাস্থানে রেখে দিত। কিন্তু পীর সাহেবের মৃত্যুর পর কোন এক ওরজের সময় কোন এক দুষ্ট লোক পীর সাহেবের হুকুম অমান্য করে একটী পাত্র চুরি করে নিয়ে যায়। সবাই দেখতে লাগলো যে থালা বাসন আর যাচ্ছে না। তখন সবাই বাসন খুজতে লাগলো কিন্তু পাওয়া গেলনা। তার পর এক সময়ে বাসনগুলি চলে গেল বটে তবে আর কোনদিন প্রয়োজন মত উঠে এলো না।

হযরত শাহ সৈয়দ আহম্মদের নাম কেন জিন্দাপীর হয়েছিল সে সম্পর্কেও সুন্দর একটি গল্প প্রচলিত আছে, গল্পটি কারো কাছে এই রূপ শোনা যায় যে 'মৃত্যুর পূর্বেই নিজ হাতে তিনি তার কবর প্রস্তুতকরে রেখেছিলেন এবং মৃত্যু আগত প্রায় হলে তিনি নিজেই গোছল সমাপন করে একটি কোরান শরিফ হাতে কবরের ভিতর প্রবেশ করেন। এই যাত্রাই তার শেষ যাত্রা। কোনদিন তিনি আর ফিরে আসেন নি, এই জন্যই লোকে তাকে জিন্দাপীর বলে অভিহিত করেছে। আবার কারো কাছে এরূপ শোনা যায় যে, 'তার জিবদ্দশায় তার নিকট থেকে কোন রূপ বেলায়েতী প্রত্যাশা না করেই তার এক পুত্র একজন অলি হয়ে ওঠেন। পীর সাহেব তখনও এদিকে কোন নজর দেননি। একদিন সে আব্বার হাতের লাগানো গাছের একটি শশা চুরি করে খেয়ে

www.pathagar.com

ফেলে। হুজুর এক সময় ঘরে ফিরে এসে গাছে শশা না দেখে জিজ্ঞাসা করেন, শশা কে খেয়েছে রে ? ভিতরে গিয়ে এই কথা তিনি ছেলেকে জিজ্ঞাসা করলে—কৈ দেখি, বলে ছেলে গাছের দিকে চলে যায় এবং ফিরে এসে বলে কেন আব্বা, শশা তো গাছেই রয়েছে। তিনি ব্যাপারটা বুঝতে পারেন এবং ছেলের এই কেরামতি দেখানোর জন্য একটু মর্ম্মাহত হয়েই তার প্রতি জালালি দৃষ্টি নিক্ষেপ করেন। কিছু সময়ের মধ্যেই ছেলেটি মৃত্যু মুখে পতিত হয়। তারপর ছেলেকে কবরে রেখে তিনিও কোরান শরিফ হাতে জিন্দা কবরে প্রবেশ করেন। তার মাজারের মাথার দিকের একটি কবরই নাকি তার ছেলের কবর।

আবার কেউ কেউ বলেন, তিনি খুব জালালি পীর ছিলেন। জিন্দা অবস্থায় তিনি কারো বেয়াদবি সহ্য করতেন না এবং মৃত্যুর পরেও তার মাজারে বেয়াদবি করলে তার কোনদিন কোন সুফল হয় না। এই কারনেই লোকে তাকে জিন্দাপীর বলে অবিহিত করেছে। ফলমুল নিয়ে কেরামতির অনেক গল্পই বাংলাদেশের বহু পীর সম্পর্কেই এইরূপ প্রচলিত আছে।

কেরামতির গল্প বা মতামত যাইই হোক না কেন এই দুই জন পীর যে আল্লার এক একজন কামেল ওলি ছিলেন এতে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। জিন্দাপীর সাহেবও যে বহিরাগত একজন মুছলমান তা শুধু ইতিহাস নয়, তার বংশের কোন কোন লোকদের দেখলে আজও অনুমান করা যায়। কিন্তু দুঃখের বিষয় জিন্দাপীর সাহেবের বংশের লোকদের মধ্যে এবং খান জাহান আলী (রঃ) খাদেমদের বংশের লোকদের মধ্যেই তাদের আদর্শ বা ঐতিহ্যের কোন চিহ্নই আজ আর অবশিষ্ট নেই। যারা

www.pathagar.com

ছিল এক কালে এদেশে ইসলাম প্রবর্তক, ইসলামের আদর্শ আজ তাদের নাগালের মধ্যেই নেই। অভাব অনটন, লোভ লালসায় এরা জর্জরিত। এদের অনেকেই নামাজ পর্যন্ত পড়তে জানেনা অথচ গরিমার শিখরে আরহন করে আছে। দুই চার জন লোককে বাদ দিলে সবাই লেখা পড়া জানে না বলা যেতে পারে। শোনা যায় পূর্ব্বে এদের মধ্যে একটা আধ্যাত্মিক শিক্ষার প্রচলন ছিল। আজ তারা সে পথ বিচ্যুত। তাই এদের অনেকের ব্যক্তি জীবন আজ বহু অপকর্ম ও অপকাণ্ডে ভরপুর। আমার বিশ্বাস এরা যদি এদের পুরানো ইসলামি আদর্শের মাঝে ফিরে যায় তবে আবার একদিন উন্নতির চরম শিখরে আরহন করতে সক্ষম হবে।

মেলা, ওরজ, শেরেক ও বেদয়াত

হযরত পীর খান জাহান আলী (রঃ)র মাজারের পশ্চিম দিকের একটি পাথরে কোরানের আয়াতের একটি অংশ বিশেষ লিখিত দেখা যায়। এই পাথরটির খোদাই করা আরবি হরফ-গুলি প্রায়ই উঠেই গিয়েছে তবুও এটুকু কষ্ট করে পাঠোদ্ধার করা গিয়েছে। লেখা রয়েছে—

এই লেখাটির ডান দিকে আরও লেখা ছিল কিন্তু সে গুলি একেবারেই নেই। বাংলা উচ্চারণ—'ওলা ইয়ুসরিক বেই-বাদাতি রাবিবহি আহাদা' আমার মনে হয় আয়াতটি লেখা ছিল আরও বেশী। সম্ভবত এখান থেকে শুরু হয়েছিল—

'ফামান কানা ইয়ারযুলে কায়া রাব্বিহি ফালইয়ামাল আমালান

ছলেহাও ওলা ইয়ুশরিক বি ইবাদাতি রাব্বিহি আহাদা'।

অর্থ ১—অতএব যে ব্যক্তি নিজ প্রভুর সহিত সাক্ষাত লাভের আকাংখা রাখে, সে যেন নেক কাজ অর্থাৎ নেক আমল সমুহ করিতে থাকে এবং স্বীয় প্রভুর এবাদতে অন্য কাহাকেও শরিক না করে।'

এই আয়াতে শিরিক সম্পর্কে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে মওলানা আশাফ আলী থানার (রঃ) তার তফসিরে আশরফিতে বলেছেন 'হাদিসের দ্বারা জানা যায় যে এই আয়াতে শিরিক শব্দটি প্রকাশ্য ও অপ্রকাস্য শিরকের মধ্যে ব্যাপক থাকায় গুপ্ত শিরিক বা রিয়া অর্থাৎ লোক দেখানো কার্য্যও ইহার মধ্যে অন্তভুক্ত রহিয়াছে। 'আমালান ছলেহা' এর পর 'অলা ইয়ুশরিক' এর উল্লেখে ব্যাপকতার পর নির্দিষ্ট করণ হইয়াছে। কেননা 'আমলে ছলেহ' বলিতে খাটি এবং লোক দেখানো উভয়টাই ব্যাপকভাবে বুঝায়। অতপর 'ওলা ইয়ুশরিক' এর উল্লেখে আমলে ছলেহ হইতে লোক দেখানো কাজগুলি বাদ পড়িয়া শুধু খাটী সৎ কাজই উহার অন্তর্ভুক্ত থাকে।

হযরত পীর খানজাহান আলাইহের রহমাতের মাজার ও দরগাহ নিঃসন্দেহে একটী পবিত্র স্থান। সন্দেহাতিতভাবে এটী হুজুর বর্ণিত বেহেস্তের বাগানের একটি অংশ, একটী পুণ্য স্থান। যারা পীর সাহেবের দোয়া প্রার্থী হয়ে এখানে আসেন তারা বুঝতে পারেন আল্লার রহমাত ও শান্তি দুনিয়া থেকে আজও উঠে যায়নি। তাই পুণ্য লোভি মানুষ প্রতি নিয়ত এখানে যাতায়াত করেন। দৈনিক হাজার হাজার মানুষ হাজার হাজার মকছেদ নিয়ে এখানে হাজির হয়। প্রতি শুক্রবার ও রোববার অফিস আদা-

www.pathagar.com

লতের ঝামেলা কম থাকায় লোকজনের আগমন একটু বেশীই হয়ে থাকে। প্রায় প্রতিটি লোকই মাজার জিয়ারত ও মানত শোধ করতে আসেন। তা ছাড়া অনেক বিদেশী পর্যটকও এই পুরাতন কীর্তি পরিদর্শন করতে এসে এর অপূর্ব কারুকার্য দেখে বিস্মিত হয়ে যান। প্রায় সমস্ত জিয়ারত কারিই মাজারে আতর, লোবান ও গোলাপ পানি দিয়ে যান। পূর্বের মাজারে মোম বাতির স্তুপ হয়ে যায়। এমনকি মানত শোধ হবার জন্য ভক্ত-গণ দিবাভাগেও মোমবাতি জ্বালিয়ে দিত। কিন্তু মাজারে বৈদ্যু-তিক আলো আসার ফলে এবং কতিপয় আলেম ও খাদেমদের চেচামেচি করার জন্য এই নাজায়েজ কাজটি এখন প্রায় বন্ধ হয়ে গিয়েছে। পূর্বে অধিকাংশ ভক্তবর্গ মাজারে মোমবাতি জ্বালিয়ে মাজারে ছিজদা করতো। কিছু সংখ্যক সন্ন্যাসি বেশের ফকির, যারা নিজেদের মারেফাত পন্থি বলে পরিচয় দেয় তারাই ছিল এই মাজারে ছিজদা দেওয়ার প্রবর্তক। তাদের দেখা-দেখি বহু নাবুঝ লোকেরাও মাজারে ছিজদা দিয়ে ভক্তি নিবেদন ক'রতো কিন্তু এই শেরেকি কাজটি বর্তমানে প্রায় বন্ধ হয়ে গিয়েছে। খাদেমদের চক্ষুর অগোচরে ছাড়া এখন আর এই কাজটি করা সম্ভব নয়। এই শেরেকি কাজটিতে তারা বাধা প্রদান করে থাকেন এবং মানুষকে বুঝিয়ে দেন, 'এই মাথা একমাত্র আল্লার কাছে নত করতে হয়, কোন কবর বা মানুষের কাছে নয়। যার উদ্দেশ্যে ছেজদা করেছেন তিনিও আল্লার একজন বান্দা'।

এই মাজারে যদিও সব সময়ই লোক সমাগম হয় তবুও বছরের বিশেষ ২/৩টা উৎসবে লোক সমাগম অত্যাধিক হয়ে থাকে।

www.pathagar.com

প্রতি বছর চৈত্র মাসের পূর্ণিমাতে এখানে বড় একটি মেলা বসে থাকে ও প্রতি বছর ২৫শে অগ্রাহায়নে পীর সাহেবের নামে একটি ওরস শরিফ অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে এবং মাঘ ও ফাল্গুন মাসের পূর্ণিমা তিথিতেও প্রচুর লোক সমাগম হয়ে থাকে। এই বিশেষ সময়ে বিভিন্ন জেলা থেকে বহু লোক হাজত মানত নিয়ে এখানে উপস্থিত হয়ে থাকেন। কেউ কেউ আবার মেলা ও ওরসকে একই পর্য্যায়ের মনে করে থাকেন কিন্তু আসলে এ দুটি সম্পূর্ণ ভিন্ন পর্ব।

মেলা চৈত্র মাসের পূর্ণিমা তিথিতে খুব আড়ম্বরের সঙ্গে বসে থাকে। এখানে এই মেলার প্রচলন কখন কবে থেকে হয়েছে, সঠিক ভাবে একথা কেউই বলতে পারেন না। তবে অনেকে বলেন, পূর্বের একটি ইছালে ছাওয়াবের অনুষ্ঠানই আজ এই মেলার রূপান্তরিত হয়েছে। ইংরাজ আমলে অথবা তার পূর্বে কোন এক সময়ে এটা বন্দ হয়ে যায়। পরে হিন্দুদের প্রভাবে ধিরে ধিরে এটা মেলায় রূপান্তরিত হয়। আবার কেউ কেউ বলেন বৌদ্ধদের আমলে এতদঞ্চলে যে মেলাটির প্রচলন ছিল সেই মেলাটিই মুছলমানদের কোন এক দুর্বল মূহুর্তে শুরু হয়ে গিয়েছে। প্রথম মতটিই সামধিক গ্রহণযোগ্য বলে মনে হয়। কোরান তেলাওয়াত এবং মৃত রুহের প্রতি ছোয়াব রেছানি ও মাগফেরাত কামনার অনুষ্ঠানটি আজ উৎকৃষ্ট ও অসামঞ্জস্য একটী মেলার রূপান্তরিত হয়েছে। যে ধরনের মেলা এখানে অনুষ্ঠিত হয় তা হিন্দুদের কালীবাড়ী বা শিব বাড়ীতে হওয়াই সম্ভব, এমন একজন পীরের দরগায় এই রূপ মেলা নিতান্ত অশোভণ। অনেকে এ কথার দ্বিমত পোষণ করে বলেন বাদশা আকবর ও ভো নওরোজের মেলার প্রচলন করেছিলেন

কিন্তু তারা এইটুকুই বুঝতে ভুল করেন যে একজন বিলাসী বাদশার পক্ষে যা সম্ভব একজন আল্লার ওলির পক্ষে তা সম্ভব নয়। এই মেলা দেখে কোন বিবেকবান লোক বলতে পারবেন না যে এত বড় একজন ওলির মাজারে এই রূপ মেলার প্রচলন থাকা উচিত। এই মেলায় শেরেক বেদাত ও যে সমস্ত অন্যায় কাজ সংঘটিত হয় তাতে কোন মতেই সেখানে সে সময় আল্লার রহমতের আশা করা যেতে পারে না। শেরেক ও বেদায়াত ও নানা অন্যায়ের প্রতাপশালী ঘোড়াটি তখন এখানে লাগামশুন্য হ'য়ে যায়।

হিন্দুদের কাছে এই মেলা ঠাকুর দিঘির মেলা বলে. পরিচিত। এই দিঘিতে স্নান তখন তারা গঙ্গা স্নানের মতই পবিত্র মনে করেন। এই মেলায় হাড়ি. পাতিল, পুতুল, মনহারি দ্রব্য মিষ্টির দোকান ও হোটেল থেকে শুরু করে সার্কাস নাগোর দোলা পুতুল নাচ, জুয়া পর্যন্ত না আসে এমন কোন পদার্থ নেই। হিন্দুদের যে কোন তীর্থ স্থানের মেলা থেকে এই মেলায় কোনরূপ পার্থক্য নেই। হিন্দু মুসলমান নর ও নারী নির্বিশেষে এই মেলায় যোগদান করতে দেখা যায়। মুসলমানদের মধ্যে ফকির শ্রেণের মেয়েদেরই এই সময় বেশী আগমন হ'য়ে থাকে। ভরা পুর্ণিমার রাতে এখানে তিল ধারণের ঠাই থাকে না। রাতে তারা বিভিন্ন স্থানে গাছের ছায়ায় আশ্রয় গ্রহণ করে ঘুমিয়ে থাকে। এই মেলায় মুসলমান মেয়েরা সখের বশবর্তি হয়ে দুর দেশ থেকে এসে, মান, লজ্জা. শরম. পর্দ্দা ও পুবিদা বিসর্জ্জন দিয়ে কেমন করে উপস্থিতি হয় তা ভাবলে হতবাক হয়ে যেতে হয়, লজ্জায় চোখ বন্ধ হয়ে আসে। এই সময় পায়খানা প্রস্রাবের দুর্বিষহ গন্ধে মাজার শরিফ ও দিঘির আশে পাশে যে কি রকম অপবিত্র হয়ে ওঠে তা একমাত্র প্রত্যক্ষদর্শীই উপলব্ধি করতে পারবেন।

www.pathagar.com

বিদেশ থেকে পীর সাহেবের মেলায় এসে যায়। এইভাবে এ স্থানকে অপবিত্র করেন তারা কোন পুন্য সঞ্চয় করে বাড়ী ফিরতে পারেন কিনা জানি না কিন্তু পাপের বোঝা নিয়ে যে ফিরে যান তাতে সন্দেহের অবকাশ নেই।

এই সময় কুমিরের উদ্দেশ্যে দিঘিতে হাজার হাজার মুরগী ও মোরগ নিক্ষেপ করা হয়। বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলের লোক কুমিরের নামে মানত করে এই সব মোরগ মুরগী নিয়ে আসেন। কিন্তু কেউ কোন সময় চিন্তাও করে দেখেন না যে কোন বিপদ উদ্ধা-রের জন্য কুমিরের নামে মানত করলে তা শেরেক ছাড়া আর কিছুই হয় না। এইরূপ মানত জীবনের ছদকাও আল্লার ওয়াস্তে হওয়াই উচিত আল্লার স্থানে. কুমির এসে দাড়ালে সেটা কত বড় গোনার কাজ হতে পারে তা বলা বাহুল্য। তবে কুমিরকে যে তার আহার্য একটি মুরগি দেওয়া যাবে না এমন কোন কথা নেই কুমির দেখার জন্য, তার আচরণ দেখবার জন্য, একটি মুরগী তাকে দিলে কারোই আপ-ত্তির কিছু থাকতে পারে না। কিন্তু কুমিরের নামে মানত করে মুরগী এনে, কুমির যদি আমার মুরগী না খাও, তবে আমার মানত শোধ হোল না এবং আমার পরম অমঙ্গল হবে. এরূপভাবে শেরেকি শুধু নয় এটি কুমির পূজারই নামান্তর। এই দিঘিতে কুমির দেখে এবং কুমিরকে মানুষের হুকুম তামিল করতে দেখে. আমাদের এইটুকুই উপলব্ধি করা উচিত, যে খানজাহান আলী (রঃ আল্লার কত বড় ওলি ছিলেন যে হিংস্র কুমির তার হুকুম আজও পালন করে চলেছে।

এ কথা নি.সন্দেহে বলা চলে যে এই মেলাটির জন্য এই মাজা-রের পবিত্রতা বহুল পরিমাণ ক্ষুন্ন হচ্ছে। কয়েক বৎসর পুর্ব্বেও এই মেলাটির একটা বৃহত্ত অংশের আয়োজন দেওয়ালের বাহিরেই

www.pathagar.com

করা হোত কিন্তু আজ কয়েক বৎসর মেলায় সমস্ত আয়োজনই মাজারের অঙ্গনের ভিতরেই এসে পড়েছে। ফলে মেলার জঘন্য আঙ্গিকগুলি গাঁজা, মদ ও জুয়ার খেলা মাজারের নিকটবর্ত্তি হয়ে এসেছে। কিন্তু আশ্চর্য্যের ব্যাপার এই যে এই সময়ে এদিকে সরকারের বা খাদেম পক্ষের কারোই তেমন বিশেষ কোন লক্ষ্য নেই। নেহায়েত সম্মুখে পড়লে তারা একটু অমত প্রকাশ করে সরে পড়েন। এই মেলাটির প্রতি ফকির সাহেবদের একটা দারুন দুর্বলতা রয়েছে কারন এটি তাদের আয়ের একটি বৃহত উৎস। তাই তারাও অনেক অনাচার অকাতরে হজম করে যান। তা ছাড়া শেরেক ও বেদাত সম্পর্কে খাদেম-দের মধ্যে কারোই সাম্যক ধারনা আছে বলে মনে হয় না। পয়সা দিলেই তাদের কাছ থেকে কোন কিছুতেই কোন বাধা আসার সম্ভাবনা নেই। কিন্তু এই সকল আচরনের পরিবর্ত্তণ হওয়া উচিত এবং মাজারের পবিত্রতা রক্ষার জন্য সর্ব্ব প্রথম খাদেমদেরই উচিত মেলাটি মাজারের ও দিঘির সিমানার একটু দুরে সরিয়ে নেওয়া এবং সর্ব্বপ্রকার অনাচারও কদাচার থেকে মাজারকে রক্ষা করা। তা না হলে আল্লার ওলির অভিশাপ প্রাপ্ত হওয়া কিছুই বিচিত্র নয়।

চৈত্র মাসের পুর্ণিমা তিথি ছাড়াও প্রায় প্রতি পুর্ণিমা তিথিতেই এই দরগায় প্রচুর লোক সমাগম হয়ে থাকে। বরিশাল পটুয়া-খালি জেলার বহু লোক এই সময় সপরিবারে নৌকা যোগে আগমন করে থাকেন। বিভিন্ন প্রকার হাজত মানত নিয়ে তারা আসেন। কেউ কেউ মাজারের বিভিন্ন জায়গায় হাড়ি পাতিয়ে সিন্নি পাকিয়ে এবং মাজারেই সেই সিন্নি বিতরণ করে, তাদের মানত শোধ করে থাকেন।

প্রতি বৎসর অগ্রহায়ণ মাসের ২৫ তারিখ প্রতি জাকজমকপূর্ণ

www.pathagar.com

ভাবে এই মাজারে পীর সাহেবের নামে ওরস শরীফ অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। এই উপলক্ষে বর্তমানে মাজারে সবিনা খতম, খতমে খাজেগান, কোরান তেলাওয়াত, মিলাদ মাহ্‌ফিল ও মৃত রুহের প্রতি ছোয়াব রেছানি করা শুরু হয়েছে। এই সময় পবিত্র রওজা মোবারক আতর ও গোলাপ পানি সহকারে উত্তম রূপে ধৌত করে কোন কোন বছর নতুন চাদর জড়িয়ে আবার এক বছরের জন্য মাজারটি নতুন করে সজ্জিত করা হয়। কিন্তু এই মাজার ধৌত করার রীতিটি কেন এবং কখন যে প্রচলন করা হয়েছে তা সঠিক করে কেউ বলতে পারেন না। কবর ধৌত করার সময় অনেক ভক্তবর্গ ঐ কবর ধোয়া পানি বোতল ও হাড়ি কলসি ভরে বাড়ীতে নিয়ে যান ও অসুখ বিসুখে ভক্তি সহকারে এই পানি পান করে থাকেন। এই সময় অনেক ভক্তবর্গ এই কবরের প্রতি যে ধরণের ভক্তির পরাকাষ্ঠা দেখিয়ে থাকেন তাকে কবর পুজা ছাড়া আর কিছুই বলা যায় না। এই ভাবে এই সব অনুষ্ঠানে এখানে রীতির সঙ্গে কুরীতি, আচারের সঙ্গে অনাচার, ন্যায়ের সঙ্গে অন্যায় আদর্শের সঙ্গে অনাদর্শ, ভক্তির সঙ্গে পুজা মিশে একাকার হয়ে যায়। এই কবর ধোয়ার কোন প্রয়োজন আছে বলে আমার মনে হয় না। এর উপরে গোসল বা ছামিয়ানাগুলি পরিষ্কার করলেই যথেষ্ট হয়। এই কবর ধৌত করার ফলে উপকারের থেকে ক্ষতিই সবদিক দিয়ে বেশী হচ্ছে। শেরেক বেদাত বাদ দিলেও, মাজারের উপরের লেখাগুলি ক্ষয় প্রাপ্ত হয়ে চলেছে। বহু লেখা এমনিতেই উঠে গিয়েছে, তাছাড়া পানির স্পর্শে এসে পাথরের কোন কোন অংশ ফেপে উঠে চলটা ধরে পড়ে যাচ্ছে। এমতাবস্থায় এই লেখাগুলি যাতে রক্ষা হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখা

www.pathagar.com

আজ খাদেম সাহেবদের কর্তব্য বলে মনে করি। মাজার ধৌত করার এরূপ কোন নির্দ্দেশ হযরত খানজাহান আলী (রঃ) দিয়েছিলেন বলেও আমার মনে হয় না।

দেখা যায় ওরজের এই দিনটি হযরত খানজাহান আলী (রঃ) জন্ম ও মৃত্যুর কোন তারিখ নয়। কোন একদিন হয়তো খাদেম সাহেবগণ এই দিনে এই ওরজটির আয়োজন করেছিলেন, এই দিনটিই ওরজের দিন নির্ধারিত হয়ে গিয়েছে। এই সময়ে ওরজের একটা সুবিধা এই যে, এই সময়ে খেত খামারের কাজ ও কম থাকে এবং গ্রীষ্মের প্রখরতা ও শীতের প্রচণ্ডতাও কম থাকে এবং এই সময় বহু ধর্ম প্রাণ মুছলমান, চাউল ডাউল, খাসি, মুরগী গরু ছাগল এমনকি বাড়ীর তরিতরকারী নিয়েও এই ওরজ শরিকে শরিক হ'য়ে থাকেন। এই সময়ে চাউল ডাউল সহ খাদেম সাহেবরাও কিছু প্রস্তুতি নিয়ে থাকেন এবং এই সব দিয়ে বিরানী পাক করে সবাইকে তাবারক বিতরণ করা হয়ে থাকে। মিলাদ অন্তে জোবাব রেহানির পরে এই তাবারক দেশী বিদেশী উপস্থিত সকল লোকের মধ্যে বিতরণ করা হয়। বিদেশী লোকরাই বেশি ভক্তি সহকারে এই তাবারক গ্রহণ করে থাকেন ও সামান্য কিছু বাড়ীতে নিয়ে যাবারও চেষ্টা করেন। কিন্তু স্থানীয় কিছু সংখ্যক লোক অনেক সময় এই তবারক বিতরণে অসুবিধার সৃষ্টি করে থাকেন এবং বিতরণের নামে তারা এই তাবারক আত্মসাতও করে থাকেন। ফলে কিছু বিদেশী লোকদের এই তাবারক থেকে বঞ্চিত হওয়া বিচিত্র নয়। ওরজ শরিফের সকল দায় দায়িত্ব মাজারের খাদেমদের উপর থাকলেও তাবারক বিতরণের সময় তারা প্রতি বছরই কিছু বাহিরের লোকেরও সাহায্য নিয়ে থাকেন।

www.pathagar.com

এই সময় মাজার জিয়ারতের একটা ভিড় পড়ে যায়। মাজারের ভিতর এত লোক দাড়াবার সংকুলান হয় না বলে এবং বিভিন্ন ধরনের ক্ষতির সম্ভাবনাকে এড়াবার জন্য মাজারের দুটি দরজাই বাশ দিয়ে আটকে দেওয়া হয়। এই সময় কেউ কেউ বাহিরে বসেই কোরান তেলাওয়াত করতে থাকেন। কেউ কেউ আবার মাজার সামনে রেখেই নামাজ পড়তে শুরু করেন, অনেক বাইরেই চুমা দিয়ে ভক্তি নিবেদন করে থাকেন।

মুছলমানদের আদর্শ ও বহির্ভূত কাজগুলি যে শুধু মেলা ও ওরজের সময় সংঘটিত হয় তা নয়, স্বাভাবিকভাবে বিভিন্ন সময়েও সন্তানাদির মানসে বহু লোক এখানে সস্ত্রীক আগমন করে থাকেন। সন্তানাদি প্রাপ্তির জন্য তারা কুমিরকে মুরগী ও দীঘিতে গোছল করার মানত করে এখানে এসে থাকেন। সন্তান প্রাপ্তির মানসে মেয়েরা দীঘিতে ডুব দিয়ে ঝিণ বা সামুক তুলে অঞ্জলিতে রেখে ধৌত করে পানি খেয়ে থাকেন। ডুব দিয়ে কারো হাতে মৃত শামুক উঠলে তার ভাগ্য নাকি বড় খারাপ। কোন কোন মেয়ে লোক তখন পুত্র শোকের মত কান্না জুড়ে দেয়। অনেকে সন্তানাদি হওয়ার পর সন্তানের চুল ফেলে না। এখানে এনে তার চুল ফেলা হয়। এই চুল ফেলতে হলে খাদেম সাহেবদের ভাল হাতে নজর নেয়াজ দিতে হয়। কাজেই এই রোজগারের পথটি ফকির সাহেবগণ বন্দ করতে মোটেই রাজি নয়। কিন্তু বর্তমানে লক্ষ্য করা যায় কেউ কেউ এই কাজগুলিকে বেশ অপছন্দ করে থাকেন। এই অনাচার গুলি এখান থেকে সম্পূর্ণ তিরোহিত হওয়াই উচিত।

বিশিষ্ট চিন্তাবিদ প্রমথনাথ বিশি মহাশয় এই দরগা সম্পর্কে একটী মতামতের স্বপক্ষে একবার সাক্ষ্য দিয়েছেন যে 'আমি নিজে

www.pathagar.com

এখানে পূজা হতে দেখেছি।' কথাটা একেবারে মিথ্যা বলে উড়িয়ে দেওয়া যায় না এখানে পূজা হতে অনেকেই দেখেছেন এবং আজও কিছু কিছু হয় বললেও মিথ্যা বলা হবে না। হযরত খানজাহান আলী (রঃ) মাজারের সৌধটির উত্তর পশ্চিম কোনের খাম্বাটিতে হিন্দুরা এখনও পূজা করছেন এবং আশ্চর্যের বিষয় এই যে সেই সাথে কিছু মুছলমান রমনীরাও অনুরূপ অনুকরণ করতে চেষ্টা করেন। এই খাম্বাটীর পাথরে ধৌত করে তেল সিন্দুর মাখিয়ে হিন্দু রমনীগণ মাঝে মাঝে আজও পূজা করে আসছেন। তারা এই খাম্বাটী জড়িয়ে ধরে কোল দিয়ে থাকেন এবং সন্তানাদির প্রত্যাশা করেন। শিব মন্দিরে গিয়ে তারা যে ভাবে কোল দিয়ে থাকেন, এটী অনুরূপ একটী প্রথা। বিদেশ থেকে আগত অনেক মুছলমান রমনীরা তেল সিন্দুর লাগিয়ে একই পদ্ধতিতে এখানে কোল দিয়ে থাকেন। হিন্দুগণ এই খাম্বটীকে এক সময় 'সিদ্ধি খাম্বা' বলে অভিহিত করেছিলেন। এখনও অনেকে এটীকে 'সিদ্ধি খাম্বা' বলে থাকে। হিন্দু রমণীগণ দিঘীতে গোছল করে পিতলের ঘটীতে জল নিয়ে ভিজে কাপড়ে এই সিদ্ধি খাম্বার কাছে চলে আসেন। তার পর খাম্বাটি জড়িয়ে ধরার পর ঐ জল তাদের মাথায় ঢেলে দেওয়া হয়। এই জল ঢালার কাজটি বরাবরই ফকির সাহেবরা করে থাকেন, বিনিময়ে তাদের পরিহিত নুতন কাপড়টি, যা তারা খুলে রেখে যায়, ওটি পেয়ে যানও বেশ কিছু নজর নেয়াজও পেয়ে থাকেন। এই লোভ তারা সম্বরন করতে পারেন না বলে, পূজার পুরোহিতের কাজটী নিজ হাতে সম্পন্ন করে জীবন্ত শেরেকি কাজটী পরিচালনা করে খুশি হয়ে আসেন। এই ভাবে এখানে তেল সিন্দুর দিয়ে পাথর পূজা, কুমির পূজা, কোল দেওয়া প্রথাগুলি আজও প্রচলিত

www.pathagar.com

আছে। এগুলি বন্ধ করার কথা বললে, কোন কোন খাদেম বলেন পীর সাহেব কোন ধর্মই ঘৃণা করেন না' তাছাড়া হিন্দুদের কাজ হিন্দুরা করছে ওতে আমাদের কি? কিন্তু আজ এই খাম্বার নীচে একটি যন্ত্র বসেছে। ভক্তিতে অন্ধ যাত্রীদের কাছে "সিদ্ধি খাম্বা" বলে পরিচয় দিয়ে এখানে পয়সা আদায় করা হয়।

এখানে বহিরাগত এক শ্রেণীর পুরুষ ফকির ও মেয়ে ফকির এসে থাকেন। তাদের হাতে থাকে আশা, মাথায় কারো কারো জটা, সাথে লাল কাপড়। কারো হাতে একতারা, কারো দোতারা সারিন্দা কারো বা টুম্বুরা। দলপতির কাধে থাকে মুখ ছোট ঝুলন্ত একটি থলি। অন্যান্য জিনিষের সঙ্গে তার মধ্যে থাকে একটি চিকন কলকি। কোন কোন দলের কলকি আবার রূপা দিয়ে বাধানো থাকে এদের কোন কোন দল তাদেরকে নাড়ার ফকির বা গঞ্জির ভক্ত বলে পরিচয় দিয়ে থাকে। এরা কোন এক পূর্ণিমাতে এই মাজারে এসে গাসসি করেন। যশোর এলাকার লোকদের ভাষায় যাকে "গাসসি" বলে বরিশালের ভাষায় তাকেই "গাছা বলে। এই গাসসি বা গাছাতে তাদের উপর নাকি ভর হয়। তখন তারা নাকি ভূত, ভবিষ্যত সব কিছুই বলতে পারে। কেউ কেউ বলে থাকে পীর সাহেব তাদের ভিতর এসে সবার সঙ্গে কথা বলেন। এই সময় তারা এক রকম জেকেরে মশগুল হয়ে থাকে ও নিজের শরীরকে ভীষণভাবে ঝাকাতে থাকে।

এই সব মেয়ে পুরুষদের লজ্জা সরম বলতে কিছুই নেই। মেয়ে পুরুষ সমন্বয়ে এই সব জেকেরের আসর বসে থাকে। এই

www.pathagar.com

মাজারের কোন কোন খাদেমের ছত্র ছায়ায় এরা ভীড় জমিয়ে থাকে এবং ঐ খাদেমের এজেন্ট হিসাবে কাজ করে থাকে। যারা এখানে আসে তাদের এরা আশেকান বলে অভিহিত করে থাকে। বিশেষ বিশেষ দিনে এইসব এজেন্টরা নুতন নুতন মেয়ে ও পুরুষ আশেকান তৈরী করে গুরুজীর আস্তানায় নিয়ে আসেন। কোন এক খাদেম ব গুরু বাবাজীর আস্তানায় সাইনবোর্ড ঝুলানোও আছে যে তিনি চার তরিকার কামেল পীর। কিন্তু পেটে বোমা পড়লেও ক অক্ষর বের হবে কিনা সন্দেহ। কাজেই সব তরিকার দোরস্ত লাইসেন্স এখানে প্রস্তুত করাই থাকে এবং সুলভে পাওয়া যায়। এই পীর বাবার এক তরিকার চালু আছে ঢোল, তবলা, ও হারমোনিয়াম অন্যটার টুমটুমি খঞ্জরি, এইভাবে দোতারা সেতারা সারিন্দা বেনু মৃদঙ্গ সবই চালু আছে। গজল কাওয়ালি দেহতত্ব বিচার, মারফতি, ভাটিয়ালি, বাউল থেকে শুরু করে আধুনিক প্রেমের গান পর্য্যন্ত এখানে চালু আছে। বিশেষ বিশেষ অনুষ্ঠানে আবার মাইকও ব্যবহার করা হয়। এই আস্তানায় জেকেরের যে আসর বসে, তাকে একই তালের একটা গুঞ্জন বলা চলে। এই জেকের আল্লাহু দিয়ে শুরু করে এক সময়ে হুক, হুক দিয়ে শেষ হয়। এ বড় জবর জেকের। মেয়ে পুরুষ সবাই একই আসরে বসে জেকের শুরু হয়। কিছু সময় পরে কি এক কায়েজ পেয়ে তারা হুঃ হুঃ শব্দ করে লাফাতে থাকে ও কেউ কেউ আবার ভীষণভাবে মাথা ঝাগাতে থাকে। ফলে তারা সবাই জ্ঞান বিচ্যুত হয়ে যায় ও জেকের তখন মারফতি পর্যায়ে এসে উপনিত হয়। নারী পুরুষে তখন কোন ভেদাভেদ থাকে না, সব একাকার হয়ে যায়। কোন কোন মেয়ে অচৈতন্য হয়ে গেলে

www.pathagar.com

পুরুষেরা তার সেবা শুশ্রুসা শুরু করে দেন। এই জেকেরের কিছু সময় পরে দলপতি মেয়ে বা পুরুষের গাছা হয়। তখন নাকি পীর সাহেব তার ভীতরে এসে তার ভক্তদের অসুবিধা শ্রবন করেন, ঝাড়েন ফুক দেন ভবিষ্যতের কথা বলেন, তাবিজ তদবীর দেন ও পুরা দস্তুর নজর নেওয়াজ নেন। তারপর যাবার বেলায় নজর নেওয়াজগুলি তার খলিফাকে দিয়ে যান।

এতগুলি নিয়ম ও তরিকা মোটামুটি এই আস্তানায় চালু আছে। কতিপয় দু'এক জন খাদেম সাহেব এর পরিচালনায় বেশ সিদ্ধহস্ত। জেকের শুরু হওয়ার পূর্ব্বে তিনি একটি চিকন কলকি ধরিয়ে বসেন। এই চিকন কলকিটা সবার হাত ঘুরে যখন আবার তার হাতে ফিরে আসে তখন মারেফতি গান আরম্ভ হয়। এই গানের সঙ্গে কিছু ভক্তের জেকেরের শব্দও ভেসে আসে। কিছু গানের নমুনা এইরূপ।

১। হাউলির বাগে ফুল ফুইটাছে সবাই জানেনা।
হায়রে সবাই জানেনা—
আশেকানে জানে সবাই সে ফুলের ঠিকানা
হায়রে সবাই জানেনা।

২। যাহার নামে পাথর ভাসে
জলের কুমির ডাকলে আসে—
সেই খানজাহানের চরনতলে বানাও ঠিকানা
হায়রে বানাও ঠিকানা।

৩। হাজত আনো মানত আনো
আনো ভারে ভার।
খানজাহানের দয়া হইলে—
হায়রে খানজাহানের দয়া হইলে
হয়ে যাবে পার।

www.pathagar.com

৪। জেকের কর, জেকের কর যত আশেকান
দেলের ময়লা সাফ করিতে আছেন খানজাহান।

ইত্যাদি বহু গানই এই আসরে বসলে শোনা যায়। এই জেকেরের শেষ পর্যায়ে এক সময়ে গাওয়া হয়—

খাঞ্জা আলী বাবা কয়
বইসা জেকের ভাল হয়
লাফ দিয়া ফাল দিয়া কর জেকের
যদি মওলায় রাজি হয়।

এই মওলাকে রাজী করাবার জন্য তাদের এই লাফালাফির জেকেরে তারা হাল বেহাল হয়ে পড়ে। এই সময় তাদের কষ্ট দেখলে যে কোন লোকই তাজ্জব হয়ে যাবেন সন্দেহ নেই। কাজেই এত কসরতের পরে মওলা যদি কিছুটা রাজী হয়ে যান তাতে কারো বিস্মিত হবার কিছু নেই। অনেক সময় এই আসরে এই সব গান ছাড়াও অন্য গান দিয়েও আরম্ভ করা হ'য়ে থাকে।

মেলা ও ওরজের সময় কয়েকজন খাদেম সাহেব মাইক ভাড়া করে এনে, কেরামতি তাবিজ বিক্রির মানসে এই সব আসরের গান সবাইকে শুনিয়ে থাকেন। দুই তিনটা মাইক যখন বিভিন্ন দিক থেকে একই সময় চালু হয়ে যায় তখন কোন ব্যক্তি যে নিরবতার সাথে মাজার জেয়ারত করতে পারেন তা আমার জানা নেই। এই সমস্ত আসরে কেমন করে কোন দিকে লোক বেশি ভিড়ানো যায় সে জন্য সবার বিভিন্ন এজেন্ট নিযুক্ত করা রয়েছে। তারা বাহিরের লোকদের কাছে এই খাদেম সাহেবের শক্তি ও গুনাবলির সুন্দর বর্ণনা করে থাকে। পূর্ব্বে এই সব জেকেরের আসর মাজারের প্রথম দেওয়ালের মধ্যেই অনুষ্ঠিতহোত। এখনও

www.pathagar.com

একেবারে বন্দ না হলেও এর কিছু অংশ কোন কোন খাদেম সাহেবদের তথাকথিত আস্তানায় অনুষ্ঠিত হয়ে চলেছে ॥

এই সমস্ত হাস্যস্পদ কর্মের মধ্য দিয়ে এরা যে ইসলামের কোন তরিকা পালন ক'রছেন এবং কোন তরিকার মধ্যে এসব পেয়েছেন আমার জানা নেই। তবে এটা যে মুর্খের ভণ্ডামি, তাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই বিভিন্ন আলেমগণ বিভিন্ন সময়ে এ নিয়ে অনেক আলোচনা করেছেন, এই কাজগুলিকে অনৈসলামিক, শেরেক বেদয়াত বলে আখ্যায়িত করেছেন কিন্তু তেমন কোন ফলপ্রসু প্রচেষ্টা তারা করেননি। এই স্থানের আখলাখ ও আকিদা পরিবর্তনের জন্য ও ইসলামী আকিদা কায়েমের জন্য প্রচেষ্টা চালাতে গেলে কারো না কারো প্রচুর ঝুকি নেওয়ার প্রয়োজন। এই ঝুকি যদি কেউ কোনদিন না নেয় এবং সুচিন্তিত ভাবে আত্মত্যাগ না করে তবে এই সকল অনাচার বিদূরিত করে এখানে পুরা ইসলামী আখলাখ ও আকিদা প্রতিষ্ঠা করা কোনদিনই সম্ভব নয়। আর তা সম্ভব না হলে এই স্থানের মুছলমানদের মানসিক উন্নতি শুধু নয়, সারা বাংলাদেশের এক শ্রেণীর মুছলমানদের মানসিক উন্নতি বিধান হওয়া কোনদিনই সম্ভব নয়।

প্রতিটি মুছলমানের এই জ্ঞান যতক্ষণ পর্য্যন্ত পূর্ণভাবে না জন্মাবে যে ইসলামের মূলমন্ত্র ও তাদের উপাস্য, আল্লা, তিনি এক ও অংশহীন, সে ছাড়া আর কারো কাছে আবেদন, নিবেদন, প্রার্থনা ও মাথানত করা যায় না, আমরা একমাত্র তারই দাসানুদাস গোলাম, মন্ত্রের মত শুধু মুখে উচ্চারণ নয় জীবনের প্রতি কাজেই এই মন্ত্র প্রতিফলিত হবে ততক্ষণ পর্য্যন্ত মুছলমানের কোন উন্নতিই হতে পারে না। সত্যিকারের মুছলমানদের সকল মঙ্গল নিহীত

www.pathagar.com

রয়েছে সংকোচ ও কলেমা তৈয়াব ও এই মন্ত্রটুকুর মধ্যে। এই মন্ত্র দিয়ে মুসলমান জীবনের যাবতীয় সমস্যার সমাধান করেছে এবং শুধু আখেরাতের নয় দুনিয়ারও বাদশা হয়েছে। ইসলামের ইতিহাসে ও মুসলমা-দের জীবনালেখ্যে এর ভুরি ভুরি দৃষ্টান্ত ছড়ানো রয়েছে। যে মুসলমান এই নির্ধারিত পথের বাইরে চলেছে তার ধংশ নিদারুণ ভাবে নেমে এসেছে। এই সকল দৃষ্টান্তের মধ্যে খলিফা মোস্তা-সিম বিল্লার দৃষ্টান্ত উল্লেখযোগ্য।

সৈয়দ আমির আলি লিখেছেন, আব্বাসিয় খলিফা আবু আহমেদ আবদুল্লা এক সময় মোস্তাসিম বিল্লা উপাধি ধারণ করে খলিফার তখতে উপবেশন করেন। সেই সময় পুরানো শত্রুতার রেশ ধরে নৃশংশ মঙ্গল জাতির নেতা হালাকু খান তার রাজধানী বাগদাদ আক্রমন করেছে তখন এই খলিফা ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে ভুলে গিয়েছিলেন মুছলমানের এই মুল মন্ত্র। ভুলে গিয়েছিলেন এক আল্লা ছাড়া মুছলমান আর কারো বশ্যতা স্বীকার করতে জানেনা। তাদের জীবনে সত্যের জন্য যুদ্ধের নাম জেহাদ। সেখানে মরে গেলেও লাভ ও সুনাম, বেঁচে থাকলেও লাভ ও সুনাম দুইই হয়। বাচলে হয় গাজি, মরলে হয় শহীদ। এই বিপদ মুহূর্তে কি করা উচিত তাই নিয়ে পরামর্শ সভা বসলো। কিছু কিছু বিচক্ষন ব্যক্তির মত মতো জিহাদে লিপ্ত না হয়ে তিনি তার দুই ভাই দুই সন্তান ও তিন হাজার কাজি, শেখ ও ইমাম নিয়ে হালাকুখানের দরজায় করজোড়ে দাড়িয়ে সাহায্যের প্রত্যাশায় তার বশ্যতা স্বীকার করলেন। হালাকু খান তখন তাদের বন্দি করে নগর প্রদক্ষিন করার ছলনায় আবাল বৃদ্ধ বনিতা নির্বিশেষে হত্যা করে, সমস্ত শহর ঘোড়ার এক খুর রক্তের নিচে দাবিয়ে দিয়ে এর জবাব দিয়ে-

www.pathagar.com

ছিলেন। এ জবাব আল্লার জবাব। ঐতিহাসিকগণ বলেন পৃথিবীর ইতিহাসে এত বড় নৃশংস, নিন্দনীয় ও মানবতাহীত হত্যাযজ্ঞ আর সংঘটিত হয় নাই।

সেদিনের সেই সামান্য ভূলের জন্য এত বড় শাস্তি আল্লা বাগদাদের সমস্ত মুছলমানকে দিয়েছিলেন। কিন্তু এই জামানায় আমরা তার প্রতি এর থেকেও বেশী আনুগত্যহীন হয়ে পড়ি, তবু আমাদের উপর এই কঠিন আজাব ও শাস্তি নেমে আসেনা, এ আল্লার নিতান্ত মেহেরবানী ছাড়া আর কিছুই নয়। শুধু মাত্র এই অলির মাজার হতে নয় প্রতিটি মুছলমানের উচিত তাদের জীবন থেকেও শেরেক ও বেদাতকে সম্পূর্ণরূপে দুরিভূত করা। এ কাজে মাজারের খাদেমদের এগিয়ে আসা উচিত সর্বাগ্রে, কারণ এর মাধ্য তাদের ও তাদের বংশধরদের মঙ্গল ও উন্নতি নিহিত রয়েছে।

কিছু প্রবাদ ও কিছু কেরামতি

হযরত পীর খানজাহান আলাইহের রহমাত সম্পর্কে বহু প্রবাদ ও গল্প প্রচলিত আছে। তাঁর কেরামতির প্রমান স্বরূপ লোকে এই গল্পগুলি বলে থাকে। তিনি নিঃসন্দেহে একজন আল্লার অলি ছিলেন কিন্তু তাই বলে তিনি তার অপূর্ব কেরামতির দ্বারা হাবেলি পরগণায় ৩৬০টি দীঘি ও ৩৬০টি মছজিদ জিন বা দৈত্য দ্বারা রাতারাতি তৈরী করিয়েছিলেন এ কথা সত্য কি মিথ্যা তার

তোয়াক্কা না করে মানুষের মুখে এই গল্পটাই অধিক প্রচলিত হয়ে পড়েছে। কিন্তু জিন ও দৈত্যের গল্প বাদ দিলেও এগুলি তার ধর্ম ও সমাজ জীবনের একটি জনহিতকর কাজ এবং তার সারা জীবন তিনি এই মানব সেবায় আত্মো নিয়োগ করে এ দেশের প্রতিটি মানুষের মনের মনি কোঠায় একটা স্থায়ী আসন লাভ করেছিলেন।

তার ব্যক্তিত্ব চরিত্র ও কর্মের ফলে তার জিবদ্দশায় তিনি এ দেশের প্রতিটি মানুষের কাছ থেকে যে অকুণ্ঠ ভালবাসা ভক্তি ও শ্রদ্ধা অর্জ্জন করতে সক্ষম হয়েছেন তা তার মৃত্যুর পরেও বহাল তবিয়াতে বিদ্যমান আছে। ফলে তাকে আরও বড় করে সবার সম্মুখে তুলে ধরার জন্য কিছু সংখ্যক অন্ধ ভক্ত অসম্ভব বহু কেরামতির গল্প তৈরী করেছে। মূলতঃ তিনি ছিলেন এমন একজন অসাধারণ মানুষ, যে অনেক মানুষই তাকে বুঝতে সক্ষম হয়নি। সাধারণতঃ দেখা যায় জিন পরীদের কাজগুলি একটু ব্যতিক্রম ধর্মি ও অসাধারণ কাজ হয়ে থাকে। মানুষের কাজের সঙ্গে তার কাজের পদ্ধতি সম্পূর্ণ আলাদা। তাই কোন জিন যদি কারো হুকুম মোতাবেক এই কাজ গুলি করে তবে নিশ্চয়ই সে একজন অসাধারণ লোক। এই ধারনার বশবর্তী হয়ে সাধারণ মানুষ এই সব গল্প সৃষ্টি করে তাকে আরও অসাধারণ করে তুলতে চেয়েছে। কিন্তু তিনি যদি তার এতসব কাজ জিনদের দ্বারাই করিয়ে থাকেন তবে তার জীবনের ৫০/৬০ বৎসরের দীর্ঘ সময় তিনি কি কাজে ব্যয় করেছেন। বস্তুত আল্লার সঙ্গে যে বন্ধুত্ব স্থাপন করে এবং যে নিজে একমাত্র আল্লার মোহতাজ (মুখাপেক্ষী) হয়, এই বন্ধু

www.pathagar.com

জগত আল্লা তার মোহতাজ করে দেন। যে কোন মানুষ নিজেকে যদি আশরাফুল মখলুকাত হিসাবে তৈরী করতে পারে তবে বস্তু জগত তার পদানত হতে বাধ্য। তিনিই এমন এক ব্যক্তি যিনি তার জীবনকে এই ভাবে গড়ে তুলেছিলেন।

হযরত পীর খানজাহান আলী (রঃ) এর বিভিন্ন কর্ম ও ব্যক্তি জীবনকে ঘিরে মানুষ যে সমস্ত গল্প রচনা করেছে তার কিছু কিছু গল্প সংগ্রহ করে এখানে তুলে দেওয়া হোল। তাকে ঘিরে মানুষ অনেক গানও রচনা করেছে এর একটি গানের ২টি লাইন তার কেরামতির গল্পের বৃহত্ত অংশ।

ডাঙার নামে পাথর ভাসে
জলের কুমির ডাকলে আসে।

এই দুটি লাইনই প্রচলিত দুটি গল্পের শিরোনামা। এই দুটি গল্পই আজ সবার কাছে সত্য বলে স্বীকৃত। প্রথম গল্প শোনা যায় 'হযরত খানজাহান আলী (রঃ) অসীম শক্তির অধিকারী ছিলেন, তিনি যখন বারো বাজার এসে আস্তানা স্থাপন করলেন তখন সামনে দেখলেন ভীষণ জঙ্গল। তখন তিনি এই জঙ্গলের সমস্ত জিন দেও দৈত্যকে ডেকে বললেন, দেখ আমি এই দেশে রাজ্য স্থাপন করতে এসেছি, আমি তোমাদের কিছুই বলবনা. তোমরাও এই রাজ্যে বসবাস করতে পারবে যদি তোমরা আমার কথা শোন। জিনের বাদশার একপুত্র তার কথায় উত্তেজিত হয়ে উঠলে তিনি তাকে ধরে একটি বোতলের মধ্যে স্বাটকে রাখেন জীনের বাদশা এই খবর পেয়ে তার কাছে এসে করোজোড়ে ক্ষমা ভিক্ষা করে এবং তার পুত্রকে মাফ করে দেওয়ার অনুরোধ জানায়। যখন জিনের বাদশা তার কথায় রাজী হয়ে তার অধিনস্ত হয়। তখন

www.pathagar.com

তিনি তার পুত্রকে ছেড়ে দেন। তখন তার ইচ্ছা অনুযায়ী এই জিনগণ এক এক রাত্রিতে পাঁচ মাইল দশ মাইল করে রাস্তা নির্মাণ করতে থাকে ও এই পথ দিয়ে পীর সাহেব অগ্রসর হতে থাকেন। এই ভাবে তার হুকুম মোতাবেক জিনেরা রাত্রে রাত্রে মছজিদ ও দীঘি খনন করে চললো। তিনি যেখানে আস্তানা বা মঞ্জিল স্থাপন করতেন তখন সেখানে লোকে কিছুই দেখতো না কিন্তু সকালে উঠেই দেখতো সেখানে একটি দীঘিতে সান বাধানো ঘাট ও একটি মছজিদ। দীঘির পানিতে ওজু করে ঐ মছজিদে পীর সাহেব ফজরের নামাজ পড়তেন।'

আর একটি গল্প শোনা যায় এই গল্পটি পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে। গল্পটি সংক্ষেপে এই রূপ যে, তিনি যখন চিন্তা করলেন যে তিনি একটা বৃহত ও মজবুত মছজিদ নির্মান করবেন তখন পাথরের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে তিনি তার উজিরে আজম মোঃ তাহেরকে তার পীর হযরত বায়জিদ বেস্তামির নিকট পাঠান। হযরত বায়জিত বেস্তামির নিকট যখন মোহাম্মদ তাহের এই পাথরের প্রার্থনা জানান তখন তিনি রাগান্বিত হয়ে বলেন, 'দেড় বুড়ির বারানি তার চাটিগার বারাত। অর্থাৎ দেড় পয়সার তারানির ছেলের আবার চট্টগ্রামের কপাল। এই কথা শুনে পীর সাহেব নিজেই তার কাছে যান। যখন পীর তাকে পাথর নিতে অনুমতি দিয়ে ভাবেন যে কেমন করে সে এই পাথর নিয়ে যাবে ? তখন পীর খানজাহান আলী তার কেরামতি দেখিয়ে দেন। তিনি পাথরকে হুকুম করা মাত্র পাহাড়ের সমস্ত পাথর জলে ভেসে রওনা দিয়েছিল। শিষ্যের কেরামতি দেখে বায়জীদ বেস্তামি অবাক হয়ে বসেছিলেন এ দোয়া করেছিলেন।'

www.pathagar.com

এই পাথর ভেসে আসা সম্পর্কে এবং পাথর ঘাটার একটি গল্প শোনা যায় এইরূপে যে, যখন চিটাগাং থেকে সমুদ্রপথে পাথর ভেসে আসছিল, তখন এইখানে এসে নদীর বাক ঘুরতে গিয়ে পাথর নদীর কুল দিয়ে যাবার সময় এক রমনি অশুচি অবস্থায় নদীতে গোছল করতে যায়। হঠাৎ সে পাথরগুলিকে নদীর কুল দিয়ে এইভাবে ভেসে যেতে দেখে উৎসুক্য দমন করতে না পেরে তার অশুচি কাপড়টি পানিতে নেমে পাথরের উপর ছুড়ে মারে। এই অশুচি কাপড়ের স্পর্শ পেয়ে সঙ্গে সঙ্গে বৃহৎ পাথরটি পানিতে ডুবে যায়। সেই পাথরটি এই নদীর ঘাটে বহুকাল পর্য্যন্ত নাকি ছিল। এই কারনে এই জায়গাটির নাম হয়েছে পাথর ঘাটা।

এইরূপ এক রাত্রের গল্প ও বিভিন্ন গল্প শুনলে ভক্ত হৃদয় যে অতি সহজে বিগলিত হয়ে পড়ে সন্দেহ নেই এবং এইরূপভাবে উজান ভাটা উপেক্ষা করে পাথর ভেসে আসার গল্প শুনলে তারা বিস্মিত হয়ে যাবে তাতেও আশ্চায্যের কিছু নেই কিন্তু এর সত্যতা যাচাই করতে গেলে গল্প রচয়ীতাকেই শুধু প্রশংসা করা ছাড়া অন্য উপায় থাকে না।

ভৈরব নদীর যে শাখা মরে গিয়ে আজ মরা ভৈরব নাম ধারন করেছে এই নদী মরে যাওয়া সম্পর্কে এমন একটা গল্পও শোনা যায় যে এক সময় এই নদীর মোহনায় পণ্য বোঝাই দুটা জাহাজ ডুবি হয়। এই জাহাজ দুটি আর কখনও উঠানো সম্ভব হয় না। কাজেই চর পড়ে এই নদীর মুখে একটা বাধের সৃষ্টি হয় ও ধীরে ধীরে নদীটি ছোট হতে হতে বর্তমান অবস্থায় উপনিত হয়েছে। কেউ কেউ বলেন এই জাহাজ দুটি হয়তো পাথ-

www.pathagar.com

রের জাহাজই ছিল, তাই জাহাজ দুটি আর কোনদিন উঠানো সম্ভব হয়নি। তবে তার হুকুমে যে পাথর জলে ভেসে ঘাটে এসে পৌছেছিল এটা এই ওলির জীবনের একটি সত্য ঘটনা। ঘটনার বর্ণনা এইরূপ যে, হযরত খানজাহান আলী (রঃ) বাগেরহাটে আগমন করার পর তার পীরের দেওয়া পানির সঙ্গে এই স্থানের পানির মিল হয়ে গেল তখন তিনি এখানেই তার যাত্রার শেষ স্থান নির্বাচন করে নিলেন। তাই তিনি এখানে একটি বৃহত মছজিদ নির্মান করার ইচ্ছা প্রকাশ করেন এবং তার ভক্তগণের সঙ্গে পরামর্শ করে তিনি পাথর ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে পাথর ক্রয়ের মানসে নিজেই চিটাগাং এ গিয়ে উপস্থিত হন। বিভিন্ন স্থানের পাথর সওদাগারদের জাহাজে উঠে তিনি ভাল পাথর যাচাই করে নেন ও দাম দস্তুর ঠিক করে ফেলেন। কিন্তু যে জাহাজের পাথরগুলি তার পছন্দ হয় ও তিনি ক্রয় করেন সেই জাহাজের প্রধান সওদাগর তাকে চিনে ফেলে। তখন সে পীর খানজাহান আলী (রঃ) কে পাথর না দেওয়ার জন্য অপরিসীম দাম্ভিকতার সাথে বলে যে তুমি যে পাথর নিয়ে যাবে তার জন্য জাহাজ এনেছ কই? তাই তিনি তার এই দাম্ভিকতার উত্তরে বললেন যে জাহাজ না হলেও আমার পাথর যেতে পারে। এই সময় ঐ সওদাগার তাকে চিনে ফেলেছে বোঝাবার জন্য ব্যঙ্গস্বরে এই উক্তি করেছিল যে দেড় বুড়ির বারানি তার চাটিগার বরাত।

এই কথার পর খানজাহান আলী (রঃ) কোন কথা না বলে বললেন, তোমরা তো পাথরের টাকা পেয়ে গিয়েছ এখন আমার পাথর গুলোকে সমুদ্রের মধ্যে ফেলে দাও। তিনি বললেন হে আল্লা আমার পাথর যেন মছজিদের ঘাটে গিয়ে উপস্থিত হয়। এই

www.pathagar.com

কথার পর সওদাগার রাগান্বিত হয়ে হুকুম করলো যে আর দেরি নয়— এখনই তোমরা পাথরগুলিকে সমুদ্রের মাঝে ফেলে দাও এবং হাসতে শুরু করলো। কিন্তু বিস্ময়ের ব্যাপার মাঝি মাল্লারা যখন পাথরগুলি সমুদ্র গর্ভে ফেলে দিতে লাগলো তখন প্রত্যেকটি পাথরই ভাসতে থাকলো। অবশেষে যখন শেষ পাথরটি সমুদ্রে ফেলা হয়ে গেল তখন তিনি হুকুম করলেন যে এবার তোমরা সাবই আমার বাড়ীর সন্মুখের ঘাটে পৌছে যাও। পাথরগুলি তখন সমুদ্র পথে রওনা হয়ে চলে এলো। এই অলৌকিক ঘটনা দেখে সওদাগর পীর সাহেবের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করলো। পীর সাহেব তাকে ক্ষমা করে চলে এলেন। এই পাথর যখন ঘাটে এসে পৌছালো তখন গুণে দেখা গেল ২ খানা পাথর কম হয়ে গিয়েছে। তখন তিনি নদীকে বদদোয়া করলেন যে এই পাথর যে নদী চুরি করেছে সে নদীর যেন মৃত্যু ঘটে। নদী যেন শুকিয়ে এমন হয়ে যায় যেন তাকে একটি কুকুরে লাফ দিয়ে পার হয়ে যেতে পারে। যে নদীটি এই পাথর চুরি করেছিল 'সেই নদীই ছিল ভৈরব নদী। তাই ভৈরব নদী আজ মৃত।

এই গল্পগুলির কোন প্রমান নেই কিন্তু মরা ভৈরব আজও বিদ্যমান। তবুও মানুষ অলিক গল্পগুলোকেই মনে প্রাণে গ্রহণ করেছে। মূলতঃ আজকের মানুষ ও সাতশত বৎসর আগের মানুষের আকৃতি প্রকৃতিতে শুধু নয় মন ও মানসিকতারও বহু তফাত ছিল। সেদিনের মানুষ যে কাজ একদিনে সমাধা করতো আজকের মানুষ সে কাজ ১০ দিনেও সমাধা করতে পারে না। যে পাথর একটির পর একটা সাজাতে আজ আমরা ক্রেনের চিন্তা করি সে কাজ সে দিনে দু'তিন জন মানুষেই সমাধা করতো। কাজেই তাদের

www.pathagar.com

এই কাজগুলোকে জিন বা দেও দৈত্যের কাজ মনে করা আমাদের পক্ষে খুবই স্বাভাবিক।

হযরত খানজাহান আলী (রঃ) যে একজন অসাধারণ ও ব্যক্তি-ক্রমধর্মী চিন্তাধারার লোক ছিলেন তাতে কোন সন্দেহ নেই। তার দিঘীতে কুমীর ছেড়ে দেওয়াই তার জলন্ত প্রমান। বিশাল দিঘী কেটে, সেই দিঘীর পানি যেন কেউ অপবিত্র করতে না পারে তার জন্য তিনি খুব সুন্দর পাহারাদার নিযুক্ত করেছেন। সুন্দরবনের এ অঞ্চলে তখন অনেক কুমির বিদ্যমান ছিল এবং যেহেতু তিনি এক জন আল্লার ওলি ছিলেন, সেইহেতু তার এইরূপ পাহারাদার নিযুক্ত করার ইচ্ছা হলে এই কুমিরকে হুকুম করাই তার পক্ষে যথেষ্ট ছিল। কোন জিন বা ঘোড়াকে কুমিরে পরিণত করার প্রয়োজন ছিল বলে মনে হয় না। বরং এইরূপ যাদু প্রদর্শনের ইচ্ছা তার না থাকাই স্বাভাবিক। তা ছাড়া ইংরাজিতে Representative Fiction (রিপ্রেজেনটেটিভ ফিকশান) বলে একটা কথা আছে। যে কোন প্রাণীকে নিদৃষ্ট নিয়মে খাবার দেওয়া অভ্যাস করলে যে অনুগত হয়ে পড়ে। এ কথাটিও মিথ্যা নয়। তাই বলে আমি এ কথা বলছি না যে তার কোন কেরামতি ছিলনা। বরং এটাই আমার বক্তব্য এই যে আল্লার ওলির হুকুম যে কোন জীবের জন্যই যথেষ্ট। তার জন্য কোন কিছুর আশ্রয়ের প্রয়োজন নেই। তার কেরামতি তার সারাটা জীবনের মধ্যে জড়ানো রয়েছে। প্রচুর ধন সম্পদ ও বিপুল শক্তির অধিকারী হয়েও রাজ্য বিস্তারের কামনা পরিত্যাগ করে একটী দুর্গত এলাকায় এসে মানব কল্যাণে আত্মনিয়োগ করে, ইসলামের জন্য সকল প্রকার ত্যাগ স্বীকার করে তিনি একজন নিঃস্ব ফকিরের মত জীবন যাপন করেছেন। এটাওকি তার অসা-

www.pathagar.com

ধারণ কাজ নয়। বস্তুতঃ তার জীবনের প্রতিটি কাজই ছিল অসাধারণ ও কেরামতিতে ভরা।

এই দারুণ লবনাক্ত এলাকায় তিনি যতগুলি দিঘীই খনন করেছেন তার সবকটি দিঘীর পানিই সুপেয় ও সুস্বাদু পানির দিঘী হয়েছে। এর পানিকে লোকে আবে জমজমের পানির সঙ্গে তুলনা করে। অনেকে এ কথাও বলে থাকেন যে এই দীঘির পানিতে পীর সাহেব ফুক দিয়ে রেখে গেছেন। এ পানি সব দোয়া করা পানি। আজও অনেক জীবন্ত পীর সাহেব এই দীঘির পানিতে ফুক দেন না। হাজার হাজার লোক ভক্তি সহকারে এই দীঘির পানি খাচ্ছে ও রোগ মুক্ত হচ্ছে। কিছু দিন পূর্বে এই দীঘির পানিতে গোছল করে একজন কুষ্ঠ রোগীকে সুস্থ হতে দেখেছি। এমন পবিত্র যে পানি, সেই পানিতে যদি কেউ কদাচার করে তবে তার উপর অমঙ্গল নেমে আসবে তাতে আশ্চার্য্য হবার কিছু নেই। বহুকাল থেকে আমরা শুনেছি এই দীঘিতে জাল ফেলা পর্যন্ত নিশেধ এবং এ নিশেধটি কড়াকড়ি ভাবে পালন হতেও দেখেছি কিন্তু আজ সে নিয়মও খাদেমগণ শিথিল করে ফেলেছেন। তবে এর প্রতিক্রিয়াও দীঘির পানিতে সবার লক্ষনীয় হ'য়ে উঠেছে। এ পানি আর সে পানি নয়। এইটিই দিঘীর পানিতে তার কেরামতি।

পীর সাহেবের আর একটি বিশেষ কেরামতি লক্ষ্য করা যায় তার এই তাবিজের মধ্যে ব্যবহৃত তার গাথুনির মশলার মধ্যে, যাকে পীর সাহেবের সাদা পাথর বলা হয়ে থাকে। এক দিন কোন এক ইংরাজ ইঞ্জিনিয়ার ও বৈজ্ঞানিক এই মশলার মিশ্রণ বুঝতে অসমর্থ হয়ে বিলাতের বিজ্ঞানাগারে প্রেরণ করেছিলেন। এর মধ্যে শুধু নয় এখানের প্রতিটি ইটের মধ্যে এমনই

www.pathagar.com

একটা গুন রয়েছে যে তা মানুষকে আকর্ষণ করে। রাশি ভেদে এই আকর্ষন খুব প্রবল হতে দেখা যায়। তাই এই পাথর বা ঘসলা একটা তুলারাশি লোকের হাত চালাতে সক্ষম হয়ে থাকে এই গুণটির জন্য আজ এই তাবিজের বহু হকার দেশ বিদেশে দেখা যায়। পথে ঘাটে লোকের ভীড় জমিয়ে তারা এই তাবিজ বিক্রি করে জীবিকা নির্বাহ করছেন। সাদা পাথরের মত এই বস্তুটিও যে তার দোয়া করা জিনিষ তাতেও সন্দেহের অবকাশ নেই।

দুনিয়ায় বহু রাজা, বাদশার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে তাদের বাদশাহী খতম হয়ে গিয়েছে কিন্তু হযরত খানজাহান আলী (রঃ)র বাদশাহী তার মৃত্যুর ৭ শত বৎসর পরেও আজও মুছে যায়নি। আজও তার দরবারে হাজার হাজার মানুষ ফরিয়াদ নিয়ে আসে ও তাদের আরজ পেশ করে। ফকির মিছকিন থেকে জ্ঞানী গুনি লোক সবাই তার দরবারে আজও দোয়াপ্রার্থী হন। অনাহারি ফকির মিসকিন নিরুপায় হয়ে মাজারে বসে আছে। সিন্নি ছালাত খেয়ে মাজারে পড়ে আছে। এদের কাছে তিনি 'দয়াল খানজাহান।' এই দয়াল খানজাহানের নামেও এদেশে অনেক গল্প প্রচলিত আছে।

এইরূপ একটি গল্প শোনা যায় যে, "কোন একদিন এক বুড়ির একমাত্র নাতি ভীষন অসুস্থ হ'য়ে পড়ে। ডাক্তার, কবিরাজ, বৈদ্য ও ওঝা দেখাবার পরও যখন তার মরো মরো অবস্থা, তখন বুড়ি কাদতে কাদতে তার নাতিকে নিয়ে দয়াল খান জাহানের কাছে হাজির হোল। দয়ালের সামনে ছেলেটিকে রেখে সে কান্নায় ভেঙ্গে পড়লো। বুড়ির কান্না দেখে দয়ালের মন পাগল হয়ে উঠলো। তিনি বললেন আমি কি করতে পারি আল্লার

www.pathagar.com

কাছে প্রার্থনা, তিনিই তোমার নাতিকে ভাল করে দেবেন। কিন্তু বুড়ি কোনমতেই যেতে চায় না তখন তিনি বুড়িকে বললেন তুমি দিঘি থেকে একটু পানি নিয়ে যাও। পানি খাওয়ালে তোমার নাতি ভাল হয়ে যাবে। বুড়ি দিঘি থেকে পানি নিয়ে ও নাতিকে নিয়ে বাড়ীতে চলে গেল।

বুড়ি বিদায় হবার পর হঠাত তার চিন্তা হোল এ আমি কি বললাম। বুড়ির নাতি যদি ভাল না হয়? তাই তখনই চিন্তামগ্ন অবস্থায় তিনি গভির জঙ্গলে চলে গেলেন। পরদিন সকালে বুড়ি দেখলো তার নাতি সুস্থ্য হয়ে গেছে তখন সে এই সংবাদ নিয়ে অলের দরবারে হাজির হয়ে দেখে তিনি সেখানে নেই। তখন সবাই তাকে খুজতে আরম্ভ করলো। অবশেষে তাকে জঙ্গলের ভিতর এক গাছের নিচে উপবিষ্ট পাওয়া গেল। দেখা গেল তখনও তিনি আল্লার কাছে হাত তুলে বিগলিত নয়নে বসে আছেন। কিছু সময় পরে চোখ খুললে তাকে ছেলেটির সুস্থতার সংবাদ দেওয়া হোল। তিনি সঙ্গে সঙ্গে আলহামদুলিল্লাহ বলে উঠে পড়লেন। চলতে চলতে বুড়িকে বললেন আর তোমার ভয় নেই তোমার নাতি সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে যাবে।"

সোনা যায় বাগেরহাটের পাশ দিয়ে প্রবাহিত দড়াটানা নদি ছিল কুমিরের আবাস স্থল। ভয়ে লোক এই নদীতে নামতো না। নদীর পাড় থেকে গরু ছাগল পর্য্যন্ত কুমিরে ধরে নিয়ে যেত এবং কত মানুষ যে ধরেছে তার ইয়ত্তা নেই। কিন্তু এক সময়ে পীর সাহেবের হুকুম পেয়ে এই নদী থেকে কুমির চলে যায় এবং কোন কুমির এই নদীর সিমানায় প্রবেশ

www.pathagar.com

করলে তাকে সেখান থেকে ভেসে আসতে হয়েছে। এ হুকুম নাকি দয়াল খানজাহানই দিয়েছিলেন। এ নিয়ে একটি সুন্দর গল্প প্রচলিত আছে।

একদিন হযরত খানজাহান আলী (রঃ) তার মুছাফির খানার সম্মুখে বসে আছেন। এমন সময় এক বিধবা মহিলা কানতে কানতে তার পায়ের কাছে এসে আছড়ে পড়লো। এসে বললো দয়াল আমার ছেলেকে কুমিরে ধরে নিয়ে গেছে তাকে বাচাও। এই কথা বলে বিধবা কানতে লাগলো। বিধবার ক্রন্দনে দয়াল খান জাহান বিচলিত হয়ে পড়লেন। বিধবার পুত্র শোকের আর্ত-নাদ তিনি সহ্য করতে না পেরে সোজা হেটে গিয়ে নদীর পাড়ে দাড়িয়ে কুমিরদের উদ্দেশ্য করে বললেন, তোরা কে কে এই বিধবার ছেলেকে খেয়েছিস আমার কাছে চলে আয়।

আল্লার ওলির আদেশ তারা অমান্য করতে পারলো না। দুটি কুমির পানির উপর ভেসে উঠলো ও অপরাধির মত আস্তে আস্তে তাঁর সামনে এসে দাড়ালো। তিনি রাগান্বিত হয়ে তাদের বললেন, আমার এলাকায় বাস করে আমার বিনা অনুমতিতে আমার রাজ্যের মানুষের পরে অত্যাচার করার জন্য তোমাদের আমি শাস্তি দেব। অনেক সহ্য করেছি কিন্তু আর নয়। এই বিধবার একমাত্র ছেলেকে বিনা অপরাধে হত্যা করার জন্য তোমা-দের আমি বন্দি করলাম। যে মানুষ তোমরা খেয়েছ, আজিবন সেই মানুষের তাবেদারি তোমাদের করতে হবে। হুকুম করলেন, আমার বড় দীঘিতে গিয়ে সারা জীবন তোমরা বন্দি হয়ে থাকবে। অপরাধি কুমির দুটি তখন নদী থেকে উঠে আস্তে আস্তে গিয়ে মাজারের সম্মুখে বড় দীঘিতে নেমে পড়লো। পরে তাদের নাম

www.pathagar.com

রাখলেন ধলা পাহাড় ও কালা পাহাড়। তাদের বললেন তোমাদের নাম ধরে ডাকলে এসে খাবার খেয়ে যেও। সেই কুমিরের বংশ ধরেরা আজও দীঘিতে রয়েছে এবং শত শত বছর ধরে সেই হুকুম তামিল করে চলেছে। এক বুড়ির নাতিকে নিয়েও এইরূপ গল্প প্রচলিত রয়েছে।

পরে পীর সাহেব নদীর দিকে ফিরে তখন কুমিরদের উদ্দেশ্য করে বললেন, তোমরা যারা নদীতে রয়েছ তারা আর কোন দিন গোপন ভাবে আমার এলাকায় ঢুকে কোন মানুষের অনিষ্ট করতে পারবে না ও তাদের পরে অত্যাচার করতে পারবে না। শোনা যায় সেই থেকে এই এলাকার সব কুমির দূরে চলে যায় এবং কখনও এই এলাকায় প্রবেশ করলে পানির উপরে ভেসে আসতো। পানির নিচে দিয়ে লুকিয়ে ডুব দিয়ে এই এলাকায় প্রবেশ করে না। এমনি ভেসে আসা একটা কুমিরকে এক সময় গুলি করে মারা হয়েছিল যার বৃহত মাথাটি এখনও দশানি গ্রামের এক জমিদার বাড়ীতে রয়েছে।

শোনা যায় পীর সাহেব নিজে এক বিধবার সন্তান ছিলেন বলে সেই সন্তান হারা বিধবার প্রতি তার সহানুভূতির অন্ত ছিল না। তিনি তাকে অনেক সান্তনা দিয়ে বললেন, তোমার ছেলেকে তো আর ফিরে পাওয়া যাবে না তবে তোমার ছেলের অছিলায় এই এলাকার আর কাউকেই নদীর কুমিরে ধরে খাবে না। তুমি ছবর কর মা। এই ছবরের ফল তোমাকে আল্লা দান করবেন। কথিত আছে যে সেই বিধবা সর্ব্বহারা মেয়েলোকটি সারা জীবন পীর সাহেবের সহচর্য্য লাভ করতে সক্ষম হয়ে, আল্লার ওলি

www.pathagar.com

হয়ে মৃত্যু বরণ করছিলেন। এই মুছাফির খানায় তিনি আমরণ রন্ধন কাজে নিয়োজিত ছিলেন বলে শোনা যায়।

এই অঞ্চলে সেই সময়ে বাঘের খুব উপদ্রব ছিল। বাঘের উপদ্রবে এক সময়ে সবাই অতিষ্ট হয়ে উঠেছিল। শোনা যায় এই বাঘকেও তিনি তার হুকুমের তা‌ঁবেদার বানাতে সক্ষম হয়ে ছিলেন। কোন এক দিনের ঘটনা, তার একজন মুরিদ রন্ধন কার্য্যের জন্য কাঠ সংগ্রহ করতে জঙ্গলের ভিতরে যান। কাঠ কাটার সময় হঠাত তাকে বাঘে আক্রমন করে। দয়াল খান জাহান তখন সবার সঙ্গে তার হোজরার সম্মুখে বসে ছিলেন। সেই সময়ে হঠাত তিনি নিশেধের ভঙ্গিতে তার ডান হাত উচু করলেন। সবাই অবাক হয়ে গেল। তিনি বললেন, তোমরা জঙ্গলের দিকে চলে যাও এবং তাকে সাহায্য কর। তখন সবাই জঙ্গলের ভিতর গিয়ে অনুসন্ধান করে দেখতে পেল যে সে প্রকাণ্ড একটি বাঘের দুই হাত ধরে দাড়িয়ে রয়েছে ও তার বুক দিয়ে ঝর ঝর করে রক্ত ঝরছে। তাদের দেখে বাঘ তাকে ছেড়ে দিয়ে চলে গেল। বাঘের নখর তার গায়ে লেগেছে মাত্র কিন্তু বাঘে তাকে কামড় দেয় নাই। সবাই তাকে নিয়ে ফিরে এলে তিনি বললেন, ভয় নেই বাঘে আর কোনদিন এখানে মানুষ খাবে না। কথিত আছে যে গভীর রাত্রে হযরত খান্ জাহান আলী (রঃ বাঘের পিঠে চড়ে রোজ এক বার তার রাজ্য পরিভ্রমণ করতেন। তাই তার রাজ্যে কোন চুরি ডাকাতি ছিল না।

কথিত আছে যে খানজাহান আলী (রঃ) দিঘিতে এক সময়ে সাত সমুদ্র তের নদীর পানী জমা ছিল। এই পানি আবার তিন ভাগে বিভক্ত ছিল। এক দিকের পানি ছিল কৃষ্ণবর্ণ, একদিকের পানি

www.pathagar.com

ছিল নীল বর্ণ ও একদিকের পানি ছিল স্বচ্ছ। স্বচ্ছ পানি ছিল উত্তর ও পশ্চিমের দিকে, নীল পানি ছিল পূর্ব্ব দিকে ও কৃষ্ণবর্ণ পানি ছিল দক্ষিন দিকে। এই পানি ভিন্ন ভিন্ন কাজে ব্যবহার করা হোত। স্বচ্ছ পানি মানুষের খাবার ও সাধারণ কাজে ব্যবহার হোত। কালো পানিতে রোগ পীড়া ব্যথা বেদনার উপশম হোত। এই পানি ছিল অদ্ভুদ গুণ সম্পন্ন পানি ও নীল পানি ছিল এক রহস্য ময় পানি। এই পানির সামগ্রীক ব্যবহার শুধু পীর সাহেবই জানতেন। এই পানি তিনি তার সৌধ নির্মানের কাজেই ব্যবহার করতেন। এই পানি খুব বেয়াড়া ধরনের পানি ছিল তাই লোকে তাকে "আড়েল বাকা" পানি নামে অভিহিত করছিল।

কথিত আছে এই পানিতে লোক নামা নিশেধ ছিল। যদি কখনও কেউ নামতো শোনা যায় সে আর উঠে আসতে পারতো না। একদিন একটি লোক তার ছেলেকে নিয়ে হুজুরের দরবারে এসে হাজির হয়। তখন এই ছেলেটি সব কথা শুনে, বিষয়টি পরীক্ষা করে দেখবার প্রবৃত্তি মনে জেগে ওঠে ও হুজুরকে না জানিয়ে এই পানিতে নেমে ডুব দেয়। কিন্তু যখন অনেক সময় অতিবাহিত হয়ে গেল ও ছেলেটী পানির উপরে উঠে আসে না তখন ছেলেটির বাবা হুজুরের পায়ে ধরে ক্ষমা চেয়ে কান্নাকাটি করতে থাকে। হুজুর তাকে সান্তনা দিয়ে আল্লাকে ডাকতে বললেন এবং দীঘির দিকে যেতে বললেন। সে দীঘির পাড়ে গিয়ে তার ছেলের প্রতিক্ষায় থাকে। তখন দেখা গেল যে ৩/৪ ঘন্টা পর পানির ভিতর থেকে তার ছেলে সুস্থ শরীরে উঠে এলো। ছেলেকে নিয়ে লোকটি পীর সাহেবের কাছে এলো। পীর সাহেব তাকে এরূপ গোয়ার তুমি জীবনে আর করতে নিশেধ করে, চুপ থাকতে বললেন।

www.pathagar.com

সবাই তার কাছে অনেক কিছু জানতে চাইলো কিন্তু সে কোন দিন এই ভেদের কথা কাউকে বলে যায়নি। শোনা যায় পীর সাহেবের ইন্তেকালের পর একদিন গভীর রাত্রে এই দিঘীর নীল ও কালো পানি দীঘির উত্তর পুর্ব্ব কোনের পাড় ভেঙ্গে বেরিয়ে সমুদ্রের দিকে চলে যায়। এই ভাবে এই দীঘির 'আড়েল বাকা' পানির অবসান ঘটে। তার পর থেকে দীঘিতে স্বচ্ছ ও নির্ম্মল পানিটাই রয়েছে।

এমনি করে ছড়িয়ে আছে দিঘির পশ্চিম পাড়ের তছবিহ গাছের গল্প। পীর সাহেবের তছবিহ হতে কবে কোনদিন একটি দানা খসে পড়ে সেখানে একটি তছবিহ গাছ হয়েছে। পশ্চিম পাড়ে তার নিজ হাতে লাগানো ক্ষীর খেজুর গাছের গল্প, সিন্দুরে আমের গল্প জেয়াদ গাছের গল্প। (এটি একটি পাথরের খাম্বা) দুধ খাওয়া পাথরের গল্প, আঙ্গুর গাছের গল্প কাঠালের গল্প এমনি হাজারো গল্প ছড়িয়ে আছে এদেশের বিভিন্ন এলাকায়। দেখা যায় এই গল্পের মানুষটি মৃত্যুর পরেও তাকে নিয়ে গল্প রচনায় প্রয়াস আজও থেমে যায়নি।

এই সব কেরামতির গল্পগুলি সত্য হোক আর মিথ্যা হোক, এ থেকে এটা সহজেই অনুমান করা যায় যে তিনি নিঃসন্দেহে একজন কামেল পীর ছিলেন। তিনি যে শুধু হোসেন শাহ বা নাছির উদ্দিন মাহমুদ শাহের নির্ব্বাচিত এদেশের একজন সুবেদার ছিলেন তাই নয় তিনি ছিলেন আল্লার শক্তিতে শক্তিমান, আধ্যাত্মিক বলে বলিয়ান একজন অসাধারণ মহাপুরুষ। তার কাছে দুনিয়ার সকল বস্তু সম্পদ, ধন দৌলত, লোভ, লালসা মাথানত করেছে। আর তিনি মাথা নত করেছেন সর্ব্ব শক্তিমান আল্লার কাছে। তার জীবনে

www.pathagar.com

রোগ ব্যধির কথা মোটেই শোনা যায় না। তার সম্পর্কে এত গল্প শোনা যায় কিন্তু তার রোগ ব্যধি সম্পর্কে কোন গল্পই শোনা যায় না। শোনা যায় বৃদ্ধ বয়সেও তিনি অসিম শক্তির অধিকারী ছিলেন। তিনি জয়িফ বা বৃদ্ধ অবস্থায় মৃত্যুবরণ করলেও অচল অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেননি। কথিত আছে যে তিনি নামাজে রত অবস্থায় ছেজদায় গিয়ে মৃত্যুবরণ করেন। তার মৃত্যুর এই ঘটনাও তার কম কেরামতির কথা নয়। তাই তিনি মৃত্যুকেও জয় করে মানুষের শ্রদ্ধার পাত্র ও প্রাতস্মরনীয় ব্যক্তি হয়ে রয়েছেন।

——

শেষ জীবন

যতদুর জানা যায়, হযরত খানজাহান আলাইহের রহমাতের শেষ জীবন ছিল বড় কঠিন সাধনায় পরিপূর্ণ ও বৈরাগ্যময়। শুধু গল্প ও প্রবাদ নয় বহু প্রবিন ও বোজর্গ ব্যক্তিগণও এই মত পোষণ করেন যে তার জীবনের শেষ ভাগে তিনি তার মাজারের উপরে নির্ম্মিত সৌধটিকে এবাদত খানা বা হোজরাগৃহ হিসাবে ব্যবহার করতেন। রাতদিন তার মাঝে তিনি আল্লার ধ্যানে মগ্ন থাকতেন। নামাজের সময় হলে তিনি পশ্চিম দরজা দিয়ে বেরিয়ে দেওয়াল সংলগ্ন তোরণের মধ্যদিয়ে ভক্তবর্গসহ মসজিদে প্রবেশ করে জামাতে নামাজ আদায় করতেন এবং নামাজান্তে আবার হোজরার মধ্যে প্রবেশ করতেন। কোন কোন সময় একটা নির্ধারিত সময়ের জন্য তিনি তার নির্ম্মিত মাজারের মধ্যে চিল্লায় অতিবাহিত করেছেন। পুর্ব্ব দিকের দরজা দিয়ে প্রয়োজন মত তিনি বাবুর্চিখানায় ও বাইরে

www.pathagar.com

যেতেন। দক্ষিণ দিকের দরজা দিয়ে বেরিয়ে তিনি কোন কোন সময় দিঘিতে যেতেন, ওজু করতেন বা দিঘির ঘাটে বসতেন। কিন্তু তার এবাদতের কাজে প্রয়োজনীয় সব কিছুই তার হোজরার মধ্যে সর্বদা প্রস্তুত থাকতো। শোনা যায় এইভাবে তিনি তার জীবনের শেষ দশটি বছর অতিবাহিত করেছেন।

এই সময় যদি কখনও কেউ তার সঙ্গে দেখা করতে আসতো তবে তার দেখা পাওয়াই মুশকিল হোত। এই সময় তার এবাদতে বিঘ্ন ঘটানো নিশেধ ছিল বলে অনেককে তার সঙ্গে সাক্ষাত করার জন্য দিনের পর দিনও অপেক্ষা করে থাকতে হয়েছে। এমন অনেক গল্পই শোনা যায়। তার জীবনকে যদি ৪টি ভাগে ভাগ করা যা তবে দেখা যায়, এর মধ্যে সাড়ে তিন ভাগ সময় তিনি জনকল্যাণ মানব সেবা ও ধর্ম প্রচারে ব্যায় করেছেন এবং বাকি সময়টুকু তিনি ব্যায় করেছেন সমস্ত ঝামেলাকে বিসর্জ্জন দিয়ে পরিপুর্ণ আল্লার ধ্যানে। তবুও প্রতি নিয়ত মানুষ একটু দোয়া লাভের আশায় তার দরজায় এসে ভীড় করতো। তাই শোনা যায় তিনি বিশেষ কোন কোন দিনে আছরের নামাজ বাদ এক ঘন্টা বা এক ঘড়ি সময় ব্যায় করে সবার সঙ্গে দেখা করতেন, সবার কথা শুনতে, দোয়া করতেন ও ওয়াজ নছিহত করতেন। শোনা যায় তিনি প্রথমে উর্দ্দু ভাষায় ও পরে বাংলায় তকছির করতেন। তিনি বাংলা ভাষা পুরাপুরিই আয়ত্ব করতে সক্ষম হয়েছিলেন। প্রবিনদের মুখে শোনা যায় যে, মোহাম্মদ তাহেরই ছিলেন তার এই ভাষা শিক্ষার গুরু। এবং মোহাম্মদ তাহের ও তার নিকট থেকে আবারও উর্দ্দুতে বিশেষ ব্যুত্তপত্তি অর্জ্জন করেছিলেন। মোঃ তাহেরের ভ্রাতা মোতাহের ও ছিলো ১২টি ভাষায় পণ্ডিত।

www.pathagar.com

কথিত আছে যে দির্ঘ ৫৫ বৎসর তিনি এই হাবেলি খলিফাতাবাদ পরগণার সুবেদার ও শাসনকর্তা হিসাবে নিয়ন্ত্রিত থেকে এখানে একটা পুরা ইসলামি হুকমত কায়েম করতে সক্ষম হয়েছিলেন কোন এক সময়ে জলদস্যুদের আক্রমন এই স্থান বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছিল বটে, কিন্তু তার শাসনামলে এই এলাকা একটি সম্পূর্ণ বিপদমুক্ত এলাকায় পরিণত হয়েছিল। তার নিরলশ পরিশ্রমের দ্বারা তিনি এমন একটি শান্তি রাজ্য স্থাপন করতে সক্ষম হয়েছিলেন যে যেখানে চুরি ডাকাতি ও জলদস্যুর আক্রমন চিরতরে নির্মূল করার পর এই রাজ্যটিকে তিনি একটি প্রাচুর্য্যময় রাজ্যে পরিনত করতে সক্ষম হয়েছিলেন। এই ভাবে ৪০ বৎসর শাষন কার্য্য পরিচালনা করার পর তিনি তার জীবদ্দশায়ই এই রাজ্যের শাষনভার অর্পন করেন তার প্রধান উজির, অনুগত মুরিদ ও শ্রেষ্ট বন্ধু পীর তাকী মোহাম্মদ তাহের খান দির্ঘ ১০ বৎসর রাজ্য পরিচালনা করার পর সামান্য কিছু দিনের ব্যবধানে, কেহ কেহ বলেন, ৮০ দিনের কেহ কেহ বলে ৬ মাসের ব্যবধানে একই হিজরিতে তিনিও মৃত্যু বরণ করেন। এই ১০ বৎসর হযরত খানজাহান আলী র:) সম্পূর্ণ আল্লার এবাদতের জন্য ব্যায় করেছেন।

কথিত আছে যে হযরত খানজাহান আলী (র:)র জীবনের একটি উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ঘটে তার স্ত্রীর মৃত্যুর পর। তার স্ত্রীর মৃত্যুর পর ভৈরব নদীর কুলে তার বাস ভবনের ধংশের সাথে সাথে তার স্ত্রীর কবরটিও নিদারুণভাবে ধংশ প্রাপ্ত হয়েছে। তবে সোনা বিবির কবরের স্থানটি আজও বিদ্যমান রয়েছে। তার কোন সন্তানাদি না থাকায় তার স্ত্রীর মৃত্যুর পর সংসারের সমস্ত বন্ধন তার ছিন্ন হয়ে যায় এবং কিছু দিনের মধ্যে রাজ্যভার

www.pathagar.com

ছেড়ে দিয়ে বসতবাটি পরিত্যাগ করে সম্পূর্ণ ফকিরি চালাতে তার মাজারের আস্তানায় এসে হাজির হন ও বাকি জীবন তিনি একাকীই অতিবাহিত করেন। এখানে থেকে অতি সহজেই অনুমান করে বলা যায় যে, তার মৃত্যুর ১০ বৎসর পূর্বে তার স্ত্রী মৃত্যুমুখে পতিত হন। কারো কারো কাছে শোনা যায় যে হযরত খানজাহান আলী (রঃ)র উত্তর প্রদেশ বা দাক্ষিণাত্য হয়ে সস্ত্রীক এদেশে আগমন করেছিলেন। কেহ কেহ বলেন, যে তিনি হোসেন শাহ কর্তৃক সেনাপতি নিযুক্ত হয়ে সস্ত্রীক এদেশে আগমন করেন। মতভেদ যাই হোক না কেন, তিনি যে সস্ত্রীক এদেশে আগমন করেছিলেন তাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহের অবকাশ নেই।

শোনা যায় যে চল্লিশ বৎসর পর্য্যন্ত তিনি তার বাসভবনে বসবাস করেছেন এবং ফজরের নামাজ ষাটগুম্বজ মসজিদে জামাতে আদায় করার পর দরবারে বসতেন। আছরের নামাজ বাদ তিনি ভ্রমনে বাহির হতেন। এই ছিল তার প্রতি দিনের নির্ধারিত কার্য্য তালিকা বর্তমানে যে স্থানটিতে তার মাজার শরিফ অবস্থিত, তাঁর বাসভবনে অবস্থান করেই এই স্থানটি তিনি মনোরম করেই সৃষ্টি করেছিলেন। সাধনার এক পর্য্যায়ে নিজের জন্য তিনি তার এই মাজারটিও প্রস্তুত করেছিলেন। মাজারের উপর লিখিত সকল কোরানের আয়াত, সুরা, দোয়া দরুদ, ফারসি বয়াত, কবিতা ও ভাষাবা সবই এই সময়ের মধ্যে লেখা হয়। কয়েকজন মনীষী ব্যক্তি বলেন যে হযরত খানজাহান আলী (রঃ) কবরটি যেখানে দেখা যায়, মূল কবরটি তার অনেক নিচে এবং একটু মাথার দিকে সরানো। হুজুরের মৃত্যুর পর তার মৃত দেহ কবরের বিশেষ এক স্থানের পাথর সরিয়ে ভিতরে নামানো হয়। এই জন্যই মাজার শরিফ

www.pathagar.com

যেয়ারত করবার সময় মাথার দিকে লোকের যাওয়া নিষেধ।

স্থানীয় খোন্দকার পরিবারের একজন প্রাচীন ব্যক্তি আমার নানাজি খোন্দকার ইসহাক উদ্দিন বলেন যে বাহিরের মাজারে অর্থাৎ মোহাম্মদ তাহেরের মাজারের উপরেও অনেক ফারসী বয়াত লেখা ছিল। সেগুলি তিনি নিজে দেখেছেন। জিজ্ঞাসা করলে তার কয়েকটি তিনি স্মরণের কোঠা থেকে খুজে বলেন যে এগুলি তিনি মনে হয় লেখা দেখেছেন, যেমন :—

১। অন্দুরুছে কিয়া মজা হায় সাম্নুরুছে পুছিও
শাখে গুলমে কিয়া মজা হায় বুলবুলিছে পুছিও।

২। এক জামানা রেহি বাতে বা আউলিয়া
বেহতারাজ সাদসালেহ তাতে বেরিয়া।

৩। বরগে দরকতানে ছবজদার
নজরে হুসিয়ার
হর ওরকে দফতরাস্তে
মারেফাতে কের দেগার।

কিন্তু এই লেখাগুলির চিহ্ন বর্তমানে মোটেই নেই। এগুলি কোন সময়ের লেখা জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন সম্ভবতঃ তাদের মৃত্যুর পরই এই লেখা গুলি খোদাই করা হয়েছিল। আমারও মনে হয় এই বয়াতগুলি যদি লেখা থেকেই থাকে তবে অনেক পরে লেখা হয়েছিল।

সহজ অর্থ (১০০৭ ৪৭) বয়াত কটির ছন্দে অনুবাদ করা গেল।

১। আম্রুকেতে কেমন মজা মাসুক বোঝে জেনে
ফুলের মজা বোঝে যেমন বনের বুলবুলে।

www.pathagar.com

২। এক বছরের আউলিয়াদের সঙ্গ বসে বলে যে আলো
সেতো একশো বছর অন্য লোকের ছোহবাত থেকে
অনেক ভালো।

৩। সৃষ্টি খোদার বুঝতে হলে প্রশ্ন লাগেনা
গাছের একটি পাতার সৃষ্টি মাথায় আসে না।

এই সমস্ত প্রাচীন ও আরবী ও ফারসী জানেওয়ালা কয়েক জন লোকের কাছে আরও কয়েকটি প্রাপ্ত তথ্যের উল্লেখ করে আমি আমার আলোচনা শেষ করব। মোহাম্মদ তাহের যে কিছু দিন খলিফাতাবাদ রাজ্য শাসন করেছিলেন সেই সময়ের ঘটনা কেন্দ্র করে এমন একটি গল্প শোনা যায় যে, একদিন আছরের নামাজ বাদ হযরত খানজাহান আলী (রঃ) তার কিছু মুরিদানসহ তার এবাদত খানার সম্মুখে দীঘির চত্তরে বসেছিলেন। মোহাম্মদ তাহের সেখানে অনুপস্থিত ছিলেন। সেই সময়ে তিনি সবাইকে উদ্দেশ্য করে বললেন, হে উপস্থিত সুধীবৃন্দ, আমি জানিনা আর কতদিন আমি এই দুনিয়ায় বেচে থাকবো। আমি বৃদ্ধ হয়ে এসেছি। আমার যাবার সময় মনে হয় ঘনিয়ে এসেছে। কাজেই আমি চাই আপনারা আপনাদের মধ্য হ'তে এমন কাউকে নির্ব্বাচন করুন যার হাতে এই রাজ্যের শাসনভার অর্পন করে আমার জীবনের শেষ কটি দিন আমি নিশ্চিন্তে কাটাতে পারি। অনেক আলোচনার পর তখন সবাই এক বাক্যে মোহাম্মদ তাহেরের নাম প্রস্তাব করলেন। এই প্রস্তাবে হুজুরও মনে মনে খুশী হলেন কিন্তু মোহাম্মদ তাহের এসে যখন একথা শুনলেন তখন তিনি নিজেকে অযোগ্য বলে আখ্যায়িত করে এই প্রস্তাবের বিপক্ষে বক্তব্য রাখলেন। কোন কথাই তার কানে আসলো না এবং

www.pathagar.com

মহররম মাসের প্রথম দিনেই তাকে এই রাজ্যের শাসনভার গ্রহন করতে হয়।

আলহাজ ফকির সদর আলী সাহেবের কাছে জানা যায় যে তিনি এমন একটি গল্প শুনেছেন যে, একদিন মোহাম্মদ তাহের বাটগুম্বজ মছজিদের দরবার গৃহে বসে রাজ কার্য পরিচালনা করছিলেন এবং খানজাহান আলী (রঃ) তখন তার হোজরাখানায় এবাদতে মশগুল ছিলেন। ঠিক এই সময় এক বৃদ্ধ এসে তার হোজরাখানার পাশে বসে ক্রন্দন করতে লাগলো। ক্রন্দনের শব্দ পেয়ে পীর সাহেব হোজরা থেকে বেরিয়ে এসে তাকে জিজ্ঞাসা করলেন যে তার কি হয়েছে? তখন সে বর্ণনা করলো যে দরবারের সম্মুখের একটা বেল গাছ থেকে আমি দুটি বেল পেড়েছিলাম। কিন্তু দুটো লোক আমার বেল দুট কেড়ে নিয়ে আমাকে গলা ধাক্কা দিয়ে বের করে দিয়েছে। আমি খুব ক্ষুধার্ত। তারা আমাকে বেল দুটো খেতে দেয়নি। আমাকে অপমান করেছে।

এই কথা শুনে পীর সাহেব হোজরার ভিতর চলে গেলেন ও তাকে কিছু খাবার এনে দিলেন ও তার হাতে দুটি বেল দিয়ে বৃদ্ধকে সঙ্গে নিয়ে তখনই দরবার গৃহে হাজির হলেন। তাকে দেখে মোহম্মদ তাহের ও সবাই উঠে দাড়ালেন। তখন পীর সাহেব বসে বৃদ্ধকে পাশে বসিয়ে মোঃ তাহেরকে জিজ্ঞাসা করলেন, তোমার দরবারে বৃদ্ধের কেমন সম্মান। এ কথার উত্তর না দিয়ে মোহাম্মদ তাহের বললেন হুজুর আমি কিছুই বুঝতে পারছিনা। পীর সাহেব বললেন, যেখানে বৃদ্ধের সম্মান থাকেনা সেখানে বরকত থাকে না। তিনি বৃদ্ধকে ঘটনা বর্ণনা করতে বললেন। ঘটনা শুনে মোঃ তাহের বললেন, যে এই ঘটনা জানার পর আমি বৃদ্ধকে খুঁজে

www.pathagar.com

পাইনি এবং পরে বেল ছুটিকেও পাওয়া যায় নাই। তখন বৃদ্ধ বলল যে, হুজুর তার কাছ থেকেই আমাকে এই বেল ছুটি দিয়েছেন। তখন সেই লোকটি বলল, এই তো সেই বেল ছুটি। সবাই হতবাক হয়ে গেল এবং তার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করতে লাগলেন। তখন তিনি সবাইকে আঙ্গুলের ইশারায় চুপ করতে বললেন। উপস্থিত সবাইকে তিনি তওবা পড়ালেন ও মোনাজাত করালেন।

মোনাজাত শেষে সবাইকে উদ্দেশ্য করে বললেন, তোমরা কখনই ভুলে যেওনা যে এই বিশ্ব জগতের সৃষ্টিকর্তা ও প্রতিপালক একমাত্র সর্বশক্তিমান আল্লাহ। তিনি রহমানুর রাহিম ও শেষ বিচার দিনের কর্তা। বড় ভালবেসে তিনি মানুষকে আসরাফুল মাখলুকাত করে সৃষ্টি করেছেন। কিন্তু আখেরাতের ভালাই তোমাদের হাতে যেহেতু আল্লাহ তোমাদের আক্কেল দান করেছেন। ধৈর্য্যধারণ করা ও সংযত হওয়া ইমানের লক্ষণ। গরীব ও দুঃখির প্রতি সদয় ব্যবহার করলে আল্লাহ খুশী হন। রিজিক ও বরকত সম্পূর্ণ আল্লার হাতে। যাকে ইচ্ছা তিনি দান করেন যাকে ইচ্ছা তিনি ভুখা রাখেন। তার পর জিজ্ঞাসা করলেন, আমি যখন তোমাদের মাঝে থাকবো না? সবার সমর্থন আদায় করে বললেন—আল্লাহ তুমি এদের ক্ষমা করো তোমার নেয়ামত থেকে এদের বঞ্চিত কোরনা। পরিশেষে তিনি বললেন আল্লাহ তুমি আমাকে ঈমান নিয়ে এই হালাত থেকে যাবার তৌফিক এনায়েত কর।

এই কথা শ্রবন করার পর সবাই উচ্চস্বরে ক্রন্দন করতে লাগলো। তিনি সবাইকে হাত উচু করে শান্ত হতে বললেন ও আছরের ওয়াক্তে মাগরিবের আজান দিতে নির্দেশ দিলেন।

www.pathagar.com

এই জামাতে তিনি মোহম্মদ তাহেরকে ইমামতি করতে আদেশ দেন ও তিনি মোক্তাদি হয়ে নামাজ আদায় করেন। কথিত আছে যে নামাজের শেষ রাকাতের পর ছেজদার পর তিনি আর জায়নামাজের উপর থেকে মাথা তোলেন না। ছালাম ফিরিয়ে সবাই দেখলেন হুজুর জায়নামাজের উপর ছেজদায় পড়ে আছেন। এই অবস্থা দেখে মোহম্মদ তাহের প্রথম তার কাছে গেলেন ও ড.করে কেঁদে কেঁদে পড়লেন ইন্না লিল্লাহে অ ইন্না ইলাইহে রাজেউন। নামাজের মোনাজাত করলেন, বললেন তুমি আমাদের ক্ষমা কর আল্লা। তোমার অলির অছিলায় এই মোনাজাতের একটি আরজ অন্ততঃ কবুল করো আল্লা। ছুম্মা আমিন।

মোনাজাত শেষ করে এসে তিনি পীর সাহেবকে উত্তর দিকে মাথা রেখে শুইয়ে দিয়ে তার গায়ের সাদা চাদর দিয়ে ঢেকে দিলেন ও ঘোষণা করলেন যে ইসলামের বন্ধু দোযাহানের বাদশা হযরত খানজাহান আলাইহের রহমাত ইন্তেকাল করেছেন। চারি দিক থেকে ক্রন্দনের রোল উঠলো। মুহূর্তের মধ্যে এই সংবাদ চারিদিকে ছড়িয়ে পড়লো। তার মৃত্যুর পর করণীয় কাজের নির্দেশই মোহম্মদ তাহেরকে দেওয়া হয়েছিল। নির্দেশ মোতাবেক তিনি তার গোছলের কাজ সম্পাদন করালেন এবং নামাজে জানাজায় তিনিই ইমাম হয়ে আদায় করলেন। রাজ্যের অগণিত লোক তার জামায়াত জানাযায় শরীক হয়। তার মৃত্যুর পরদিন আছরের নামাজের পূর্বে তাকে দাফন করা হয়। অনেক বোজর্গ বলেন যে তার নামাজে জানাজা দুইবার অনুষ্ঠিত হয়।

এই গল্পের বিপরীতে আবার কেউ কেউ বলেন যে তিনি এক শবেবরাতের রাত্রে ইন্তেকাল করেন। আর যদি তিনি ঐ

www.pathagar.com

দিনেই ইন্তেকাল করে থাকেন তবে তিনি মাগরিবের বা ইশার বাদ ইন্তেকাল করেছিলেন কারন তার কবর গাত্রে রাত্রে ইন্তেকা-লের কথাই উল্লেখ রয়েছে।

এই ভাবে সারা জীবন মানব সেবায় অতিবাহিত করার পর বৃদ্ধ বয়সে আর এক বৃদ্ধের অভিযোগ শ্রবন করে দয়া পরাবশ হয়ে নিজেই অজুহাতে তিনি যে কেরামতি প্রদর্শন করে সবার হাতে ধরা পড়ে যান তাই তার মৃত্যুর কারণ হয়ে দাড়ায়। নিজে বৃদ্ধ হয়ে আর এক বৃদ্ধের অবমাননা তিনি অন্তরে সহ্য করতে পারলেন না।

কথিত আছে যে হযরত খানজাহান আলী (রঃ)র মৃত্যুর ১৩ দিন মাতান্তরে ৪০ দিন পর তার শ্রেষ্ঠ বন্ধু প্রিয় সঙ্গি ও উজিরে আজম পীর আলী মোহম্মদ আবু তাহের খান মৃত্যুমুখে পতিত হন। (ইন্না লিল্লাহে ... ... রাজেউন)। তিনিও যে আল্লার কত বড় একজন অলি ছিলেন তার এইরূপ মৃত্যুর মধ্য দিয়েই অতি সহজেই তা উপলব্ধি করা যায়।

আল্লাহ আমাদেরও যেন এইরূপ পীরের ছোহবাত নছিব করেন ও আমাদেরও যেন এইরূপ সুন্দর মৃত্যু কবুল করেন। (আমিন)।

www.pathagar.com

হযরত খানজাহান আলী (রঃ)র কিছু উপদেশ ও নছিহত

হযরত খানজাহান আলী (রঃ) তার শিষ্যদের ও জনসাধারণকে যে সমস্ত উপদেশ দিতেন ও নছিহত করতেন তা সম্পূর্ণ লিপিবদ্ধ নেই বলে ধারাবাহিক ভাবে তা প্রকাশ করা সম্ভব নয়। তবে সাধারণ মানুষের জন্য কিছু উপদেশ ও নছিহত তিনি তার মাজারের শিলালিপিতে খোদাই করে রেখে গিয়েছেন। সেখানে কোরানের আয়াতের বহু অংশ লেখা রয়েছে। এমনকি তিনি ও তার মুরিদগণ যে সমস্ত আমল করতেন তার ও অংশ বিশেষ এই মাজার গাত্রে লেখা রয়েছে। কাজেই তার মাজার গাত্রের লেখাগুলি পড়লেই তার উপদেশ ও নছিহতের বহু কিছুই আমরা পাই। মাজার গাত্রে এই সমস্ত লেখার কারণ ছিল এই যে, তিনি জানতেন যে তার মৃত্যুর পর বহু লোকই তার মাজার জেয়ারত করতে আসবে। তারা যেন এই সব লেখা পড়ে তার উপদেশ গ্রহণ করে ও আল্লার পথ হ'তে বিচ্ছিন্ন না হয়ে যায়। যে সমস্ত লেখা তিনি তার মাজারের পাথরে খোদাই করেছেন তার অনেক লেখাই আজ পাঠোদ্ধার করা যায় না। পাথর ক্ষয় হয়ে লেখা অস্পষ্ট হয়ে গিয়েছে, কোথাও বা পাথর ফেপে উঠে লেখাসহ পড়ে গিয়েছে, তবুও এখনও যা আছে তাই প্রতিটি মানুষের অবাক বিস্ময়ের সৃষ্টি করে। এত নছিহত, আয়াত বয়াত আজও পর্য্যন্ত আমি কোন গুলি কেন, কোন রাজা বাদশার মাজারেও খোদাই করা দেখিনি। আবদুল মজিদ নামে এক অভিজ্ঞ

www.pathagar.com

মাজার ভ্রমণকারী বলেন, যে এত লেখা আমি পৃথিবীর কোন অলি আল্লার মাজারেই দেখিনি। এটি পৃথিবীর একটি ব্যতিক্রম ধর্মি মাজার। যে সমস্ত লেখা তিনি তার মাজারে খোদাই করেছেন সেখানে শুধু উপদেশ ও নছিহত নয় হয়তো তার জীবনের পরিচয় ছিল কিন্তু আজও এই লেখাগুলি কেউই তেমন করে অনুসন্ধান করে দেখেননি। এই সমস্ত লেখাগুলি পড়লে অতি সহজেই বোঝা যায় যে তিনি কেমন ও কোন দরজার লোক ছিলেন ও কি তার আদর্শ ছিল।

তিনি এদেশে সুবেদার হয়ে এসে থাকলেও ইসলাম প্রচার করা ও ইসলামকে এদেশে কায়েম করাই যে তার মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল তাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। এমনি কথাও শোনা যায় যে তিনি তার পীরের এজাজত নিয়ে তার নির্দ্দেশ মোতাবেক, এক শিশি পানি নিয়ে এদেশে আগমন করেছিলেন। তার পীরের এইরূপ হুকুম ছিল যে, যে দেশের পানির স্বাদ এই পাত্রের পানির অনুরূপ হবে, সেইটাই হবে তোমার ইসলাম প্রচারের স্থান। তাই যতদুর পর্য্যন্ত তিনি অনুরূপ পানির স্বাদ না পেয়েছেন ততদুর পর্য্যন্ত তিনি শুধু অগ্রসরই হয়েছেন। অবশেষে বাগেরহাটে এসেই তিনি দীঘি খুড়ে অনুরূপ পানির সন্ধান পেলেন ও এখানেই তিনি তার স্থায়ী আস্তানা স্থাপন করেন। কথিত আছে যে এই পানির সন্ধানের জন্যই নাকি তিনি তার যাত্রা পথের সর্ব স্থানে এত অসংখ্য দীঘি খনন করেছেন। কিন্তু বাগেরহাট ছাড়া কোথাও অনুরূপ পানির সন্ধান মেলেনি।

অবশেষে এই এলাকায় যখন তিনি এলেন তখন দেখলেন, এটি সম্পূর্ণ একটি মুছলিম বিবর্জ্জিত বৌদ্ধ বাগ্নি ও পৌধ

অধ্যাষিত এলাকা। তারা তার আগ্রাসনকে সহজ ভাবে গ্রহণ করেনি ও ইসলামকে সহজই বরতে পারেনি। ফলে তাদের সঙ্গে স্বাভাবিক নিয়মেই দ্বন্দ্ব সংঘাতের সৃষ্টি হয়েছে। তিনি যদি এদেশে আগমন না করতেন তবে এদেশে আজও ইসলামের আলো প্রবেশ করতো কিনা সন্দেহ। ক্ষমতা হাতে না এলে ইসলামি হুকুমত কায়েম করা কোন দিনই সম্ভব নয় তাই তিনি ক্ষমতার অধিকারী হয়ে এদেশে ইসলাম কায়েম করেছিলেন। তাই রাজা বাদশাদের জীবনের সঙ্গে তার জীবনের মিল নেই এবং তার মাজা-রের সঙ্গেও তাদের মাজারেরও কোন মিল নেই। মূলত তিনি ছিলেন একাধারে বাদশাহ ও আউলিয়া।

এই কারণেই দেখা যায় যে তার পাথরে খোদাইকৃত নছিহত-গুলিও একটু ব্যতিক্রম ধর্মি. কিছুটা স্বতন্ত্র ও অধ্যাত্মিক বাগুলায়র অন্যান্য ওলিদের মতই তিনি বিভিন্ন নছিহত রেখেছেন সত্য কিন্তু তা সবই দার্শনিকের মত তথ্য বহুল। বিশাল ভাবকে তিনি অল্প কথার মধ্যে এনে প্রকাশ করে রেখে গেছেন। তিনি জানতেন সাধারণ মানুষ শুধু নয় অসাধারণ মানুষগুলিও অল্প বিস্তর দুনিয়ার জন্য পাগল। তাই অনেক সুধী ব্যক্তিও পরকালের কথা ভুলে যায়, দুনিয়ার মোহে আল্লার ভয়কেও তারা মন থেকে মুছে ফেলে। তাই এই দুনিয়া সম্পর্কে তার উপলব্ধি মাজার গাত্রে তিনি এই ভাবেই প্রকাশ করেছেন।

১। আদ দুনিয়া আউয়ালুহা বাকায়ুন
অ-আওছাতুহা আনায়ুন
অ-আখেরুহা ফানায়ুন

তার মাজার গাত্রে এই যে কথাটি তিনি লিখেছেন এ শুধু

www.pathagar.com

জিয়ারতকারী মুছলমানদের জন্যই শিক্ষণীয় বিষয় নয় বরং সারা দুনিয়ার মানুষের জন্য এটি একটি পরম শিক্ষণীয় নছিহত। এর পূর্ণ ব্যাখ্যা করতে গেলে বইয়ের কলেবরই বৃদ্ধি পাবে। তবে এখানে তিনি সবাইকে এই কথাই বুঝাতে চেয়েছেন যে, তোমরা কি জান, যে দুনিয়ার জন্য তোমরা পাগল তা কত ক্ষণস্থায়ী ও এর পরিণতি কি? যতই তোমরা চেষ্টা করনা কেন এর পরিণতি তোমরা রোধ করতে পারবে না। এই দুনিয়ার শুরুতেই আছে ক্রন্দন, মধ্যম অবস্থায় আছে সংগ্রাম এবং এর শেষ অবস্থা ধ্বংস ছাড়া আর কিছুই নয়। কাজেই এই দুনিয়া নিঃসন্দেহে একটা কষ্টের স্থান। তার জন্যও দুনিয়ার আরাম আয়েশের জন্য তোমরা আল্লাকে ভুলে যেও না। এই বয়াতটির বাংলা অর্থ ছন্দে এইরূপ করা যায়।

'এই দুনিয়ার শুরু হোল ক্রন্দনে
কষ্ট মাঝে সাধলো বাধা গুজরানে
জেনে রেখ ধ্বংস হবে শেষ ক্ষনে।'

এই উপদেশ বাণী তিনি শুধুমাত্র কবরগাত্রে লিখে রেখে যায়নি এর সত্যতা তিনি নিজের জীবনে প্রতিফলিত করেও মানুষকে দেখিয়েছেন। এই কথাকে চির সত্য জেনে তিনি আজীবন গরিব হালাতে জীবন যাপন করেছেন এবং গরিবি হালাতেই মৃত্যুবরণ করেছেন। এই গরিবি হালাতে থাকলে দুনিয়ায় তার কি লাভ হবে ও আখেরাতেও যে কতটুকু ফায়দা হাছেল করবে, সে সম্পর্কে তিনি তার কবরগাত্রে লিখে রেখেছেন—

"মাস্মাতা গারিবান
ফাকাদ মাতা শাহিদান।"

www.pathagar.com

অর্থ—"যে গারিবি হালাতে মৃত্যুবরণ করলো নিশ্চই সে শহিদ হ'য়ে মৃত্যুবরণ করলো।

"সারা জীবন গরিব হয়ে কাটালো যে
শহিদ হ'য়ে মৃত্যুবরণ করলো সে।"

মানুষের প্রতি এতবড় নছিহত ও দৃষ্টান্ত আর কি হতে পারে? ধন দৌলতের ভড়ং দেখিয়ে যারা মানুষের মনে ব্যথার সৃষ্টি করে গরিবকে অবজ্ঞা করে এবং ইসলামের জন্য কিছুই ব্যায় করে না তাদের ধনের হিসাবের ফল হবে জাহান্নাম। মৃত্যুর সময়ে এই ধন দৌলত মানুষের কোন কাজেই আসবে না। তাই ফকিরিই মানুষের কাম্য হওয়া উচিত। আর কিছু না পারলেও যদি দুনিয়ার আরাম আয়েসের সঙ্গে সংগ্রাম করে গরিব হালাতে মৃত্যুবরণ করা যায় তবে নিশ্চয়ই সে শহিদ হ'য়ে মৃত্যুবরণ করবে সন্দেহ নেই। আখেরাতের সুফলের জন্যই তিনি মানুষকে এই অছিয়তই করে গেছেন।

আর এক জায়গায় তিনি কেমন ভাবে কোন ভাষাতে এবং কি কি নামে আল্লাকে ডেকে তার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করতে হবে ও দোজখের আজাব থেকে রক্ষা পাওয়ার প্রার্থনা জানাতে হবে— সে সম্পর্কে তিনি মাজারের এক স্থানে লিখে রেখে গেছেন। তার এই কথা বলার কারণ এই যে—তিনি জানতেন যে তবুও মানুষ ভুল করবে। তাই তিনি বলেছেন—যদি তোমরা ভুল কর আমার এসব উপদেশ ভুলে যাও, দুনিয়া ও দৌলতের মোহে আল্লার গজবকে ডেকে আনো এবং যদি কখনও নিজেদের ভুল বুঝতে পারো তবে তোমরা এই কথা বলে আল্লার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা কোর। আল্লা রহমানুর রহিম, তিনি তোমাদের মাফ করবেন। বিশেষ নামাজান্তে

তোমরা এই বলে মোনাজাত করবে (মাজারে লিখিত আছে। "ইয়া আল্লাহু, ইয়া রহমানু, ইয়া রাহিমু. ইয়া বুরহানো, ইয়া বদিয়ুহু দামাওয়াতে ও ফিল আরদে। খালেছ না মেশান নার।"

অর্থ—"হে আল্লা. হে রহমান, হে রহিম হে আমাদের রক্ষা কর্তা ও বিশ্বজগতের সৃষ্টিকর্তা তুমি আমাদের দোজখের আগুন বা আজাব থেকে রক্ষা করো।"

এই সুন্দর প্রার্থনা মাজারে লেখার উদ্দেশ্যে কি হতে পারে অল্প বিস্তর সবাই একথা বুঝতে সক্ষম। আল্লার কাছে কোন ব্যক্তির প্রার্থনা যদি এইরূপ হয় তবে নিশ্চয়ই আল্লা তাকে ক্ষমা করেন। তাই সবার মঙ্গলের জন্যই তিনি এইরূপ মোনাজাত মাজারে লিখে রেখে গেছেন।

তার মাজারের কোন কোন লেখা পড়লে চিন্তার সাগরে ডুবে যেতে হয়। যদিও এই কথাগুলি খুবই সংক্ষিপ্ত কিন্তু অর্থ ব্যঞ্জনায় ও ভাবের গভিরতায় ব্যপক। তার এই সব লেখা পড়লে মনে হয় যে তিনি জীবনে যে সব সমস্যা ও প্রশ্নের সম্মুখীন হয়েছেন, এতে যেন তিনি সেই সব কঠিন সমস্যার জবাব রেখে গিয়েছেন। তাই কোরানের আয়াত দিয়ে হোক. আর বিভিন্ন বয়াত দিয়েই হোক। এই সব আয়াত. বয়াত পড়লে এমনই একটা ছবি ভেসে ওঠে যে তিনি যেন এক প্রশ্নের আসরে বসে সবার মনের বিকার সুন্দর ও সুষ্ঠ উত্তর প্রদানে ছরিভূত করছেন। আর সেই সবই এই লেখার মাধ্যমে আজও আমাদের কানে প্রতিধ্বনিত হচ্ছে। এক স্থানে লেখা দেখা যায়—"ইয়া ইলাহিল আলামিন, ইয়া খায়রুন নাছ-রিন" অর্থ—"হে আমার পরম বিশ্বাসী উপাস্য, তুমিই আমাদের সব চাইতে ভাল সাহায্য কারি।" মনে হয় তিনি তার সৈন্যদের

www.pathagar.com

উদ্দেশ্য করে বলেছেন, তোমরা কি আল্লাহ্‌কে সব চাইতে ভাল সাহায্যকারী বলে মনে করো না? তোমাদের বিজয় গৌরবে তোমরা অধিক গর্ভিত হোয়ো না। অত্যাচার কোরনা বরং ক্ষমা প্রদর্শন কর। কারন এ তোমাদের বিজয় নয় এ বিজয় ইসলাম ও সত্যের বিজয়, আর এসেছে আল্লার কাছ থেকে।"

এ কথা অতিব সত্য যে তারা অনেক সময় ভিষণ যুদ্ধের সম্মুখীন হয়েছেন। সৈন্যগণ চিন্তাযুক্ত ও বিচলিত হয়ে পড়েছেন। তখন তিনি তাদের বলেছেন যে তোমাদের সন্ধিধান হবার বা বিচলিতহবার কোন কারন নেই আর কোন এখতিয়ারও নেই। তোমদের কাজ যুদ্ধ করা, ইসলাম প্রতিষ্ঠা করার জন্য শত্রুর সঙ্গে যুদ্ধ করা ও দুশ্মণকে খতম করা। কিন্তু বিজয় তোমাদের হাতে নয়, বিজয় আল্লার হাতে। যদি তোমরা মোমেন হও, সত্যের জন্য জেহাদ করো আর ফলাফলের জন্য আল্লার উপর নির্ভর করো, তবে ইনশা আল্লাহ বিজয় তোমাদের নিকটবর্ত্তি। এই মর্ম্মে মাজারে লিখিত রয়েছে "নাছরুম মিনাল্লাহে ওয়া ফাতহুন কারিব অবিশ্‌শিরিল মোয়-মিনিনা।..........ফাল্লাহু খায়রুল হাফেজিন।"

অর্থ,—"আল্লার নিকট থেকে সাহায্য ও বিজয় মোমেনদের জন্য অতি নিকট বর্ত্তি। আল্লাই সর্ব বিষয়ে সর্ব্বজ্ঞ।"

এর মধ্যে কি সবাইকে মোমেন হবার উপদেশ দেওয়া হয় নি? বস্তুত সবাইকে প্রকৃত মোমেন ও ইমানদার হবার জন্য তাকিদ দিয়েছেন। কারন একমাত্র মোমেনদের জন্য আল্লা কঠিন কাজকেও সহজ করে দেন।

মাজারের উপরে লিখিত অন্য একটি কাতাবায় দেখা যায় যে আল্লার সৃষ্টি রহস্য সম্পর্কে তিনি তার অভিমত ব্যক্ত করেছেন।

www.pathagar.com

এই কাতাবাটি সম্পূর্ন পাঠোদ্ধার করা সম্ভব হয়নি তবে জনৈক মওলানা জয়নাল আবেদিন তার এইরূপ ভাব অর্থ করেছেন যে, "তোমরা যদি স্রষ্টাকে বুঝতে চাও, তবে তার সৃষ্টিকে বুঝবার চেষ্টা কর। যদি রহম পেতে চাও তবে তার সৃষ্টির প্রতি রহম কর। স্রষ্টাকে উপলব্ধি করার ইচ্ছা থাকলে তার সৃষ্টির মধ্য দিয়েই তাকে উপলব্ধি করতে হবে।" এমনি একটি কয়াতের উদ্ধৃতি অবশ্য ইতিপূর্ব্বে আমরা দেখেছি যার অর্থ দুনিয়ায় আল্লার সৃষ্টিকে বুঝতে হলে কোন গ্রন্থের প্রয়োজন হয় না। সামান্য একটি গাছের পাতার সৃষ্টি কৌশল বোঝবার ক্ষমতাও আমাদের নেই।

অন্য একস্থানে মাজারে লিখিত রয়েছে, যার অর্থ এইরূপ এখন আল্লাহ ব্যতিত তোমাদের আর কোন উপাস্য নাই। সমস্ত প্রসংশা ও গুনগান একমাত্র আল্লারই প্রাপ্য" মনে হয় তিনি এ কথা লিখেছেন, ধর্মান্তরিত নূতন ইসলাম ধর্ম গ্রহন কারিদের অভি-রত করার জন্যই। খোদাই করা কিছু অংশ এইরূপ পাঠোদ্ধার করা যায়—'আয়ুজুবিল্লাহে মিনায় সাইতনের রাজিম, বিছমিল্লা-হির রহমানির রাহিম. আল্লাহু আস্তাহু ছামিয়ুল আলিম।......। আল্লাহু গাফুরুর রাহিম।

শুধু মাত্র নয়া মুছলমানদের জন্যই নয় সমস্ত মানবের জন্যই এই নছিহত বড় মূল্যবান। প্রতিটা মানুষেরই এই কাম্য হওয়া উচিত। অর্থ—বিতাড়িত শয়তান হ'তে আমি আল্লার কাছে সাহায্য প্রার্থনা করছি ও পরম করুনাময় আল্লার নামে আরম্ভ করছি। আল্লাহ সবকিছুই বোঝেন ও শ্রবণ করেন। তিনি পরম দয়ালু ও ক্ষমাশীল।' কাজেই নিরাশ হবার তোমাদের কোন কারন নেই। তোমরা আল্লার পথে ফিরে আসো ও তাঁর নিকট

www.pathagar.com

ক্ষমা প্রার্থনা কর। নিশ্চয়ই তিনি তোমাদের ক্ষমা করবেন কারন তার নাম যে গফুরুর রাহিম।

আল্লার সঙ্গে শেরেক করা সম্পর্কে তিনি তার মাজারের উপরে লিখে রেখে গেছেন। " ওলা ইয়ুশরিক বে এবাদাতি রব্বি আবাদা।" অর্থ আল্লার এবাদতের মধ্যে তোমরা অন্য কাউকেই শরিক কোরনা।" কোরান থেকে এ উদ্ধৃতি তিনি লিখে রেখে গেছেন। শুধু আল্লার এবাদত করলেই তাকে পাওয়া যাবে না, লক্ষ রাখতে হবে যে এই এবাদের মধ্যে কোন গলদ আছে কিনা। যদি গলদ থাকে তবে রহমতের বদলে সব পুড়ে নিঃশেষ হয়ে যাবে, নেমে আসবে গজব। এই শেরেক সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা ও ব্যাখ্যা অন্য প্রবন্ধে করা হয়েছে।

এক জায়গায় তিনি এমন অচিহ্নত করেছেন যার ভাবার্থ মুছে যাওয়া অংশের রেশ টেনে এমনি দাড়ায় যে 'সংযত হয়ে চলা ও ছবরকে আল্লা পছন্দ করেন। রিয়া ও হিংসাকে আল্লা সব সময়ই অপছন্দ করেন। তোমার জানা উচিত তুমি কে? তোমার কৃত কর্মের ফল নিশ্চয়ই তুমি পাবে। জেনে রেখ আল্লার দৃষ্টিতে বাদশা ফকিরের কোন পার্থক্য নেই তার কাছে মহা মুল্যবান বস্তু হোল তোমার অন্তর। যার অন্তর আল্লার প্রেমের স্থল তার অন্তর তত বেশি পরিস্কার ও সেই আল্লার তত প্রিয় এবং নিশ্চয়ই সে একজন মোমেন।

হুজুরের মাজারের উপরে আল্লার ছেফাতি নাম সমুহ লেখা রয়েছে এবং তা সংখ্যায় অনেক বেশি। এই নামগুলি হয়তো কোন অজিফাও হতে পারে। কারন এই নামগুলি এত সুন্দর ভাবে মিল করে সাজানো যে একে একটি সুন্দর কবিতা বললেও

www.pathagar.com

অত্যুক্তি হয় না। এই সন্তানের একটু নমুনা দেওয়া যাক—

"ইয়া আল্লাহু ইয়া রহমানু, ইয়া রাহিমু, ইয়া সোবহান।
ইয়া হান্নানো, ইয়া মান্নানো, ইয়া বোরহানো ইয়া গুফরান।,

আল্লার এই নামগুলির যে কি মর্ত্তবা তা আলেমগণের কাছ থেকে জানা যায়। আল্লার এই নামগুলি নিয়মিত পাঠ করলে আল্লাহ বিশেষ পুরস্কার দান করে থাকেন।

তার মাজার গাত্রে লিখিত আর একটি ফারসি বয়াতের সন্ধান পাওয়া যায় ডাক্তার আফজাল হোসেন নামক স্থানীয় একজন গুণি ব্যক্তির কাছে। যার নমুনাও বর্ত্তমানে মাজারে পাওয়া যায় না। এটি তার পায়ের দিকে লেখা ছিল বলে তিনি বর্ণনা করেন। অস্পস্ট আকারে লেখাটি নাকি এখনও আছে কিন্তু আমার দ্বারা পাঠোদ্ধার করা সম্ভব হয়নি। এই ফারসি বয়াতটিতে একটি আক্ষেপের সুর ধ্বনিত হয়েছে। তার কাছ থেকে উদ্ধার করে বয়াতটি লিখে দেওয়া গেল —

"দরি ডনিয়া ক্যাছে ইয়ার না দিদাম
আগার দিদাম দানাদারি না দিদাম।

তিনি কবি মনা লোক ছিলেন — তাই কবিতায় তিনি এইরূপ অর্থ করেছেন—

'এই ধরা মাঝে দরদি আমার
　　কারো খুজে নাহি পাই
যদিও পেয়েছি অচিরে দেখিছি
　　রসুল তরিকা নাই।'

কিন্তু বয়াতটির অর্থ এইরূপ হলেই সমুচিন হয় বলে মনে হয় যে

এই দুনিয়ার বন্ধু আমার কারোই তো দেখিনা
যদিও বা দেখি তার মনে কোনমানবতা দেখিনা।

www.pathagar.com

মানবতাবাদী এই মহাপুরুষের কাছ থেকেই এমন কথা পাওয়া সম্ভব। সারা জীবন যিনি মানবতার সেবা করেছেন একমাত্র তিনিই এইরূপ মানবতার বানী রেখে যেতে পারেন এই বয়াতের ভিতর দিয়ে আমরা এই কথাও উপলব্ধি করতে পারি যে এই দুনিয়ায় যে বন্ধু খুঁজে পায় না, এখানে বন্ধু বলে যান কেহ নাই, তার বন্ধু কে ও কোথায়

এই ভাবে ভুরি ভুরি অছিয়াত ও উপদেশ তার কবর গাত্রে লিখে রেখে আল্লার এই ওলি দুনিয়া থেকে বিদায় গ্রহণ করেছেন। এছাড়াও মাজারে আরও লেখা রয়েছে সময় ও সুযোগের অভাবে তার উদ্ধৃতি দেওয়া সম্ভব হোল না। পরবর্ত্তিকালে তুলে দেবার চেষ্টা করা যাবে। হযরত খানজাহান আলী (রঃ)র এই মাজার জ্ঞানিদের জন্য একটি জ্ঞান ভাণ্ডার। এটিকে পাথরের একটি মূল্যবান পুস্তক বলা চলে। আর পুস্তকের প্রতিটি কথা এত মূল্যবান যে যদি অনুবাদ করে তা মানুষের সম্মুখে তুলে ধরা যায় তবে এথেকে মানুষ নিঃসন্দেহে উন্নত শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে।

আল্লাহ অমাদের ইসলামের আদর্শ ও এইসব অছিহত বুঝবারও মেনে চলবার তৌফিক এনায়েত করুন। (আমিন)

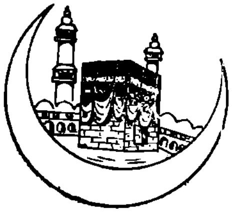

www.pathagar.com

তথ্য পঞ্জি

১। মাজারের উৎকীর্ণ শীলা লিপি। ২। রিয়াজ উস সালাতিন মুল-গোলাম-হোসেন—অনুবাদ টি, ইলিয়ট। ৩। History of Dinwrjpur—Bucharan Hamiltou. ৪। যশোর খুলনার ইতিহাস-শতিশ চন্দ্র মিত্র। ৫। সুন্দরবনের ইতিহাস-এ্যাডভোকেট আবদুল জলিল। ৬। Islam in south Bengal—Samsudden Ahmed Khan. ৭। History of Bengal—Ramesh chandra Majumder, ৮। Rulars of India 1 & 11–Stainley Lane Pool Edetd by w, w, Hanter, ৯। Historical readers—Dakhina chandra Roy. ১০। Out lines of ancient Indian History and civilizatoin—Dr, R, c majaumder ph, D, ১১। তুজক-ই-বাবরই—Translated by Elliot, ১২। তারিখ ই মুবারক শাহি—Elliot-Quoted by কবিরত্ন, পুরাতত্ব বিশারদ সিদ্ধার্থ বাগিশ শ্রী ধনঞ্জয় দাস মজুমদার। ১২। হযরত শাহ মখদুমের জীবনি-মোঃ আবু তালিব। ১৩। তাওয়ারিখে ফেরেশতা—আবুল কাশেম ফেরেশতা উর্দু অনুবাদ থেকে। ১৪। History of Bengal—H, cliford claridge, ১৫। History of middle ages–H, Tappan, ১৬। Statistical accounts of Bengal–W, w, Hunter, ১৭। History of India–V, A, smith, ১৮। Archaeological survey of India–Caminghum, ১৯। Annals of Rural Bengal—W, w, Hunter, ২০। Travellers of India–Oatan, ২১। The voyages of Ilen Batuta—Dawn (Quated), ২২। A, short History of Bagerhat—Mozharul Islam, ২৩। History of Arabes

www.pathagar.com

(Hitti) khan B. A. BT, ২৪। বঙ্গের অনন্ত সামন্তচক্র ও ইসলাম রাষ্ট্রের ইতিহাস—কবিরত্ন, পুরাতত্ব বিশারদ সিদ্ধার্থ বাগিশ শ্রীধনঞ্জয় দাস মজুমদার। ২৫। হযরত খান জাহান আলী—আবদুর রহিম। ২৬। প্রবন্ধ—খান জাহান আলী—হেদায়েতুল ইসলাম খান মাসিক মোহাম্মাদি ৩৪শ বর্ষ প্রথম সংখ্যা। ২৭। প্রবন্ধ—হযরত খান জাহান আলী ইসলামিক একাডেমি পত্রিকা। ২৮। প্রবন্ধ—বাঘেরহাট হইতে বাগেরহাট—সৈয়দ মোহাম্মদ ইউনুছ—একাডেমি পত্রিকা। '২৯। প্রবন্ধ—হযরত উলুখ খান-ই-জাহান—মোহাম্মদ আবু তালিব সহ অধ্যক্ষ রাজশাহি বিশ্ববিদ্যালয়। ৩০। গৌড় রাজ মালা—অক্ষয় কুমার মৈত্রেয়। ৩১। গৌড়ের ইতিহাস—রজনী কান্ত চক্রবর্ত্তি। ৩২। তারিখই নাশিরই—মিনহাজ উদ্দিন সিরাজ Translated by—Elliot মওলানা হাসান যশোরির গ্রন্থাগার। ৩৩। তবকতই নাশিরি—Quotedly—শ্রীধনঞ্জয় দাস মজুমদার। ৩৪। তারিখই রাশিদই—মির্জ্জা হায়দার Translate by lance pool, ৩৫। তবকতই বাবরই—মির্জ্জা হায়দার Traslated by Lane pool Brstish mugun, ৩৬। খোন্দকার বংশের একটি তায়েদাদ নামা। ৩৭। শাহ ছাহেবের ভবিষ্যৎ বাণী—অনুবাদ মওলানা হাসান যশোর—তার নিজস্ব পাঠাগার থেকে।

নাকোল বিমুখী উচ্চ বিদ্যালয়ের লাইব্রেরী ও মওলানা হাসান যশোরির নিজস্ব পাঠাগার থেকে উল্লিখিত বহু মূল্যবান পুস্তকের সন্ধান মিলেছে।

www.pathagar.com

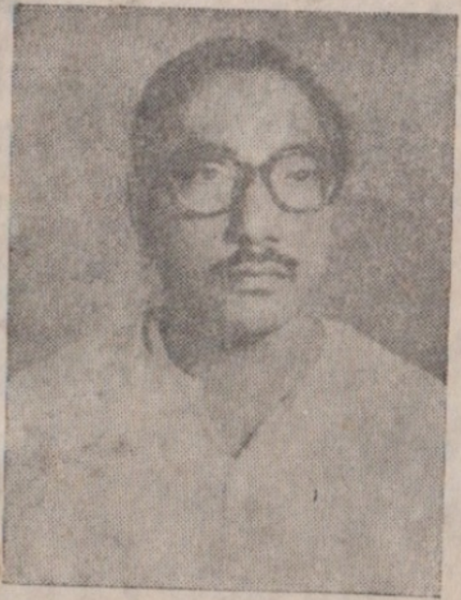

জনাব সৈয়দ ওমর ফারুক হোসেন ১৯৪২ সালের ২রা ফেব্রুয়ারী বাগেরহাটের দীঘিরপাড় গ্রামে খানজাহান আলী (রঃ) র মাজারের পাশের বাড়ীতেই জন্মগ্রহণ করেন। স্কুল কলেজের শিক্ষা সমাপ্তির পর তিনি ইসলামাবাদ মাদ্রাসা ও কাড়াপাড়া হাই স্কুলে প্রধান শিক্ষক ও সহকারি প্রধান শিক্ষকের দায়িত্ব পালন করেন। এর পর তিনি সরকারি চাকুরি গ্রহণ করেন এবং চাকুরীরত অবস্থাতেই এম, এ পাশ করেন। ছাত্রাবস্থা থেকেই একজন সাহিত্যানুরাগী ব্যক্তি হিসাবে তিনি পরিচিত হ'য়ে ওঠেন। এ সময় থেকেই তিনি বিভিন্ন পত্র পত্রিকার সঙ্গে জড়িত হয়ে পড়েন এবং বাগেরহাটে পরাগ ও খান জাহান আলী ইসলামিক [illegible] একাডেমি পত্রিকার সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৬২ সালে কবি জসিম উদ্দিনের সংস্পর্শে এসে অল্পদিনের মধ্যেই তিনি একজন গীতিকার হিসাবেও খ্যাতি অর্জন করেন। তিনি কয়েকটি কাব্য গ্রন্থেরও রচয়িতা। তার অপ্রকাশিত গ্রন্থের সংখ্যাও কম নয়। বর্ত্তমান গ্রন্থখানা তার একটি মুল্যবান রচনা। দীর্ঘ বিশ বৎসর সাধনার পর তিনি হযরত খান জাহান আলী (রঃ) প্রকৃত জীবনালেখ্য তুলে ধরে এই গ্রন্থখানা রচনা করতে সক্ষম হয়েছেন।